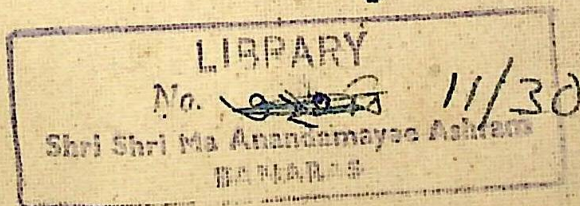
মহাবির্ভাব



শ্রীঅনিলবরণ রায়
ও
শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী

সচ্চিদানন্দ শ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারীর জীবনী ও দর্শন বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ

১। ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ৩৲
২। সত্যযুগাঙ্কুর ... ।০
৩। উমাপ্রেম ... ।৵০
৪। সত্যগাথা ... ৵০
৫। শিবলিঙ্গ পূজাতত্ত্ব ... ৵০
৬। ধর্ম্ম সম্মিলন ... ।০
৭। ব্রহ্মচারীবাবার ত্রিরঙ্গিন চিত্র ॥০

প্রাপ্তিস্থান :

১। সেবায়েত চিত্রধাম আশ্রম, মালনী
পোঃ নেত্রকোণা (ময়মনসিংহ)

২। শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়
মাতৃভাণ্ডার গ্রন্থালয়
৫৭।২ সি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মূল্য—৫৲ টাকা

শ্রদ্ধেয়া আনন্দময়ী মাকে —

১৬ই কার্ত্তিক
১৩৫৯ সন
ইং ৩-১১-৫২

প্রকাশক,
শ্রীকেদার চন্দ্র সরকার
পান্ডিচারী

১৯৫১

ভগবান, তোমার রূপান্তরের কাজ সুসম্পন্ন করবার জন্যেই আমরা পৃথিবীতে রয়েছি। তা'ই আমাদের একমাত্র সঙ্কল্প, তা'ই আমাদের একমাত্র প্রবৃত্তি—আবার তা'ই যেন হয় আমাদের জীবনের একমাত্র বৃত্তি, একমাত্র তাকেই লক্ষ্য করে চলে যেন আমাদের সকল কর্ম্ম।

শ্রীমা

(পর পৃষ্ঠায় শ্রীমায়ের হস্তলিখিত মূল প্রার্থনা)

1951

Lord, we are upon earth to accomplish Thy work of transformation. It is our sole will, our sole preoccupation. Grant that it may be also our sole occupation and that all our actions may help us towards this single goal.



মহাবির্ভাব

[শ্রীশ্রীমদ ভারতব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীজগন্মাতার মহাবির্ভাব]

শ্রীঅনিলবরণ রায়
ও
শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

প্রকাশক ঃ
শ্রীকেদারচন্দ্র সরকার
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

প্রথম মুদ্রণ ঃ
১৫ই আগষ্ট, ১৯৫২

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস
পণ্ডিচেরী

736/51/1100

প্রকাশকের নিবেদন—

"শ্রীশ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীজগন্মাতার মহাবির্ভাব" প্রকাশিত হইল। পরম পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবার পবিত্র জীবন-কথা ও তাঁহার সত্যদৃষ্টিলব্ধ "শ্রীশ্রীজগন্মাতার মহাবির্ভাব"-বাণী সাধারণ্যে প্রচারিত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

এই গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গতঃ শ্রীঅরবিন্দের কয়েকখানি পত্র ও শ্রীমায়ের প্রার্থনা মুদ্রিত হইয়াছে। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় লিখিত পত্র ও প্রার্থনাগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন সুধী সাধক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহোদয়। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র আজ পরলোকে; তাঁহার উদ্দেশে কৃতজ্ঞ-চিত্তে আমরা এ ঋণ স্বীকার করিতেছি। শ্রীঅরবিন্দের পত্র ও শ্রীমায়ের প্রার্থনাগুলির মধ্যে কতকগুলি স্থান গ্রন্থকার *italics* অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহা উক্ত পত্রাংশগুলিকে প্রাধান্য দিবার জন্য নহে; পাঠকসাধারণের মনোযোগ বিশেষ-রূপে আকর্ষণ করিবার জন্যই এই অক্ষরের রূপ-পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত শ্রীঅরবিন্দকে পড়িয়া শোনানো হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীঅরবিন্দের অনুমোদন

লাভ করা সত্ত্বেও, সে-সময় গ্রন্থখানি ছাপাইবার সুযোগ হয় নাই। বর্ত্তমানে গুরুকৃপায় এ-সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় আমরা নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

পরম শ্রদ্ধেয় সলিসিটর শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায় ও ময়মনসিংহ গৌরীপুরের কুমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী মহোদয় বিশেষ উৎসাহ দান ও অর্থানুকূল্য না করিলে "শ্রীশ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীজগন্মাতার মহাবির্ভাব" হয়তো পাণ্ডুলিপির মধ্যেই বন্দীজীবন যাপন করিত,—মুদ্রিত গ্রন্থের আকারে মুক্তবায়ুতে তাহার মুক্তিলাভ হইত না। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাঁহারা যে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থ-মুদ্রণ-কালে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের গুরুভ্রাতৃগণ বিবিধ প্রকারে আমাদের যে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রত্যেকের কাছেই আমরা বিশেষ ঋণী।

এই গ্রন্থের স্বত্বাধিকার শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীমায়ের শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।—ইহার কোনরূপ আয়ের সহিত গ্রন্থকার বা প্রকাশকের কোন সম্বন্ধ নাই। ইতি

বিনীত
শ্রীকেদারচন্দ্র সরকার

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
১৫ই আগষ্ট, ১৯৫২

ভূমিকা

আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যোগী-ঋষি-মহাপুরুষদের সাধন-ক্ষেত্র—দিব্য-লীলা-নিকেতন। শ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারীও আবির্ভূত হইয়াছিলেন এই ভারতবর্ষেরই বাংলাদেশের একটি পল্লীগ্রামের পুণ্য-পূত মৃত্তিকায়। প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবন যেমন এক একটি বিশিষ্ট মহিমায় ভাস্বর হইয়া উঠে, ব্রহ্মচারীবাবার জীবনও মহিমোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। পরন্তু সে বৈশিষ্ট্য নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছিল একটি অভিনব আকারে। অধ্যাত্ম-সাধনায় সিদ্ধ হইয়াও তিনি দেশকে ভোলেন নাই;—দেশের মুক্তির জন্য, সমাজের সংস্কারের জন্য তিনি দেশকর্ম্মীদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহার নৈর্ব্যক্তিক অধ্যাত্ম-শক্তির দ্বারা এবং প্রত্যক্ষরূপে তাঁহাদের সহিত সংযোগ-স্থাপন করিয়াছিলেন ব্যক্তিত্বের বিপুল প্রভাবে নানারূপে নানা অবস্থায়।

ব্রহ্মচারীবাবাকে আমরা দেখিতে পাই আদ্যাশক্তি মহামায়ার বাণীবাহরূপে। শ্রীশ্রীজগন্মাতার মহাবির্ভাবের অমৃতবার্ত্তা তিনি আর্ত্ত জগদ্বাসীর কাছে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। একদা অমরার দেবতাবৃন্দ যখন অসুর-পীড়নে বিপর্য্যস্ত, সেদিন মহাশক্তিরূপিণী মহাদেবী তাঁহার শাশ্বত আবির্ভাবের বাণী

শুনাইয়া নিখিল বিশ্বের প্রাণীকে এই কথা বলিয়া আশ্বাস দান করিয়াছিলেন যে,

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

আজ সমগ্র জগতে এই দানবোত্থানের যুগে পুনরায় শ্রীশ্রীজগন্মাতার মহাবির্ভাবের আগমনী-বাণী ঘোষণা করিয়াছেন আদ্যাশক্তির প্রতিনিধিস্বরূপ শ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারীবাবা। শ্রীশ্রীজগন্মাতা ব্রহ্মচারীবাবাকে বলিয়াছিলেন, "জগতে শান্তিস্থাপন করিবার জন্য, সমুদয় দেবদেবী সমভিব্যাহারে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি। এবার দেবতা ও মানবে অপূর্ব্ব লীলা করিব।"

যে-সিদ্ধমহাপুরুষের কণ্ঠে এই মাতৃবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, তিনি প্রসঙ্গান্তরে একদিন তাঁহার একজন শিষ্যকে বলিয়াছিলেন যে, "কোন চিন্তা নাই। সন্তানের অপার দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া এবার মা স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং এবং জগতের সদ্ব্যক্তিগণের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মীশক্তি প্রকাশ-করতঃ শান্তিস্থাপন কার্য্য সম্পাদন করিবেন। প্রতিকূল অবস্থা-সকল মায়ের ইচ্ছাতেই অনুকূল হইয়া আসিবে।" গ্রন্থকার শ্রীযোগানন্দ প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক সমগ্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ সন্ধান করিয়া এই আবির্ভূতা জগন্মাতার মহামানবী বিগ্রহ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের মনস্বী সাধক শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় শ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারীবাবার জীবন, আদর্শ ও কর্ম্মধারা সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিয়া গ্রন্থখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহারই

নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা আজিকার বিপজ্জালজড়িত বাঙ্গালীকে মুক্তিপথের সন্ধান দিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থকার শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারীবাবার পবিত্র জীবনের পুণ্যকাহিনী বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁহার নিজের জীবনেরও একটি বিশেষ দিক স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থকার সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের কৃচ্ছ্রসাধনকালে সর্ব্ববিধ অবস্থার মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছেন—অনাগত ভবিষ্যতের নীরন্ধ্র অন্ধকারে দীপ-বর্ত্তিকাহস্তে প্রমূর্ত্ত হইয়া পথ প্রদর্শন করিতেছেন ব্রহ্মচারীবাবা। তাঁহার মহাসমাধিলাভের পরেও শ্রীযোগানন্দ এই আলোক-সম্পাতের পরম করুণা হইতে বঞ্চিত হন নাই। সেই প্রদীপ্ত দীপশিখা পথ দেখাইতে দেখাইতে অবশেষে শ্রীযোগানন্দকে উপস্থিত করিল তাঁহার অভিলষিত "সমুদ্রতীরে", যাহার ইঙ্গিত বহুকাল পূর্ব্বে ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

মানুষ আজ অশান্তির অকূল পাথারে পড়িয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় দিশাহারা হইয়া একই আবর্ত্তের মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গের এক একটি আঘাতে তাহার দৃষ্টি আজ ফেন-সঙ্কুল, তাহার লক্ষ্য আজ পথিভ্রষ্ট। আমাদের বিশ্বাস —"শ্রীশ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীজগন্মাতার মহাবির্ভাব" গ্রন্থখানি দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের মত দুর্ব্বিপাকের-দুস্তর-প্রবাহে-পতিত বিশ্ববাসীকে কূলের সন্ধান করিয়া দিবে।

৫৫ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলিকাতা

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী



সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

যেমন বুঝিয়া আসিতেছি। আমার
উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব হইতেই — তোমার গর্ভ-
ধারিণী যে অসাধ্যসাধন ও দেহ —
ধারণোপায় ও সাধনা দিয়া।

আমার প্রার্থনানুযায়ী আশীর্ব্বাদ
করুন যে তুমি এই ভগবানের আদ-
শের — যেমন তোমার জন্ম আমা-
আমা আশীষ। আমি দুঃখ দেই না —
তুমি ও গর্ভধারিণী — আমার দুঃখ
দোষেতে এখন — বড় হইয়াছ শ্রদ্ধা-
হেম সাধ-জননী — সহ। বাবা
তুমি তোমার আমাকে আশীর্ব্বাদ —
ও সাধনা দিয়া আমাকে এখন দূরে
জন্ম দিলেন। এবং সাধক আশীষ
আমাকে সাধনে দেখাইয়া দিয়া আমার
যে অসাধ্য ধারিলেন। এখন আমাকে
সদাই দেখ, আমার আশীর্ব্বাদ —
সকলের মধ্যে বিশ্বাস করিতে। আর
ও যাহাদের আমার (আমার —) আমা
দেবতা সম — স্নেহ — ইহা যেমন মধুর
সংসারে প্রেমতি হইবে শ্রীশ্রীমাতার ভাব

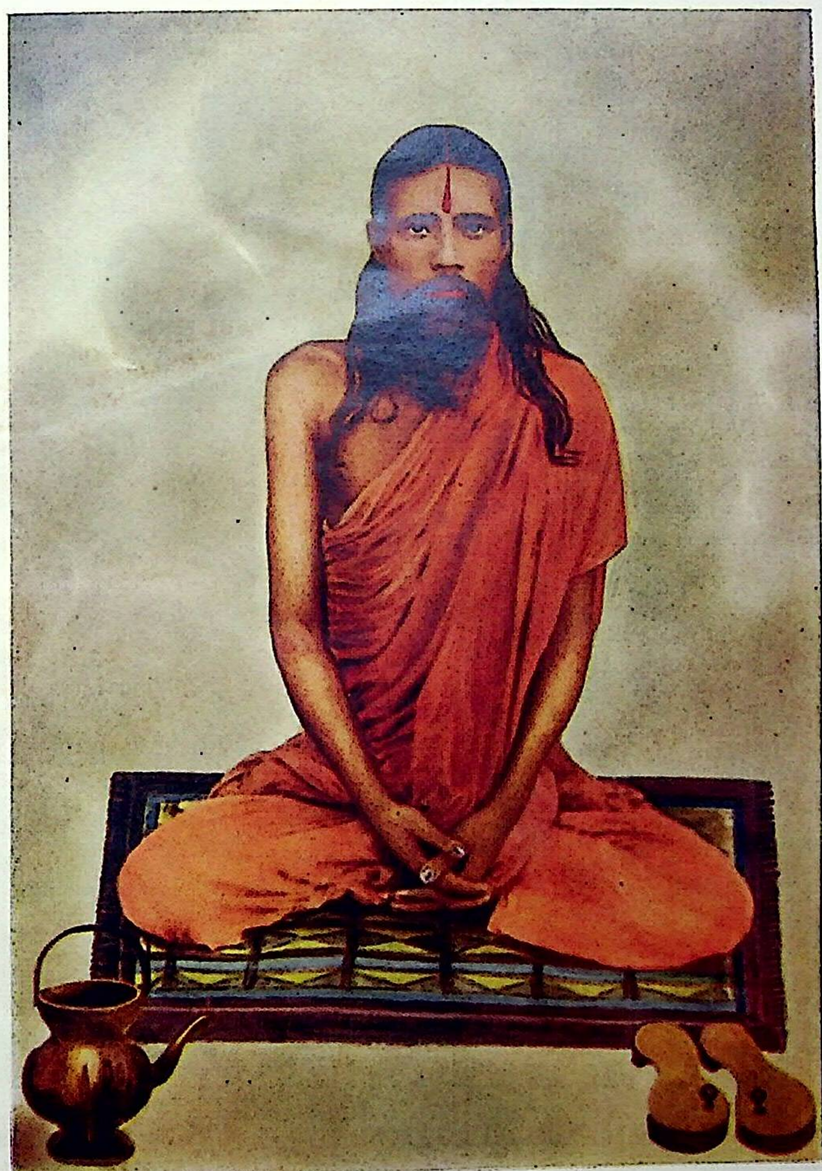
প্রণাম করিব। তৎসঙ্গে ভক্ত-মণ্ড-
লীর প্রণাম, যাতে ছাত্র-মা-
ন্যবর করিয়া দেবতা মানবের-
সাধিকার অপূর্ব সেবা করিয়া।

তাহাদের আমার শ্রীমন্মহাপ্রভুর
লেখা দেবতার ও আবির্ভাব, নানা-
[illegible] নদী-ক্ষেত্র-জাতির মাঝে
লোকের এবং পূর্ব-ই ধর্ম, বাংলা
অবতার, ও বুদ্ধ-সম্প্রদায়-ইত্য
াদি পূর্ণ করিয়া, লোকসমাজে
উদ্ধার-সংসারের নাম। এই
মা, দেবতার মন্দির-শিখরের ন্যা
য় হইয়াছে। ইহা লোকের লোক
সমাজ করিয়া-এই পূর্ণ সেই ভাবে
মূর্তি আবির্ভাব হইল। আবির
্ভাবে প্রতিমা মাত্র করিয়া আ
মি যে লেখা আমার করিয়া
ছিলাম, তাহাতে বুঝিবে। ইতি

তদা:—

ভোলা—





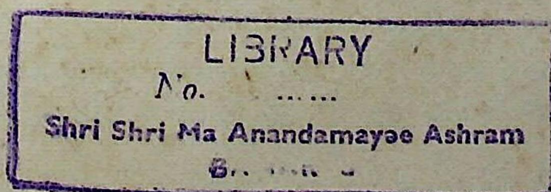
সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারী

আবির্ভাব—১২ই শ্রাবণ, ১২৮১

তিরোভাব—২৮শে ভাদ্র, ১৩৩৩

প্রথম খণ্ড

শ্রীঅনিলবরণ রায়



পুণ্যভূমি ভারত

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে এবং প্রাকৃত শক্তিসকলের উপর আধিপত্য বিস্তারে মানুষের প্রগতি হইয়াছে বিস্ময়াবহ—অণুর মধ্য হইতে সম্প্রতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যে বিরাট শক্তি মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে আশা হয় যে, বাহ্য জগতে মানুষের অসাধ্য আর কিছুই থাকিবে না—এই শক্তির সদ্‌ব্যবহার করিতে পারিলে পৃথিবী হইতে দারিদ্র্য চিরতরে বিদূরিত হইবে, কাহাকেও আর কষ্টকর শ্রম করিতে হইবে না—সকলেই সমৃদ্ধ ও সচ্ছল জীবন যাপন করিয়া নিজ নিজ শক্তির ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ করিয়া পার্থিব জীবনকে পূর্ণভাবেই উপভোগ করিতে পারিবে। অন্যপক্ষে মানুষের মতিগতি এখনও যেরূপ রহিয়াছে—পরপীড়ন, পরস্বাপহরণ, আত্মোদরস্ফীত করা, দানবীয় বাসনাসকল তৃপ্ত করা—যদি এইরূপই থাকে তাহা হইলে পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া মানবজাতি শীঘ্রই ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবে। ইহার প্রতিকার কল্পে কেহ কেহ বলিতেছেন বৈজ্ঞানিক গবেষণার গতি রুদ্ধ করা হউক, বৈজ্ঞানিকগণকে সংযত করা হউক। কিন্তু ইহা সম্ভবও নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে। প্রকৃত প্রতিকার হইতেছে মানুষের বাহিরের জীবন যেমন অগ্রসর হইতেছে—তাহার ভিতরের জীবনকেও সেইভাবে বিকশিত ও প্রগতিশীল করা, মানুষের মন প্রাণ হৃদয়ের এমন বিকাশ ও উন্নতি সাধন করা যেন মানুষ তাহার নবার্জিত জ্ঞান ও শক্তিসকলের সদ্ব্যবহার করিয়া পৃথিবীতে ঐক্যের, শান্তির, প্রেমের, সৌন্দর্য্যের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে—এবং ইহা কেবল অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারাই সম্ভব। পাশ্চাত্য জগৎ এই সত্য উপলব্ধি করিতে আরম্ভ

করিয়াছে—কিন্তু বাহিরের জীবনকে গঠন করিতেই তাহারা এত ব্যস্ত যে ভিতরের দিকে দৃষ্টি দিবার তাহাদের অবসর হইতেছে না।

এই কার্য্য করিতে হইবে ভারতকে—ভারত ইহারই জন্য যুগ যুগ ধরিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। এই কার্য্য আদৌ সহজ নহে—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রভাবে মানুষ এমনই বহির্মুখী হইয়া পড়িয়াছে যে, আত্মা, ভগবান, অমৃতত্ব, অবিমিশ্র আনন্দ, বিশ্বপ্রেম ও মৈত্রী—এই-সব জিনিষ বিশ্বাস করা দূরের কথা, ধারণা করাও তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে—আর এই নাস্তিক মনোভাব ভারতবাসীকেও, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভারতবাসীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। কিছু-দিন পূর্ব্বেও আমাদের দেশের স্কুল কলেজের কোন কোন শিক্ষক পাশ্চা-ত্যের অনুকরণে জড়বাদী ও নাস্তিক্যভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাহাদের দ্বারা শিক্ষিত ছেলে মেয়েরাও তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছিল। সুখের বিষয় যে বর্ত্তমানে কয়েকটি অনুকূল পরিস্থিতির আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথমতঃ ইউরোপের জড়বাদী সভ্যতার আত্ম-বিধ্বংসী পরিণাম দেখিয়া লোকে উহার উপর আস্থা হারাইতেছে। অন্যদিকে ইহার ভিত্তিস্বরূপ জড়বিজ্ঞানও একে একে এমন সব তথ্য আবিষ্কার করিতেছে যাহাতে এ-কথা আর কেহই জোর করিয়া বলিতে পারিতেছে না যে, জগতে জড়ই চরম সত্য, জড় সম্বন্ধে বিজ্ঞানের ধারণা ও পরিকল্পনা এমনই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে জড়শক্তি ও চৈতন্যশক্তির মধ্যে প্রভেদ বা সীমানির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এই জগৎ-ব্যাপারের মূলে এক চৈতন্যময় অনন্তশক্তিময় ভগবান রহিয়াছেন এই কথাটা বৈজ্ঞানিকদের দিক দিয়া স্বীকার করিতে আর কোন বাধা থাকিতেছে না।

তথাপি মানুষের মনের মোড় ফিরিতে আরম্ভ করিলেও, আধ্যাত্মিকতার প্রসার এখনও সুগম হয় নাই, আর ভারত ছাড়া

এ-বিষয়ে অগ্রগামী হইয়া পথ দেখান পৃথিবীর অন্য দেশের পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। একমাত্র ভারতই এই পথ দেখাইতে পারে এবং তাহা ভারতের নিজেরও একমাত্র মুক্তির পথ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"আবার ভারত জগৎকে জয় করিবে, সেইদিন আসিয়াছে। উঠ, ভারত, তোমার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎকে জয় কর......এখন এমনভাবে কাজ করিতে হইবে যেন ভারতের অধ্যাত্ম ভাবধারা গভীরভাবে পাশ্চাত্য দেশকে প্লাবিত করিয়া দেয়। আমাদিগকে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে হইবে, আমাদের আধ্যাত্মিকতা দিয়া, আমাদের দার্শনিকতা দিয়া জগৎ জয় করিতে হইবে। ইহা ছাড়া আর অন্য পন্থা নাই, ইহা আমাদিগকে করিতেই হইবে, নতুবা মরিতে হইবে। ভারতে জাতীয় জীবন গঠন করিবার, জাগ্রত ও শক্তিশালী জাতীয় জীবন গঠন করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে ভারতীয় ভাবধারা দ্বারা জগৎকে জয় করা।"

ভারত কি ভাবে এই মহৎকার্য্যের জন্য নীরবে প্রস্তুত হইয়াছে তাহার নিদর্শন যুগে যুগে ভারতে বহু আধ্যাত্মিক শক্তিশালী মহাপুরুষের আবির্ভাব, সাধুসন্তের আবির্ভাব—আজ পর্য্যন্ত এই ধারা সমান ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে, যদিও বাহ্যতঃ তাঁহাদের কার্য্য সর্ব্বদা সাধারণের তেমন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমরা এখানে এইরূপই একজন সিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি—তিনি পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীশ্রীমৎ বাবা ভারত ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত ছিলেন—তাঁহার একজন শিষ্য ভারত পর্য্যটনে বাহির হইয়া তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"আমি এত তীর্থ ভ্রমণ করিলাম কিন্তু এ পর্য্যন্ত মনের মত সঙ্গ মিলিল না।" ইহার উত্তরে ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"আমি বিস্মিত হইলাম যে, পর্য্যটনে বাহির হইয়া প্রায় সারা ভারত ভ্রমণ করিয়াও তোমার প্রকৃত সঙ্গ মিলিল না। ইহা তোমার ভুল। কারণ এই যে

পুণ্যভূমি ভারত, যাহার তুলনা দিতে এ মর জগতে অন্য কোন স্থান নাই এবং যে ভূমিতে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তিস্বরূপ কোটি কোটি সিদ্ধ মহা-পুরুষ ও কত কত অবতারাদি পূর্ণাংশ কলারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহাদের সাধনার স্থান লীলাভূমি অনন্ত ক্ষেত্রপীঠে পরিণত হইয়াছে অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহারা অমরত্ব দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্থূলে সূক্ষ্মে বিচরণ করি-তেছেন, তবুও তুমি বলিতেছ কিনা যে তোমার সৎসঙ্গ মিলিল না।

মায়ের আদেশে আমাকে যে সমুদয় তীর্থে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল তাহার প্রত্যেক স্থানেই তীর্থদেবতার অভয়বাণী পাইয়া আসিয়াছি। আমার সাধন অবস্থাতেও কত দেবদেবীরূপে, কত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ এবং রামকৃষ্ণ অবতারাদি আবির্ভূত হইয়া আমাকে বর ও অভয় প্রদানে অনুরক্ত করতঃ সাধনায় অগ্রসর করাইয়াছেন।"

(ব্রহ্মচারী বাবার জীবনী ও পত্রাবলী, ১৪৯ পৃঃ শ্রীমান্ মোক্ষদানন্দ হৃষীকেশ)

শ্রীমৎ ভারত ব্রহ্মচারী তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না, স্কুলে পড়েন নাই, কিন্তু ঐকান্তিক সাধনার দ্বারা তিনি বেদ বেদান্তের সার উদ্ধার করিয়া অতি সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন এবং এ-যাবৎ ভারতে যে-সব অধ্যাত্ম সাধনা চলিয়া আসিয়াছে—তাঁহার মধ্যে সে-সবের এক গভীর সমন্বয় হইয়াছিল। তিনি বৃক্ষতলবাসী সন্ন্যাসী হইলেও দেশ ও সমাজের প্রতি উদাসীন ছিলেন না—ব্যক্তিগত জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে দিব্যদৃষ্টি লইয়া তিনি সূত্রাকারে যে-সব উপদেশ দিয়া গিয়াছেন সেই সবের অণুসরণ করিয়াই ভারতে নব জাতীয়তা গঠিত হইবে—ভারত নিজ ভাবধারার দ্বারা সমগ্র জগৎকে জয় করিতে পারিবে।

দীক্ষা ও সাধনা

ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী হইতে আমরা দেখিতে পাই তিনি পরপর তিন জন গুরুর নিকট বিভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন বটে—কিন্তু দৈনন্দিন সাধনায় তিনি সাক্ষাৎভাবে হৃদিস্থিত জগদ্‌গুরুর দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছিলেন। এইরূপ সাধনা অতিশয় কঠিন এবং দুই একজন অসাধারণ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব—কারণ সাধারণতঃ দেখা যায় অধ্যাত্ম সাধানায় পদে পদে সাক্ষাৎভাবে গুরুর সাহায্য প্রয়োজন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"বৈদ্যের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না। সাধুসঙ্গ একদিন করলে হয় না; সর্ব্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। আবার বৈদ্যের কাছে না থাকলে নাড়ীজ্ঞান হয় না; সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হয়। তবে কোনটি কফের নাড়ী কোনটি পিত্তের নাড়ী বোঝা যায়। সাধু সঙ্গে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়; তাঁর উপর ভালবাসা হয়। ব্যাকুলতা না হলে কিছুই হয় না। সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়।"

ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা ব্রহ্মচারীবাবার স্বভাবসিদ্ধ ছিল—তিনি যেন ইহা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এবং এই ব্যাকুলতাই তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত সিদ্ধিতে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। তিনি সহজ বোধের দ্বারাই বুঝিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরলাভই মানব জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, এবং ঈশ্বরলাভের একমাত্র উপায় হইতেছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমপণ শুধু মুখের কথাতেই হইলে চলিবে না—আমাদের দেহ, প্রাণ, হৃদয়, মনের সকল ক্রিয়া, সকল ভাব যখন একমাত্র ভগবদ্ ইচ্ছায় পরিচালিত হইবে, আমাদের মধ্যে অহংভাব বা বাসনা-কামনার

বা "মনে মনে পছন্দ" করার লেশমাত্র থাকিবে না—তখনই হইবে আমাদের পূণ সমর্পণ। তাহার পর আর সাধনা নাই, তাহার পর আর আমাদিগকে কিছুই করিতে হইবে না, ভগবৎশক্তি আপন অভ্রান্ত-ভাবে আমাদের মধ্যে কর্ম্ম করিয়া আমাদিগকে সকল সিদ্ধি আনিয়া দিবেন। ব্রহ্মচারীবাবা প্রথম হইতেই এই আত্মসমর্পণই অভ্যাস করিয়াছিলেন—এবং ইহার বাহ্য সহায়স্বরূপ তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন যে, ভগবানের প্রত্যাদেশ না পাইলে কোনদিন তিনি অন্ন গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার সাধনাবস্থায় অনেক দিন তিনি এই প্রত্যাদেশ পান নাই—তিনি নিজে বলিয়াছিলেন, মাসের মধ্যে ৫।৭ দিনের অধিক তাঁহার আহার হইত না। ইহাকেই বলে জীবনপণ। ভগবানের আদেশ ভিন্ন কিছু করিবেন না, এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তিনি জীবন পণ করিয়াছিলেন। এবং এইভাবেই তিনি জগন্মাতার সহিত একাত্মতা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন,

"But a time will come when you will feel more and more that you are the instrument and not the worker. For first by the force of your devotion your contact with the Divine Mother will become so intimate that at all times you will have only to concentrate and to put everything into her hands to have her present guidance, her direct command or impulse, the sure indication of the thing to be done and the way to do it and the result. And afterwards you will realise that the divine Shakti not only inspires and guides, but initiates and carries out your works; all your

movements are originated by her, all your powers are hers, mind, life and body are conscious and joyful instruments of her action, means for her play, moulds for her manifestation in the physical universe. There can be no more happy condition than this union and dependence; for this step carries you back beyond the border-line from the life of stress and suffering in the ignorance into the truth of your spiritual being, into its deep peace and its intense Ananda."

(The Mother—Sri Aurobindo. p 29-31)

"কিন্তু একদিন আসবে যখন ক্রমেই তোমার এ অনুভব বৃদ্ধি পাবে যে তুমি যন্ত্র, কর্ম্মী নও। কারণ প্রথমতঃ ঐকান্তিক নিষ্ঠার বলে মায়ের সাথে তোমার মিলন এমন নিবিড় হয়ে উঠবে যে কেবল তদ্‌গত হয়ে তাঁর হাতে সর্ব্বস্ব অর্পণ করলেই তাঁর আশু নির্দ্দেশ, তাঁর প্রত্যক্ষ আদেশ ও প্রেরণা পাবে—কি করতে হবে, কি উপায়ে করতে হবে, ফলই বা কি, এসকলের অভ্রান্ত সন্ধান মিলবে। এর পরে তোমার উপলব্ধি হবে ভাগবতী শক্তি কেবল প্রেরণা দেন না, পথ দেখিয়ে চলেন না, পরন্তু তোমার কর্ম্মের প্রবর্ত্তন ও উদ্‌যাপন তিনিই করেন। তোমার সকল গতিবিধির উৎস তিনি, তোমার সকল শক্তি তাঁরই, তোমার মন প্রাণ দেহ তাঁর ক্রিয়ার চৈতন্যময় আনন্দময় যন্ত্র, তাঁর লীলার উপকরণ, স্থূল জগতে তাঁর প্রকাশের আধার। এই ঐক্য ও নির্ভর অপেক্ষা সুখের অবস্থা আর কিছু হতে পারে না, এই পদে উঠে দাঁড়ালে অজ্ঞানের যে সংঘর্ষময় বেদনাময় জীবন তার সীমানা পার হয়ে তুমি প্রবেশ করবে

এসে তোমার অধ্যাত্ম সত্তার সত্যের মধ্যে, তথাকার গভীর শান্তির, তীব্র আনন্দের মধ্যে। (শ্রীঅরবিন্দ—মা—২৮-২৯ পৃঃ)

শ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারী জগন্মাতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা দুঃখ ও অশান্তিময় সাধারণ মানবজীবনের উর্দ্ধে এই গভীর শান্তি ও প্রগাঢ় আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন, ভিতর হইতে ভগবদ্ আদেশ না পাইলে কিছুই করিবেন না—ইহা অতি কঠিন ও কঠোর সাধনা এবং সকলের পক্ষে সম্ভবও নহে, নিরাপদও নহে। কারণ যতদিন না চিত্তশুদ্ধি হইতেছে, সকল অহংভাব ও বাসনা কামনা নির্ম্মূল হইতেছে—ততদিন অন্তর্দেবতার বাণী ঠিক মত সকল সময়ে শুনিতে পাওয়া যায় না—অনেক সময় নিজের বাসনা-কামনার প্রতিধ্বনিকেই ভগবানের বাণী বলিয়া ভুল হয়। তাহা ছাড়া জগতে এমন অনেক আসুরিক শক্তি আছে তাহারা ভগবানের ছদ্মবেশ ধরিয়া আমাদের নিকট আসে, আমাদের কর্ণে নানা কুমন্ত্রণা দেয়, সাধক অতি সতর্ক না থাকিলে সেই সবকেই ভগবানের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করে এবং তাহাতে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়া যায়। এই জন্যই গুরুর সাহায্য প্রয়োজন হয়—গুরুকেই ভগবানের প্রতিনিধি জানিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে হয়, তাঁহারই বাক্যকে ভগবদ্-বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। গুরুর নিকট পূর্ণ আত্মসমপণ সিদ্ধ হইলেই ভগবানের নিকট পূর্ণ আত্ম সমর্পণ সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেন—"ঈশ্বর কি সিদ্ধি করা যায়? তাঁহার কৃপাদ্বারাই সিদ্ধি হয়। গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁর আদেশই ঈশ্বরের আদেশ জ্ঞানে পালন করিলেই ঈশ্বরের কৃপালাভ হয়। তোমরা মনে রাখিও যিনি ঈশ্বরের ঈশ্বরী, তাঁরও বাবা আমি। কারণ আমার আদেশ পালনই তোমাদের সাধন। অথাৎ তোমরা যাহারা আমার নিকট আসিয়াছ, তাহাদের সিদ্ধি আমার হাতে। যাহা হউক আমার

কথায়ও হবে না, তোমাদের ভাবও চাই। কারণ গুরুতে অভক্তি অবিশ্বাস আসিয়া, অনেক সাধক অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করে। আমাকে তোমরা স্বতন্ত্র ভাব আর না ভাব, আমার বাক্য ভগবদ্‌বাক্য।"

(ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ১৭৯পৃঃ)

কিন্তু গুরু সদ্‌গুরু হওয়া চাই—যিনি সাধনার দ্বারা ভগবানের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়াছেন তাঁহার ভিতর দিয়াই শিষ্যও ভগবানের সহিত একাত্মতা লাভ করিতে পারে—অন্য কাহারও ভিতর দিয়া নহে। অতএব নিজেদের যতদূর সাধ্য বিচার করিয়া তবে গুরু স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন—"গুরু কিনা সদ্‌গুরু জীবন্মুক্ত। স্বয়ং জীবন্মুক্ত বা বিদেহমুক্ত না হইলে তাহা জানা যায় না, সন্দেহ থাকে। এই সন্দেহবশতঃ গুরুবাক্যেও ভ্রম জন্মিতে পারে। অন্যান্য ঋষিদের উপদেশবাক্য গুরুবাক্যের সহিত ঐক্য হইলে গুরুবাক্যে সন্দেহ থাকে না, তখন অবিচারে সদ্‌গুরুর উপদেশ প্রতিপালন করিবার বাসনা ও শক্তি জন্মে।

তান্ত্রিকদের পঞ্চ "ম"কার সাধন, বৈষ্ণবদের কিশোরী-ভজন ইত্যাদি উপাসনা-প্রণালীর উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় গুরু-আখ্যাধারী উপদেষ্টাগণ জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করতঃ সমাজে গুরুতর দুর্নীতি ও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিতেছেন। এই সব উপদেশ গুরুবাক্য (সদ্‌গুরুর উপদেশ বা ঋষিবাক্য) কিনা তাহা অনেকেই বুঝিতে চেষ্টা করেন না। বিশেষতঃ অক্ষরজ্ঞানহীন ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ জনসাধারণের তাহা বুঝিবার প্রয়োজন বোধ এবং শক্তির একান্ত অভাব। স্বয়ং অসিদ্ধ-গুরু গুরুত্বের গুরুভারে নিজেও ডুবেন, শিষ্যকেও ডুবান। যিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু তিনি সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করিবেনই, মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে মুক্তির নিকট উপস্থিত না করিয়া ছাড়িবে না, সুতরাং বিচার ও শাস্ত্রসাহায্য তাঁহার পক্ষে অনিবার্য্য। বর্ত্তমানে গৃহস্থগণের

অনেকেই ৮৬/১৯৮=ক্রান্তি শক্তি অন্নবস্ত্র সংগ্রহে অপব্যয় করিয়া সামাজিক রীতি রক্ষার্থ দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করতঃ বাকি এক ক্রান্তি শক্তি শুধু ১০৮ বার জপেই নিঃশেষ করেন। এ জীবনে ঈশ্বরলাভ অসম্ভব ভাবিয়া ইঁহারা ঈশ্বর বা মুক্তি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইতে দূরে থাকেন, সুতরাং গুরু বা গুরুবাক্য বিচার নিষ্প্রয়োজন বোধ করেন।"

আমাদের দেশে একটি নিতান্ত অজ্ঞান প্রথা প্রচলিত আছে—কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইতে হইবে। "কুলগুরু" কথাটিরই ভুল অর্থ করা হইয়াছে—ইহার প্রকৃত অর্থ তান্ত্রিকগুরু, কৌল সাধনা বলিতে তান্ত্রিক সাধনাই বুঝায়। পূর্ব্বকালে দ্বিজগণের উপনয়নের সময় যে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হইত—তাহা ছাড়া আর অন্য কোন দীক্ষা ছিল না। পরে তন্ত্রের প্রভাব বর্দ্ধিত হওয়ায়, এই রীতি হয় যে বৈদিক দীক্ষা হইলেও তান্ত্রিক গুরুর নিকট পুনরায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লওয়া প্রয়োজন। ইহা হইতেই "কুলগুরু" প্রথা প্রচলিত হয়—এবং কর্ণে মন্ত্র দেওয়া যে-সকল ব্রাহ্মণের জীবিকা হইয়া দাঁড়ায় তাঁহারাই এই বিধান দেন যে গুরুবংশে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার নিকট হইতে মন্ত্র না লইলে নির্ব্বংশ হইতে হইবে। সেই "কুলগুরু" সাধন-ভজনহীন মূর্খ হউক এমন কি দুশ্চরিত্র মাতাল হউক, লোকে নির্ব্বংশ হইবার ভয়ে তাহারই নিকট তথাকথিত দীক্ষা গ্রহণ করে—ইহার ফলে যে কি রকম ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। লোক ইহা বুঝিয়াও বুঝে না—অন্ধ গতানুগতিকভাবে ঐ প্রথা অনুসরণ করিতেছে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে অনেক ধর্ম্মাচরণই এইরূপ মিথ্যা, অর্থহীন, কুসংস্কারপূর্ণ। ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার সাধন বলে যে সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন—তাহার অনুসরণ করিয়াই এই ধর্ম্মের গ্লানি দূর হইয়া পুনরায় ধর্ম্ম সংস্থাপন হইতে পারে। এই বিষম অনর্থকর কুলগুরু প্রথা সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শে পরিচালিত "ভারত

সমাজ” পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে—“ব্রহ্মের সগুণতত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং নির্গুণ তত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতি এই উভয় প্রকার অনুভূতি ব্যতীত সদ্‌গুরুর বংশধরগণও দীক্ষা বা তত্ত্বোপদেশ প্রদানে অনধিকারী (অসমর্থ)।”

“দীক্ষা কাহাকে বলে? যদ্দ্বারা আত্যন্তিক জ্ঞানলাভ হয় এবং সর্ব্ব পাপ বিদূরিত হয়, শাস্ত্রকারগণ তাহাকেই “দীক্ষা” বলিয়াছেন। সদ্‌গুরু সাধারণভাবে উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মভাব বুঝাইয়া থাকেন। এই দীক্ষার পর তত্ত্বমস্যাদি বৈদিক মহাবাক্য দ্বারা জীবব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিয়া দেন, তাহাই ব্রহ্মদীক্ষা। ব্রহ্মদীক্ষালাভ ব্যতীত কেহই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রাহ্মণ্যলাভের অধিকারী হইতে পারে না। বর্ত্তমান সমাজে ব্রহ্মদীক্ষার অভাববশতঃ যথার্থ ব্রাহ্মণেরও সংখ্যাভাব ঘটিয়াছে।”

(“ভারতসমাজ” পৃঃ২৪)

সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা বা উপনয়ন বলিতে কি বুঝায় এবং এই জগতের পরম বস্তু কি তাহা ব্রহ্মচারীবাবা সহজ ও সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন—তাঁহারই কথা একটি পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“একটি তত্ত্ব তাহাকে সাধক অন্তরে অর্থাৎ ভিতরে দেখিতে গিয়া আত্মা বলিয়া থাকেন, আর বাহিরের দিকে দেখিতে গিয়া ঈশ্বর বা মা বলিয়া থাকেন। আর এই অন্তরে বাহিরে কুল না-পাইয়া অর্থাৎ মন বুদ্ধির অগোচর জানিয়া—অসীম বুঝিয়া ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। ইহাই গুরুর মুখে বুঝিয়া লওয়ার নাম দীক্ষা বা উপনয়ন। আর ধর বীজ বা গায়ত্রী। এই ব্রহ্মগায়ত্রী দ্বারা সাধারণভাবে ব্রহ্মকে আত্মাস্বরূপে বহিঃশক্তির ক্রিয়া দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হয়। এই ব্রহ্মগায়ত্রী আবার এক রকম নয়, সাবিত্রী-গায়ত্রীকেও ব্রহ্মগায়ত্রী বলে। এই যে তোমরা এখান হইতে যে গায়ত্রী পাইয়াছ এই গায়ত্রী অবগত হইলেই বুঝিতে পারিবা। যেমন ওঁ পরমাত্মায়ৈ বিদ্মহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম

পরমাত্মা বলিয়া জানি, 'পরতত্ত্বায়ৈ ধীমহি', অর্থাৎ পরতত্ত্ব বলিয়া ধ্যান করি। অর্থাৎ এই সকল তত্ত্বের অতীত জানিয়া ধ্যান করি। 'তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ' সেই ব্রহ্মভাব আমাতে প্রেরণ কর বা দাও।

"এই সকল তত্ত্বের অতীত বা পরতত্ত্ব বলিলেই ইহার পূর্ব্বে আরও তত্ত্ব আছে বুঝায়। এই তত্ত্বই স্থূলাকারে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত বা পঞ্চতত্ত্ব ও সূক্ষ্মাকারে মন, বুদ্ধি, অহং ইত্যাদি। এই সবের পরের তত্ত্বই পরমাত্মা। আর মন হইতে অহংতত্ত্ব পর্য্যন্ত জীবের বদ্ধাবস্থা—-ইহাকে সূক্ষ্মদেহ এবং এই পর্য্যন্ত যাহার গতি তাহাকেই বদ্ধজীব বলে। সাধন বলে যিনি ইহার অতীত হইয়াছেন তাঁহাকেই মুক্তজীব বলে। সাধক উপাসনাপ্রভাবে অহংতত্ত্ব অতিক্রম করিয়া স্থিতিলাভ করিতে পারিলেই তাঁহার সুখ দুঃখের অতীত হওয়াতে তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া থাকে। ইহারা এই মহত্ত্বত্ত্বাবস্থায় থাকিয়াই বহির্জগতের ক্রিয়া সম্পাদন করেন। সাধকের অহংতত্ত্ব অতিক্রম করিবার সময় ভুল হয় অর্থাৎ জলে ডুব দিবার সময়ে অজ্ঞানাবস্থার মত অর্থাৎ ক্ষণিকের জন্য কিছুই মনে থাকেনা, অর্থাৎ ক্ষণিকের জন্য মনই থাকে না। তখনই বলে যে আমার একটু তন্ময় ভাব হয়েছিল—ইহার পরে জ্ঞান হয়, ইহাকেই জ্ঞান বা চৈতন্য বলে এই চৈতন্যই খাটি আমি। এই চৈতন্যেরই আমি, তুমি অর্থাৎ এক বা একাধিক জ্ঞান কিছুই থাকেনা, কেবল আছি মাত্র, বলিবার দরকার বোধ হয় না। শুধু (কেবল) জীবন্মুক্ত মহা-পুরুষ বা অবতারাদি এই অবস্থায় থাকিয়াও অঙ্গুলি সঙ্কেতের মত জগতের কাজ করিতে পারেন, ইহার অতীত তুরীয়াবস্থায়ও থাকিতে পারেন; ইচ্ছা করিলে ইহার অতীতেও স্থিতিলাভ করিয়া থাকেন।

'আমি' অহংভাব, দূর হইয়া অর্থাৎ অহংতত্ত্ব অতিক্রম করার দরুণ তত্ত্বজ্ঞানলাভের অধিকারী হয়। এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরানুভূতির ভাব প্রস্ফুটিত হইলে কেবল প্রতিমাতে কেন আকাশে,

পাতালে, বায়ুতে, অনলে ঈশ্বরজ্ঞান উদিত হইয়া "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং" জানিয়া উপাসনা করিয়া ঈশ্বর (সচ্চিদানন্দ) লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হন।"

(ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী—১২৬পৃঃ)

"পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যেমন জল বিম্ব হইলেও সাগরে রাশি রাশি জল থাকে, এই অনন্ত জীব হইলেও এই 'অখণ্ড মণ্ডলাকারং' ফুরায় না বা তাঁহার শক্তি অনন্তই থাকে। ইহাকেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলে।"

আমরা দেখিতে পাই শ্রীঅরবিন্দ "Arya" পত্রিকায় পূর্ণযোগের এইরূপ বর্ণনাই দিয়াছেন—

"For the sadhaka of the integral Yoga it is well to begin with an idea of the Divine that shall be wide enough for the basis of the integral realisation. The conception that we should choose, might well be that of an infinite, free and perfect unity in which all beings move and live and all can meet and become one,—a unity atonce Personal and Impersonal, personal as the conscious Divine manifesting itself in the universe, impersonal as an infinite existence which is the fount and base and constituent of all beings and all energies. On this unity the thought can concentrate in order that it may not only hold intellectually that it exists, but see it dwelling in all and realise it in ourselves,— one existence that constitutes itself in all things

and exceeds them, one consciousness that supports all action and experience and guides the evolution of things towards their unrealised aim. On That the heart can concentrate and possess it as an universal Love and Delight of being,—a Delight of being that supports the soul in all its experiences, maintains even the errant ego in its ordeals and struggles and finally delivers it from sorrow and suffering and a conscious Love that draws all things by their own path to its unity. On That also the Will can concentrate as the Power that guides and fulfils and is the source of all strength,—in the impersonality a self-illumined Force that containing all results in itself works until it accomplishes, in the personality an all-wise and omnipotent Master of the Yoga whom nothing can prevent from leading it to its goal. This is the faith with which the sadhaka has to begin; for in all effort man proceeds by faith. When the realisation comes, the faith is fulfilled and completed in Knowledge."
(The Arya—The Synthesis of Yoga p. 440)

"যে-কোন নাম বা রূপে, যে-কোন ভাবে ভগবানের উপাসনা আরম্ভ করা যায়—ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত সকল রকম পূজাই ভগবান

গ্রহণ করেন। তথাপি ভগবান সম্বন্ধে ধারণা যত উদার ও মহৎ হইবে, সাধকের পক্ষে তাহা ততই অধিক ফলপ্রদ হইবে। যদি আমাদিগকে পূর্ণযোগের সাধনা করিতে হয়, তাহা হইলে ভগবান সম্বন্ধে এমন ধারণা লইয়া অগ্রসর হওয়া ভাল যাহা পূর্ণ বা সমগ্র, 'সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি'। হৃদয়ে এমন উদার অভীপ্সা জাগাইতে হইবে, যেন আমাদের সিদ্ধি কোন রকমে সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ না হয়। শুধু যে সকল রকম সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভাবই বর্জন করিতে হইবে তাহা নহে, সকল রকম একদেশ-দর্শী দার্শনিক মতও বর্জন করিতে হইবে, যিনি বচনমনের অতীত তাঁহাকে কোন মনগড়া মতবাদের মধ্যে আবদ্ধ করিবার প্রয়াস করিলে চলিবে না। আমাদিগকে ধারণা করিতে হইবে এক চৈতন্যময় সর্ব্বব্যাপী অথচ সর্ব্বাতীত অনন্তের, এক স্বাধীন সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণ ও আনন্দময় অদ্বৈত সত্তা ও ঐক্যের, তাহারই মধ্যে সকল জীব বাস করিতেছে, গতিশীল হইতেছে তাহারই ভিতর দিয়া সকল জীবে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে, এক হইতে পারে। এই শাশ্বত সত্তাকে ব্যক্তিক ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, নির্ব্যক্তিক ভাবেও গ্রহণ করিতে হইবে—কারণ এই দুই ভাবেই তাহা জীবের নিকট প্রকট হয়। তিনি ব্যক্তিক (personal), কারণ তিনি হইতেছেন চৈতন্যময় ভগবান, অনন্তপুরুষ, বিশ্বের সকল দিব্য ও অদিব্য ব্যক্তি হইতেছে তাঁহারই ব্যক্তিত্বের কোনরূপ ভগ্নছায়ামাত্র। তিনি নির্ব্যক্তিক কারণ তিনি আমাদের সম্মুখে প্রকট হন এক অনন্ত সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপে এবং তিনিই হইতেছেন সকল সত্তার এবং সকল শক্তির উৎস, ভিত্তি ও উপাদানস্বরূপ ; আমাদের সত্তা, মন, প্রাণ, শরীরের মূল ধাতু, তিনি আমাদের আত্মা আবার তিনিই আমাদের জড় দেহ। আমাদের মন তাঁহাতে একাগ্র করিতে হইবে, হৃদয় তাঁহাতে একাগ্র করিতে হইবে, ইচ্ছাশক্তি তাঁহাতে একাগ্র করিতে হইবে। মন তাহাতে একাগ্র করার

অর্থ শুধু নহে যে তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে শুধু একটা মানসিক পরিকল্পনা রাখা, অথবা শুধু দর্শন শাস্ত্রের একটি তত্ত্ব বলিয়া তাহার ধারণা করা— চিন্তাকে এমনভাবে তাঁহাতে যুক্ত করিতে হইবে যেন জগতে সকল বস্তুর মধ্যে অধিবাসীরূপে তাঁহাকে স্বীকার করিতে পারি, নিজের মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি, তাঁহার শক্তির কর্ম্ম পরম্পরায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারি। তিনি একমাত্র সৎ বস্তু, যে বিশ্বব্যাপী আনন্দ হইতে সব কিছু জাত হইয়াছে, যাহা দ্বারা সব কিছু গঠিত, যাহার অনন্ত সত্তার একাংশে সব কিছু বিধৃত তিনি তাহাই, তিনিই একমাত্র অনন্ত চৈতন্য, যাহা হইতে অন্য সব চেতন সত্তার উদ্ভব হইয়াছে, যে অসীম সত্তা সকল কর্ম্ম ও সকল অনুভূতির ভিত্তি স্বরূপ, তিনি তাহাই। সকল বস্তু যে ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় তাহাদের অনাগত অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্য ও সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইয়াছে তাহা তাঁহারই ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। হৃদয়কে তাঁহার উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করিতে হইবে, পরম প্রিয় বলিয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে হইবে, তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রেম-মধুরিমায়, তাঁহার আনন্দ-সাগরে ভাসিতে হইবে, স্পন্দিত হইতে হইবে। কারণ তাঁহারই নিগূঢ় আনন্দ জীবকে তাহার সকল সুখ-দুঃখের মধ্যে ধরিয়া থাকে, পথভ্রান্ত অহংকেও তাহার সকল পরীক্ষা, সকল দ্বন্দ্বের মধ্যে রক্ষা করে, যতক্ষণ না সকল দুঃখ, সকল বেদনার চিরঅবসান হয়। তিনি অত্যন্ত প্রেমময় ভগবান, তাঁহারই প্রেম ও আনন্দ সকলকে তাঁহার সুখময় ঐক্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। ইচ্ছাশক্তিকে অবিচলভাবে তাঁহাতে একাগ্র করিতে হইবে, অদৃশ্য শক্তিরূপে তিনিই ঐ ইচ্ছাকে পরিচালন করেন, সার্থকতা ও সফলতা প্রদান করেন, তিনিই উহার সকল শক্তির উৎস। নির্ব্যক্তিকভাবে তিনি হইতেছেন স্বয়ংপ্রকাশ শক্তিস্বরূপ, সকল ফল তাঁহার আয়ত্তাধীন, ধীরভাবে কার্য্য করিয়া তিনি সব কিছুই সিদ্ধ করিয়া তোলেন। ব্যক্তিকভাবে তিনি

হইতেছেন সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশক্তিমান যোগেশ্বর, যোগকে তিনি ইহার লক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন, কেহই তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ নহে। সাধককে এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লইয়াই তাহার সাধনা ও প্রয়াস আরম্ভ করিতে হইবে, কারণ এই সংসারে সকল প্রয়াসে বিশেষতঃ যে ভগবানকে আমরা জানিনা, দেখিনা—তাঁহার উদ্দেশে সকল প্রয়াসে আমাদিগকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। যখন ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, তখন আমাদের সকল বিশ্বাস দিব্যভাবে সার্থক হইবে, এবং জ্ঞানের শাশ্বত জ্যোতিতে পরিণত হইবে।"

ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ

সকল অধ্যাত্ম সাধনার মূল কথা হইতেছে একাগ্রতা, সমস্ত সত্তাকে, সমস্ত চৈতন্যকে ভগবানের দিকে একাগ্র করা। কিন্তু যে ভগবানকে আমরা জানিনা, দেখিনা তাঁহার দিকে কেমন করিয়া একাগ্র হইব? এইখানেই দীক্ষার প্রয়োজন—যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া ভগবান সম্বন্ধে আমাদের মনে একটি ধারণা দেন—সেইটিকে অবলম্বন করিয়াই একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হয়। ধারণার কিছু ত্রুটি বা অপূর্ণতা থাকিলেও ভগবান নিজেই তাহা ক্রমে পূর্ণ করিয়া দেন। অতএব ভগবান সম্বন্ধে যে-যেমন ধারণা লইয়া যেমনভাবে উপাসনা করে তাহাতে বাধা দিতে নাই বা তাহাকে নিরুৎসাহ করিতে নাই। তবে ধারণা যেমন হইবে ফলও তেমনই হইবে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" আমাদের দেশে শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে বহুকাল হইতে ভগবান সম্বন্ধে এই ধারণা চলিয়া আসিতেছে যে, পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম হইতেছেন নির্গুণ নিষ্ক্রিয়;—ঈশ্বর, জগৎ, সৃষ্টি, এ-সব হইতেছে মায়ার খেলা, এ-সবকে বর্জন না করিলে পরতত্ত্বে পৌঁছিয়া পরম মুক্তি লাভ করা যায় না। এই শিক্ষার প্রভাবে ভারতবাসী সংসারকে অসার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে—সকলেই যে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের শিক্ষা অনুসরণ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারিয়াছে তাহা নহে—তবে যাহারা সংসারে আছে তাহারাও কোনরকমে দিনগত পাপক্ষয় করিয়া সংসারে থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। সাংসারিক জীবনকে সর্ব্বতোভাবে সুগঠিত ও উন্নত করিবার যে উৎসাহ ও চেষ্টা পাশ্চাত্য দেশে দেখা

গিয়াছে তাহার অভাবে ভারতবাসী ঐহিক জীবনে দুর্দ্দশার চরম সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জীব ও ব্রহ্ম মূলতঃ এক, ইহা হইতেছে পরম অধ্যাত্ম সত্য এবং মানুষের অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি—তত্ত্বমসি, সোঽহং প্রভৃতি মহাবাক্যে মানুষকে দীক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে। কিন্তু ব্রহ্ম ও জীবে কোন ভেদ নাই, এবং এই জগৎ মিথ্যা—শঙ্করাচার্য্যের এই ব্যাখ্যা, যাহা অদ্বৈতবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে—তাহা উচ্চতম অধ্যাত্ম অনুভূতি ও দৃষ্টি দ্বারা সমর্থিত হয় না, এবং এই অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করিলে সাংসারিক জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। বাংলাদেশে শঙ্করের এই মায়াবাদের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য—মধ্বাচার্য্যের অনুসরণে তিনি 'তত্ত্বমসি' বাক্যের ব্যাখ্যা করেন, "তিনিই আমি" নহে, পরন্তু "তাঁহারই আমি"। জীব ও ব্রহ্মে অচিন্ত্য ভেদাভেদের তত্ত্ব প্রচার করিয়া তিনি শঙ্করের শিক্ষাকে অনেকটা প্রতিহত করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানযোগের উপর ভক্তিযোগের স্থান দিয়াছিলেন। তথাপি ভারতবাসী মায়াবাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। শ্রীচৈতন্য জীব ও ব্রহ্মে একটা প্রভেদ দেখাইলেও এই জগৎ যে সত্য, ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, ব্রহ্মেরই উপাদানে গঠিত—একথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। সে-কথা এ-যুগে প্রথম বলিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলিয়াছেন, "যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী, শক্তি, যিনি পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। আমরা তাকেই মা জগদম্বা বলি" শ্রীরামকৃষ্ণের এই কালী—শঙ্করের মিথ্যাভূতা অচিৎস্বরূপিণী মায়াশক্তি নহেন, তিনি চিন্ময়ী, ব্রহ্মের চিৎ-রূপাশক্তি। বিশ্বপ্রপঞ্চ এই চিৎ-রূপা শক্তির বিপরিণাম, নিখিল সংসার বিলাস রূপে এই চিদেরই ঐশ্বর্য্য, চিৎ-শক্তিরই লীলা। এই জন্যই জগৎ সত্য। কিন্তু ব্রহ্ম সত্যের সত্য, সত্যস্য সত্যম্। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন "আমি দুটাই লই, তা না হলে ওজনে কম পড়ে।"

শ্রীমৎ ভারত ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা নিজ সাধনা দ্বারাই উপলব্ধি করিয়া নিজভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন চৈতন্য রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বর অভয় প্রদানে অনুরক্ত করতঃ সাধনায় অগ্রসর করাইয়াছেন। তত্ত্বমসি মহাবাক্যের তিনি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিয়াছেন। "তত্ত্বমস্যাদি তত্ত্বমসি—আদি অর্থাৎ তত্ত্বমসি ইত্যাদি। তত্ত্বমসি—তৎ (তাহাই) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও)। মহাবাক্য—প্রাচীনকালে তত্ত্ববিদ্‌গণ মুমুক্ষু-দিগকে স্বস্বরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্য, আত্মজ্ঞানবোধক যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—তাহাই মহাবাক্য। চারিটি মহাবাক্য প্রচারিত আছে—তত্ত্বমসি, অহংব্রহ্মাস্মি, সোহং ও ওম্।"

"ভেদ তিনপ্রকার। স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয়। একবস্তুর পৃথক পৃথক অংশে যে প্রভেদ তাহা স্বগত, মানুষের হাত পা চুল নখ, মুখ মাথা বুক চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক ইত্যাদিতে পরস্পরের প্রভেদকে স্বগত ভেদ বলে। একজাতীয় পৃথক পৃথক বস্তুর যে প্রভেদ তাহার নাম স্বজাতীয় প্রভেদ। রাম শ্যাম, যদু মধু ইত্যাদি বহু মানুষের মধ্যে পরস্পর যে প্রভেদ তাহাই স্বজাতীয়। পৃথক পৃথক জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর যে প্রভেদ তাহা বিজাতীয় প্রভেদ। মানুষ, পশু, বৃক্ষ, পক্ষী, জল ও অগ্নি প্রভৃতিতে যে প্রভেদ তাহাই বিজাতীয়।

"আমি সেই—এখানে আমি অর্থে জীব, সেই অর্থে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় সুতরাং জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, জীবের এই অনুভূতি নাই, তত্ত্বজ্ঞের নিকট এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া মনন ও নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করতঃ তাহা উপলব্ধি করিবেন। ব্রহ্ম ও জীব একরূপ পদার্থ হইলেও জীব মায়ার ফেরে পড়িয়া ভ্রমবশতঃ "আমি" (দেহ আমি) অভিমানে আপনার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে। আপনাকে ব্রহ্ম

হইতে পৃথক স্বজাতীয় বা বিজাতীয় প্রভেদ-যুক্ত বলিয়া ভ্রম করিতেছে এই ভ্রম দূর করিবার জন্যই 'সেই আমি' মনন।

"ব্রহ্ম অখণ্ড, তাহাতে অংশ সম্ভবে না, সুতরাং ব্রহ্মে স্বগত ভেদ নাই। জীব তাঁহার সহিত স্বগত প্রভেদ আমি অভিমানে দৃষ্টতঃ উপলব্ধি করে মাত্র।

'আমি তাঁহার' আমি অর্থে জীব, তাঁহার অর্থে ব্রহ্মের অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের অংশ। এখানেও জীবের আমি অভিমান তাহাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক রাখিতেছে। এই দৃষ্টতঃ প্রভেদ বোধ জীবের। ব্রহ্মের নহে।

"আমি সেই, আমি তাঁহার—এই উভয় ভাবনাতেই আমি (জীব) সেই 'তিনি' (ব্রহ্ম) হইতে দৃষ্টতঃ ভিন্ন অনুভূতি হয়। আমি অপূর্ণ, ব্রহ্ম পূর্ণ, আমি অংশ, ব্রহ্ম ভূমা, আমি সদ্বিতীয়, ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, আমি জলবিন্দু, ব্রহ্ম সাগর—আমি অগ্নিকণা, ব্রহ্ম সূর্য্য, আমি ঘটাকাশ, ব্রহ্ম মহাকাশ—আমি পত্র বা ফুল, ব্রহ্ম বৃক্ষ—এইরূপ অনুভূতি থাকে।

"যতক্ষণ 'অহং' বোধ থাকে ততক্ষণ 'ত্বম্' বোধও আছে; যখন 'অহং' বোধ লোপ পায় তখন 'ত্বম্' বোধও থাকে না। সেই ভাবই অদ্বৈতভাব বা সোহং ভাব। এই অবস্থায় না পৌঁছিলে তাহা বুঝা যায় না, অন্যকে বলিয়া প্রকাশ করা যায় না—এই অবস্থা ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া ইহা চিন্তা মনন করাও যায় না। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে এই অদ্বৈতভাবের অপরোক্ষানুভূতি হয়। সচ্চিদানন্দ সাগরে যিনি এইরূপ দুই এক ডুব দিয়াছেন তাঁহাকে তত্ত্ববিদ্ বা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা যায়।"

(ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ১৭১ পৃঃ)

ব্রহ্ম ও জগতের অভিন্নতা সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী বাবা একজন শিষ্যকে লিখিয়াছেন—

"তোমাকে কে বলিল যে, ব্রহ্মের ভিতর বাহির সম্ভবে? ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি যেমন অভিন্ন তদ্রূপ ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। তবে সাংখ্য

ব্রহ্মতত্ত্ব বিশ্লেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য প্রকৃতি পুরুষ বিভাগ করিয়াছেন ; যেমন সক্রিয় অবস্থাকে 'প্রকৃতি' ও নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে 'পুরুষ' বলিয়াছেন। এইরূপ নিষ্ক্রিয় নিরাকার নির্ব্বিকার অবস্থাকে কেহ কেহ কেবল 'ব্রহ্ম' এবং ব্রহ্মশক্তি সৃষ্টি লয়াদি বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া ইহাকে জগৎ বলিয়াছেন মাত্র। মূলে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদজ্ঞানে জগৎকে ব্রহ্মশক্তির বিকাশ বলিতে হয়।

"প্রথমে জানিতে হইবে যে, মানবের আত্মজ্ঞান লাভ করিবার আবশ্যকতা কি ? বিচার করিলে বুঝিতে পারিবা যে কেবল দেহাত্মবোধে কর্ত্তৃত্বাদি অহঙ্কারবশতঃ যে কামনা বাসনা ইহাই জানিবার জন্য আত্মজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। জীব আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারিলে নির্লিপ্ততা অকর্ত্তৃত্ব আপনা হইতেই আসে, তাই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

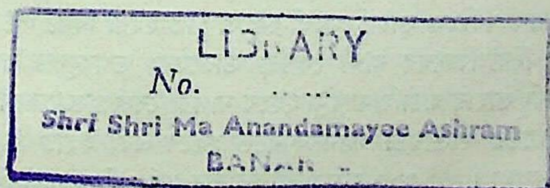
"এই আত্মজ্ঞান লাভ কেবল আত্মসত্তাকে জানা বুঝায় না, আত্মশক্তিকেও জানিতে হয়। লোকে কথায় বলে "কিঞ্চিদ্ধ্যানং মহেশ্বরঃ। অর্থাৎ মহাদেব প্রকৃতির (শক্তির) মহিমা কিঞ্চিন্মাত্র ধ্যান করিয়া স্বয়ং ধ্যানস্বরূপ হইয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্ব আসিবার অবসর রহিল না। কেবল পঞ্চমুখে রাম নাম গান ত্রিপুরারি অর্থাৎ তিনি প্রকৃতির মহিমা গাহিয়াই সময় পান না, দেহাত্মবোধ কর্ত্তৃত্বাদি আসিবে কি প্রকারে ? তাই লিখি কেবল চৈতন্যসত্তাকে জানিলে চলিবে না, চৈতন্য শক্তিকেও স্থূলে সূক্ষ্মে জানিতে হইবে, তাঁর গুণগান করিতে হইবে। আরও বিশেষরূপে বলিতে হইলে—আত্মা নির্লিপ্ত অকর্ত্তা ; আত্মশক্তি কর্ত্তাভোক্তারূপে সৃষ্টিলয়াদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন—ইহা বিশেষরূপে জানাকেই পূর্ণজ্ঞান বলে।

"মহামুনি বেদব্যাস আত্মবিচার করিতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাইলেন না। দৈবাৎ একদিন দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলে ব্যাসদেব তাঁহাকে

পাদ্যার্ঘ দ্বারা সম্মানিত করিয়া বলিলেন "হে ব্রাহ্মণ। আমি বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও শান্তি পাইতেছি না কেন, অর্থাৎ আমি আত্ম-বিচার করিয়া নির্লিপ্ত থাকিতে পারতেছি না কেন?" মহামুনি নারদ তদুত্তরে বলিলেন "মুনিবর! আপনি চৈতন্য সত্তা বিশেষরূপে নির্ণয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইচ্ছা-ক্রিয়া-জ্ঞান এই ত্রিশক্তি সম্পন্ন চৈতন্য-শক্তিকে যে পর্য্যন্ত জানিতে চেষ্টা না করিবেন অর্থাৎ তাঁহার মহিমা যে পর্য্যন্ত জানিতে না পারিবেন, তাবৎ কিছুতেই শান্তি পাইবেন না। অতএব আপনি এখন প্রকৃতি বা ঈশ্বরের মহিমা জানিতে চেষ্টা বা বর্ণনা করুন—দেখিবেন যে অচিরেই শান্তি পাইবেন"।

(ব্রহ্মচারী বাবার জীবনী ও পত্রাবলী ১৪৯ পৃঃ শ্রীমান মোক্ষদানন্দ ব্রহ্মচারী হৃষীকেশ)

এইরূপে ব্রহ্মচারীবাবা সাংখ্য ও বেদান্তের সমন্বয় করিয়াছেন, শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন এবং কেমন করিয়া পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ-জ্ঞানের ভিতর দিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, দ্রষ্টা ও অকর্ত্তাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল বন্ধনের অতীত হওয়া যায় তাহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।



ভারতেশ্বরী

শ্রীরামকৃষ্ণ এই জগৎকে ব্রহ্মেরই প্রকাশ বলিয়া এবং জগন্মাতাকে চিন্ময়ীরূপে উপাসনা করিয়া মায়াবাদ নিরসন করিয়াছেন এবং মানুষ যে এই পৃথিবীতে এই জড় শরীরেই সচ্চিদানন্দময় দিব্যজীবন লাভ করিতে পারে, দিব্যভাবে সংসার করিতে পারে, তাহার সম্ভাবনা দেখাইয়া দিয়াছেন—এবং এইভাবে দিব্যজীবনের অধ্যাত্ম ভিত্তিটি সুদৃঢ় করিয়াছেন। কিন্তু মানুষকে দিব্য অধ্যাত্মজীবনলাভের সকল প্রকার সুযোগ ও সহায়তা দিতে হইলে সমাজ ও রাষ্ট্রকে যে নূতনভাবে গঠন করিতে হইবে—নব জাতীয়তার বিকাশ করিতে হইবে—সে-সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কোন শিক্ষা দেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ সেবার আদর্শ প্রচার, অস্পৃশ্যতা নিবারণ প্রভৃতির জন্য কতকগুলি সর্ব্বত্যাগী যুবককে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এই কার্য্যের সূচনা করেন। কিন্তু তিনিও সাক্ষাৎভাবে ভারতের জাতীয়তা গঠনে অগ্রসর হন নাই, অথবা অল্পবয়সেই তাঁর দেহাবসান হওয়ায় ইহার সুযোগ পান নাই। এই মহৎ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীঅরবিন্দ এবং প্রথমেই তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতের জাতীয়তা পাশ্চাত্য আদর্শে গঠন করিলে চলিবে না—সেরূপ করিলে ভারত স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া বিনষ্ট হইবে—জগৎকে যে দিব্যজীবনের বাণী দেওয়া ভারতের ভগবদ্‌দত্ত কার্য্য সে মহৎ কার্য্য তাহার দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে না। বেদান্ত জ্ঞানের ভিত্তির উপরই ভারতের জাতীয়তা গঠন করিতে হইবে এবং ইহার উপায় হইতেছে মাতৃপূজা। ১৩১৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ ধর্ম্ম পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—"আমরা পাশ্চাত্য জাতি নহি, আমরা এশিয়াবাসী, আমরা ভারতবাসী,

আমরা আর্য্য। আমরা জাতীয়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বদেশ প্রেমের সঞ্চার না হইলে আমাদের জাতীয়ভাব পরিস্ফুট হয় না। সেই স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি মাতৃপূজা। যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল, সেইদিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশ ভগবান জাগিল, মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশ মাতা, স্বদেশ ইষ্টদেবী, এই বেদান্তশিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা জাতীয় অভ্যুত্থানের বীজস্বরূপ। যেমন জীব ভগবানের অংশ, তাহার শক্তি ভগবানের শক্তির অংশ তেমনই এই সপ্তকোটি বঙ্গবাসী, এই ত্রিংশকোটি ভারতবাসীর সমষ্টি সর্ব্বব্যাপী বাসুদেবের অংশ, এই ত্রিংশকোটির আশ্রয়, শক্তি স্বরূপিণী বহু ভূজান্বিতা, বহুবলধারিণী ভারতজননী, ভগবানের একটি শক্তি, মাতা, দেবী, জগজ্জননী কালীর দেহ বিশেষ। এই মাতৃপ্রেম, মাতৃমূর্ত্তি জাতির মনে প্রাণে জাগরিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই কয় বর্ষের উত্তেজনা, উদ্যম, কোলাহল, অপমান, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন ভগবানের বিধানে বিহিত ছিল। সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার পরে কি ?

"তাহার পরে আর্য্য জাতির সনাতন শক্তির পুনরুদ্ধার। প্রথম, আর্য্যচরিত্র ও শিক্ষা, দ্বিতীয় যোগশক্তির পুনর্বিকাশ, তৃতীয় আর্য্যোচিত জ্ঞানতৃষ্ণা ও কর্ম্মশক্তির দ্বারা নবযুগের আবশ্যক সামগ্রী সঞ্চয় এবং এই কয়বর্ষের উন্মাদিনী উত্তেজনা শৃঙ্খলিত ও স্থির লক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া মাতৃকার্য্যোদ্ধার। এখন যে-সব যুবকবৃন্দ দেশময় পথান্বেষণ ও কর্ম্মান্বেষণ করিতেছেন, তাঁহারা উত্তেজনা অতিক্রম করিয়া কিছুদিন শক্তি আনয়নের পথ খুঁজিয়া লউন। যে মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, তাহা কেবল উত্তেজনার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, শক্তি চাই। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের শিক্ষায় যে শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই শক্তি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। সেই শক্তি তোমাদের শরীরে অবতরণ করিতে

উদ্যত হইতেছেন। সেই শক্তিই মা। তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবার উপায় শিখিয়া লও। মা তোমাদিগকে যন্ত্র করিয়া এত সত্বর, এমন সবলে কার্য্য সম্পাদন করিবেন যে, জগৎ স্তম্ভিত হইবে। সেই শক্তির অভাবে তোমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইবে। মাতৃমূর্ত্তি তোমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, তোমরা মাতৃপূজা ও মাতৃসেবা করিতে শিখিয়াছ, এখন অন্তর্নিহিত মাতাকে আত্মসমর্পণ কর। কার্য্যোদ্ধারের অন্য পন্থা নাই।" (ধর্ম্ম ও জাতীয়তা—শ্রীঅরবিন্দ। ৭৯-৮১)

শ্রীঅরবিন্দ আর এক স্থানে বলিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য তাঁহার স্বদেশবাসীকে নবীন কিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি প্রদর্শন। স্বদেশপ্রেম যতদিন বুদ্ধিগ্রাহ্য, ততদিন তাহা শক্তিহীন, যখন হৃদয়ে তাহার স্বরূপ প্রতিভাত হয় তখনই তাহা মানুষকে চালিত করে, তখনই মানুষ তাহার জন্য জগতে আর সব তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিখে। যতদিন মাতৃভূমি পর্ব্বত কিরীটিনী সাগরস্বরূপ ভূমিখণ্ড মাত্র, যতদিন দেশবাসী কেবল মনুষ্যমণ্ডলী মাত্র ততদিন স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। যখন মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ীরূপে দেখা দেন, তখন সেই মাতৃমূর্ত্তির দর্শনপুণ্যে মানবের জাড্য, দ্বিধা, সঙ্কীর্ণতা অরুণোদয়ে রজনীর অন্ধকারের মত দূর হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গবাসীকে ও ভারতবাসীকে সেই মাতৃমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন।"

ভারতকে জগন্মাতারূপে উপলব্ধি শ্রীঅরবিন্দ অনেক পূর্ব্বেই লাভ করিয়াছিলেন। আমরা যতদূর জানি শ্রীঅরবিন্দই "আনন্দমঠ" হইতে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বাংলাদেশে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। ১৯০৬ সালে তাঁহার স্ত্রী মৃণালিনীকে লিখিত একপত্রে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "অন্যলোক স্বদেশকে একটা জড়পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।" প্রায় ঠিক এই

সময়েই শ্রীমৎ ভারত ব্রহ্মচারীর সম্মুখে জগন্মাতা ভারতেশ্বরীরূপে আবির্ভূতা হন। জগন্মাতার অনন্তলীলা—তাঁহার সমগ্র লীলা হৃদয়ঙ্গম করা নরমানবের সাধ্যাতীত।

যোগী ঋষি না পায় ধ্যানে তোমার তত্ত্ব তোমার সীমা
কত কবি ধন্য হল ছন্দে গাহি' তোর মহিমা!

কিন্তু তিনি তাঁহার বিশ্বকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য বিভিন্ন দেবীরূপে তাঁহার ভক্তগণের সম্মুখে আবির্ভূতা হন। শ্রীঅরবিন্দ "The Mother" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"অজ্ঞানের এই ত্রিধা জগতের মহাশক্তিরূপে মা দাঁড়িয়ে আছেন একটি মধ্যবর্ত্তী লোকে—তার একদিকে, এখানে নামিয়ে আনতে হবে যে অতিমানস জ্যোতি, সত্যাত্মক সৃষ্টি, আর একদিকে এই যে ঊর্দ্ধগামী ও নিম্নগামী চেতনার আয়তনক্রম যুগল-সোপানাবলীর মত একপ্রান্তে নেমে গিয়েছে, জড়ের, নির্জ্ঞানের মধ্যে, অন্যপ্রান্তে ফিরে আবার প্রাণের হৃদয়ের মনের পরিস্ফুরণ আশ্রয় ক'রে উঠে গিয়েছে পরমাত্মার আনন্ত্যের মধ্যে। তিনি সেখানে যা সাক্ষাৎ দেখেন, অনুভব করেন ও আপনার ভিতর হতে ঢেলে ধরেন, সেই অনুসারে নির্দ্দেশ ক'রে দেন এই ব্রহ্মাণ্ডে, এই পার্থিব বিবর্ত্তনে যাকিছু হবে—সেখানে তিনি দেবতাদের উপরে দাঁড়িয়ে, তাঁর সকল শক্তি ও বিগ্রহ তিনি কর্ম্মের জন্য সম্মুখে এনে স্থাপন করেছেন, এদের সম্ভূতিসব এই নিম্নতর ভূমিসকলের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এখানে শক্তিপ্রয়োগ করতে, শাসন করতে, যুদ্ধ করতে, জয়লাভ করতে, এখানকার যুগচক্র আবর্ত্তন পরিচালন করতে, এখানকার শক্তিরাজির সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত ধারাসকল নিয়ন্ত্রিত করতে। এইসব সম্ভূতি মায়েরই যত দিব্যরূপ ও বিগ্রহ, এদের ভিতর দিয়ে মানুষ যুগে যুগে নানা নামে তাঁরই পূজা ক'রে এসেছে।" (শ্রীঅরবিন্দ—মা—৪২,৪৩)

ভারতমাতা হইতেছেন জগন্মাতার এইরূপই একটি সম্ভূতি, তিনি ভারতের আত্মা ও ভারতশক্তিরূপে ভারতের বিবর্ত্তন ও বিকাশকে পরিচালিত করিয়া তাহার মহান লক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন—যাঁহারা ভারতমাতার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে, ভারতের স্বধর্ম্ম অনুসরণে কৃতসঙ্কল্প হইবে, মা তাহাদের হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধারূপে, তাহাদের বাহুতে দুর্জয়শক্তিরূপে, তাঁহাদের বুদ্ধিতে স্বপ্রকাশ জ্ঞানরূপে আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদিগকে তাঁহার নির্ব্বাচিত সৈন্যরূপে ব্যবহার করিয়া জগতে ভাগবত কার্য্য উদ্ধার করিবেন। শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারী অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণের আদেশে আদ্যাশক্তিকে আবির্ভূত করাইবার জন্য "মা" নামে মহাশক্তির কঠোর আরাধনা করিলে ১৩১৪ সনের শিব-চতুর্দ্দশী নিশীথে মা কৃপাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীমাতা ভারতেশ্বরী মহাদেবীরূপে আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন

"জগতে শান্তি স্থাপন করিবার জন্য সমুদয় দেবদেবী সমভিব্যাহারে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি। এবার দেবতা ও মানবের সম্মিলনে অপূর্ব্ব লীলা করিব।"

শ্রীশ্রীমাতা ভারতেশ্বরী মহাদেবী সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন, "আমি জানি ইনি কৈলাসের মা উমা।" অন্য এক সময়ে বলিয়াছেন যে "ইনিই শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লিখিত মা রক্তদন্তিকা।"

শ্রীমৎ ভারত ব্রহ্মচারী জগন্মাতাকে যে মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা—

ধ্যান

ওঁ সিংহস্থার্দ্ধ-পদ্মাসীনাং রত্নালঙ্কার-ভূষিতাং।
রক্তাম্বরপরিধানাং শ্বেত-কিরীট-শোভিতাং॥
ত্রিনয়নীং দ্বিভূজাঞ্চ স্মিত-চারু-চন্দ্রাননাং।
অভয়-কর্ত্তরী-করাং নীলাকাশ-সমপ্রভাং॥

সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশিনীং সর্ব্ব-মঙ্গল-কারিণীং
মহাজ্যোতিঃ মহাশক্তিং ধ্যায়েদুমাং মহেশ্বরীং ॥

ব্রহ্মচারীবাবা প্রায়ই বলিতেন "বিগত মহাযুদ্ধে মা ইউরোপের অপক্ষাত্র শক্তি হ্রাস করিয়া এবং ম্লেচ্ছ শক্তিকে........খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ভারতে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন (১৯২০)। মা কোন্ শরীর ধারণ করিয়াছেন তাহা আমাকে এখনও বলিতেছেন না। তবে শীঘ্রই মার মহাপ্রকাশ (Manifestation) হইবে তখন মাকে আমি জানিতে পারিব এবং এবার অনেকেই মাকে জানিতে পারিবে। মার মহাপ্রকাশের জন্যই আমি প্রতীক্ষায় আছি।"

একসময়ে শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারীবাবাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "এই যে জগদ্ব্যাপী অশান্তি, ইহা কি সাধারণ মানবের চেষ্টায় দূরীভূত হইবে? শত সহস্র মানবের চেষ্টায়ইবা কতদূর সফলতার আশা করা যায়?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"কোন চিন্তা নাই। সন্তানের অপার দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া এবার মা স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং এবং জগতের সদ্ব্যক্তিগণের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মীশক্তি প্রকাশ করতঃ শান্তি-স্থাপন-কার্য্য সম্পাদন করিবেন। প্রতিকূল অবস্থাসকল মায়ের ইচ্ছা-তেই অনুকূল হইয়া আসিবে। মা স্বয়ং কৃপা করিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে, "ক্রমে জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে।"

("ভারতসমাজ পত্রিকা" ২৩ পৃঃ)

ব্রহ্মচারীবাবার দেহাবসানের পর ১৯৩২ সনে যোগানন্দ পণ্ডিচারী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আসিয়া শ্রীমা মীরা দেবীর মধ্যে ব্রহ্মচারীবাবার আরাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাভারতেশ্বরী মহাদেবীর আবির্ভাব ও প্রত্যাদেশের সন্ধান পান। এ-সম্বন্ধে এই পুস্তকের দ্বিতীয়খণ্ডে যোগানন্দ নিজেই পরিচয় দিয়াছেন।

যুগধর্ম্ম ও যুগবাণী

শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারীর তিরোধানের পর ১৩৩৩ সনের আশ্বিন সংখ্যা "সোনার ভারত" পত্রিকায় ৺অশ্বিনীকুমার বর্ম্মাধর (অজপানন্দ) আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী গুরুভাইদের প্রতি যে নিবেদন প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন—

"পরমশ্রদ্ধাভাজন ও প্রাণোপম গুরুভ্রাতাগণের প্রতি অকিঞ্চনের করযোড়ে বিনীত নিবেদন—

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমৎ ব্রহ্মচারীবাবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—সমাজ-গঠন। বৈদিক ঋষিগণ শুদ্ধসত্ত্বগুণজাত প্রেরণায় এবং শ্রীভগবানের বাক্যাদেশ ও ইঙ্গিতে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া যে ধারা অবলম্বনে অহঙ্কার ও কামক্রোধাদিমূলক দুর্নীতি সমূহ সংশোধন পূর্ব্বক মানব-সমষ্টিকে পরাজ্ঞানের অধিকারী করাইয়া পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ বা মুক্তিমার্গে লইয়া যাইতেন, শ্রীশ্রীমৎ বাবাও ঠিক সেই ধারা অবলম্বনে, সেই জগদ্-বরেণ্য ঋষিগণেরই সত্যপূত পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শুদ্ধজ্ঞানজাত প্রেরণায় এবং শ্রীভগবানেরই বাক্যাদেশ ও ইঙ্গিত অনুযায়ী সমাজ পরিচালনার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।"

(সোনার ভারত পত্রিকা ১৩৬ পৃষ্ঠা)

"সমাজের যথার্থ আদর্শ সর্ব্ব সাধারণের সম্মুখে প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে এবং সমাজে বহুলভাবে বেদাচার প্রবর্ত্তন ও আলোচনার জন্য, তিনি ১৩৩২ বঙ্গাব্দে "সমাজ" নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। বর্ত্তমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার সহকারী সভাপতি, 'জাতিভেদ' প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রণেতা, শ্রীমৎ

দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় পত্রিকার "সোনার ভারত" নাম সমর্থন করেন। পরমারাধ্য গুরুদেব, সমাজের পরম বন্ধু শ্রীমৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্ভ্রম ও গৌরব রক্ষার্থ "সোনার ভারত" নামটিই গ্রহণ করিলেন এইরূপে "সোনার ভারত" নামে একটি মাসিকপত্র ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত চিত্রধাম আশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। "সোনার ভারতের" জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার কোন বিশেষত্ব দেখিতে পাইয়া মাননীয় বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের সহৃদয় লাইব্রেরীয়ান মহাশয় বিলাতের সাধারণের অবগতির জন্য জৈষ্ঠ্যমাসের এক সংখ্যা "সোনার ভারত" এখান হইতে চাহিয়া লইয়াছিলেন। আর ধর্ম্মপ্রাণ জনসাধারণও প্রীতির সহিতই "সোনার ভারত" গ্রহণ করিয়াছিলেন। "সোনার ভারত" প্রকাশের সার্থকতা আমরা এইরূপে অনুভব করিয়াছি। যাহা হউক, ঐ সনের ভাদ্র মাসে গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর নানা অসুবিধায় পত্রিকাখানি উঠিয়া যায়।" ১৩৩৬ সনের কার্ত্তিক মাসে তাঁহার শিষ্যগণ পরমারাধ্য গুরুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহার আদেশ ও উপদেশ সমূহ এবং তাঁহার অনুমোদিত সিদ্ধান্ত ও আচার প্রণালী মাসে মাসে প্রবন্ধাকারে প্রকাশে সচেষ্ট হন এবং তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী "সমাজ" নাম নির্ব্বাচন করিয়া ভারতীয় সমাজ লক্ষ্য করতঃ পত্রিকার "ভারতসমাজ" নামকরণ করেন (ভারত সমাজ ৩।৪ পৃঃ ১)

ঐ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় "ভারতের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীমান যোগদানন্দ লিখিয়াছেন—

"পরমপূজ্যপাদ সত্যদ্রষ্টা বিদেহমুক্ত শ্রীশ্রীমৎ ভারত ব্রহ্মচারীবাবা সাধনজীবনে সুদীর্ঘ ১৯-২০ বৎসর কঠোর আত্মসংযম ও ত্যাগ তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া ব্রহ্মজ্ঞান (ব্রাহ্মীস্থিতি) লাভ করিয়াছিলেন। যুগপৎ তাঁহার সাধনা জীবনের প্রারম্ভ হইতেই মহাপ্রয়াণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরা-

নুভূতিরূপ ভগবল্লীলা, ঐশীশক্তির বিশেষ বিশেষ বিকাশ প্রকাশ পাইয়াছিল, এইসব অনুভূতি ও দিব্য দর্শনগুলিকে তিনি অন্তরে বাহিরে স্থূলে সূক্ষ্মে অভেদাকারে প্রত্যক্ষানুভব করিতেন। ইহার ফলস্বরূপ তাঁহার বিশুদ্ধান্তঃকরণে প্রতিভাত, ভারতের অভ্যুদয়ের যে-সকল বর্ত্তমান ও ভাবী চিত্র, ভগদ্বাণী বা প্রত্যাদেশাদি ক্রমে আসিয়াছিল, যাঁহার প্রেরণায় ও প্রেমস্রোতে ভগবল্লীলা নিকেতন পুণ্যভূমি ভারতের একমাত্র বৈশিষ্ট্য, জীবন্মুক্তির বিলক্ষণ আনন্দস্বরূপ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভাবে পরিপূর্ণ দিব্যভাবে বা ব্রহ্মভাবে বিচরণপূর্ব্বক কেবল সাক্ষী অকর্ত্তা বা দ্রষ্টা থাকিয়া, শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক, সত্যদ্রষ্টা মুনি-ঋষিদের প্রদর্শিত পথে নিষ্কাম সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী-জীবন যাপন পূর্ব্বক জগদ্‌ব্রহ্মের সেবায় বা ভারতের—তথা সমগ্র জগতের – মহা-মঙ্গলো-দ্দেশে প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করতঃ স্বয়ং আচরণ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে মনে হয় যে, ভারতের এই মহাসমস্যাকুল সময়ে "মূর্ত্তিমান-ভারত" শরীর পরিগ্রহ করিয়া যথার্থ ভারত নামের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক কৃতকৃত্য করিয়া গিয়াছেন।"

"তিনি একাধারে এত শক্তির বিকাশে, ধর্ম্মনেতা, রাষ্ট্রনেতা ও সমাজনেতার প্রকৃত আদর্শে, শান্ত ও সৌম্য মুনিঋষিদের আচরিত নিরুপ-দ্রব পন্থাই ভারতের চিরন্তন প্রথা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু বর্ত্তমানে এই সম্পূর্ণ ঐহিক ও স্বার্থসর্ব্বস্ব কোলাহলপূর্ণ জগতে বিশেষতঃ ভারতের মহাসমস্যাকুল সময়ে, কয়জন সাম্যভাবে প্রকৃত কল্যাণচিন্তা করেন এবং সাম্যভাবে প্রকৃত জগন্মঙ্গলো-দ্দেশে প্রকৃত কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন? শ্রীভগবানের মঙ্গলেচ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে; ভগদ্বাণী ফলিবেই ফলিবে। পরম-পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারীবাবার প্রতি শ্রীশ্রীমাতা ভারতেশ্বরী মহাদেবীর বরাভয়---ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ দানের ফলস্বরূপ, ভারতের

বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম" সংস্থাপিত হইবে এবং সমগ্র জগতে প্রকৃত সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা আনয়ন করিবে, বিশ্বমানবে বিশ্বপ্রেম প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম ও যুগবাণী।

একথা আমরা নিশ্চিত ভাবেই অবগত আছি যে, ভারতে আদর্শ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা বা ধর্ম্মসংস্থাপন ভিন্ন তাঁহার সমগ্র কর্ম্মজীবনে অন্য কোন কর্ম্মপ্রচেষ্টা দেখা যায় নাই। এই মহান কার্য্যোদ্ধারের জন্য ব্রহ্মচারীবাবা "মায়ের (ঐশীশক্তির) ইচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত" এ কথা সর্ব্বদাই আমাদের নিকট নানা কথাপ্রসঙ্গে দৃঢ়ভাবে বলিতেন।"

("ভারত সমাজ পত্রিকা" ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যা। ২৫,২৬, ২৭পৃষ্ঠা)

ব্রহ্মচারীবাবা জগন্মাতার প্রত্যাদেশ পাইয়া ভারতে সমাজ, রাষ্ট্র ও গার্হস্থ্যজীবন গঠন সম্বন্ধে যে-সব অমূল্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন,আমরা এখানে সংক্ষেপে সেগুলি আলোচনা করিব। ভারতের তথা জগতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি এমনই জটিল ও বহুদূরপ্রসারী হইয়া উঠিয়াছে যাহাতে তাহাদের সুসমাধানের নির্দ্দেশ দেওয়া সাধারণ মানব-মনবুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে--যোগশক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষেরাই সে-নির্দ্দেশ দিতে সক্ষম। ব্রহ্মচারীবাবা যে এইরূপই একজন ঐশীশক্তি ও দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহের স্থান নাই--আমরা দেখিব তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্য্যভাবে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব ভারতের অবশ্যম্ভাবী পুনরভ্যুত্থান কি উপায়ে হইবে সে-বিষয়ে তাঁহার উপদেশ দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই বিশেষভাবে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য—এবং ইহাই ভারতের সনাতন প্রথা। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন—"তখনকার গার্হস্থ্যাশ্রমী ঋষিগণ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পর্ব্বতগুহাবাসী সন্ন্যাসীগণ

সর্ব্বপ্রকারে দেশের ও সমাজের মঙ্গল সাধন করিতেন। সন্ন্যাসী ও গার্হস্থ্যাশ্রমী পরস্পর পরস্পরের সাহায্যেই চলিতেন; এমন কি রাজাধিরাজ মহারাজগণও সন্ন্যাসীগণের বা গার্হস্থ্যাশ্রমী ঋষিগণের মন্ত্রণা অনুসারে রাজ্য পরিচালনা করিতেন; সকলেই একাত্মজ্ঞানী ছিলেন বলিয়া আত্মপর ভেদ ছিল না এবং দ্বৈত বুদ্ধি বিরহিত হইয়া কাজ করিতেন।"

(সোনার ভারত পত্রিকা ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৩৩—৪পৃষ্ঠা)

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে অনেকেই বলিয়াছেন—"হিন্দু সমাজ বর্ত্তমান অবস্থায় আর বেশিদিন জীবিত থাকিতে পারে না"। সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মচারীবাবা যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা শুধু ছোটখাট সংস্কারেই পর্য্যবসিত নহে—তাহা একেবারে আমূল বিপ্লব—ইহা ছাড়া অন্য গতি নাই। আজ কাল তরুণদের মধ্যে দেখা যায় তাহারা বিপ্লবের বড়ই পক্ষপাতী, নিজদিগকে "বিপ্লববাদী" বলিয়া পরিচয় দিতে তাহারা বিশেষ গৌরব বোধ করেন। ইহা সুলক্ষণ—ইহাই যুগধর্ম্ম, কারণ যুগের পরিবর্ত্তনের শুভক্ষণ আসিয়াছে, আর যুগে যুগে বিপ্লবের ভিতর দিয়াই তাহা সংঘটিত হইয়াছে—অতএব সমাজে, রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত জীবনে সর্ব্বতোমুখী বিপ্লবকে ভয় করিলে আমাদিগকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুই বরণ করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এই বিপ্লবের প্রকৃত স্বরূপ কি সে-সম্বন্ধে এখনও লোকের মনে স্পষ্ট ধারণা হয় নাই—এবং এ-বিষয়ে অনেকেই পাশ্চাত্যের বিশেষতঃ সোভিয়েট রুশিয়ার বিপ্লবকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু সেই বোলশেভিক বিপ্লব মানবজীবনের বাহ্য ব্যবস্থারই পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে তাহাও সমগ্ররূপে নহে—শুধু অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিপ্লব। কিন্তু শুধু অর্থনীতি লইয়াই সমগ্র মানব জীবন নহে আর সমাজের সকল পরিবর্ত্তন ও বিকাশের মূলে রহিয়াছে অর্থনীতি, মার্কস ও এঞ্জেল্সের এই

শিক্ষা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সকলকার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করিয়া দিলেই যদি আদর্শ সমাজ লাভ করা যায় তাহা হইলে সচ্ছল সঙ্গতিপন্ন ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে এত দুর্নীতি কেন? স্বার্থপরতা, কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, পরপীড়ন, পরশোষণ প্রবৃত্তি, এসব কি শুধু অভাবগ্রস্ত দরিদ্র-গণের মধ্যেই আছে, সচ্ছল ধনীদের মধ্যে নাই? বরং দেখা যায় উল্টা, যাহার যত অভাব কম, কর্ম্ম কম, অবসর অধিক সেই তত দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী হইয়া উঠে। আমরা বলিতেছি না—ভ্রান্ত অধ্যাত্ম নীতি অনুসরণে সকলকেই দারিদ্র্য অবস্থায় রাখিতে হইবে, অথবা সমাজে সকল ব্যক্তির সচ্ছল এমন কি সমৃদ্ধ অবস্থার ব্যবস্থা করিতে হইবে না। কিন্তু সমাজ সমস্যার, মানবজীবনের সমস্যার সমাধান শুধু তাহা দ্বারা হইবে না—সে জন্য চাই মানুষের প্রকৃতির মূলগত পরিবর্ত্তন। মানুষ এখন যে "অহং"কে কেন্দ্র করিয়া জীবন যাপন করিতেছে ইহার পরিবর্ত্তে ভগবানকে জীবনের কেন্দ্র করিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে আমার যে প্রকৃত অহং তাহাতে আমি ভগবানের সহিত এবং সকল জীবের সহিত এক, সেই সর্ব্বভূতের এক আত্মাই ব্রহ্ম, সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম। ইহাই ব্রহ্মচর্য্য শব্দের প্রকৃত অর্থ—ব্রহ্মে চরণ অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে, ব্রহ্মজ্ঞানে সদা অবস্থিতি। মানুষের মূল চৈতন্যগত রূপান্তরের উপর দাঁড়াইয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে ও ব্যক্তিগত জীবনে যে সর্ব্বতোমুখী বিপ্লব আসিবে তাহাতেই পৃথিবীতে সত্যযুগের সূচনা হইবে। ব্রহ্মচারীবাবা এই মহান বিপ্লবেরই শঙ্খধ্বনি করিয়া গিয়াছেন।

"দারুণ বিপ্লবমাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা,
জনগণ-পথ-পরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে।"

মরণোন্মুখ হিন্দুসমাজ

"হিন্দুসমাজ জীবিত না মৃত? এ প্রশ্নের উত্তরে স্বতঃই সন্দেহ জন্মে যে, প্রশ্নকারী নিশ্চয়ই হিন্দু সমাজের জীবিতাবস্থার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণ-রূপে মৃত না হইলেও যে তাহার অংশ বিশেষে মৃত্যু লক্ষণ দেখা দিয়াছে নানা দিক দিয়াই তাহার চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে। আম কাঁঠাল ইত্যাদি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের কোন শাখা জীবনহীন হইলে তাহা কর্ত্তন বা ছেদনে বৃক্ষের জীবিতাংশের কোনরূপ দুঃখ যন্ত্রণার অনুভূতি হয় না। এই যে প্রত্যহ গড়ে ৩৫০ জন হিন্দু খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িতেছেন, কৈ, ইহাতে তো হিন্দুসমাজকে বিশেষ আহত বোধ হইতেছে না। এই ঘটনায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে সমাজের যে অংশ হইতে এইরূপে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছেন, সে অংশ নিশ্চয় মৃতাংশ।" (সোনার ভারত পত্রিকা ৭৫পৃঃ)

সোনার ভারত পত্রিকার সম্পাদক আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীঅশ্বিনী-কুমার বর্ম্মাধর উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি হিন্দুর খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণেরই একটা হিসাব দিয়াছেন—কিন্তু উহাপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যায় হিন্দু নীরবে নিঃশব্দে প্রত্যহ মুসলমান হইতেছে—গ্রামে গ্রামে এবং কলকারখানায় সন্ধান লইলে তাহার হিসাব পাওয়া যায় কিন্তু সমাজ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেছে না, দেখিয়াও দেখিতেছে না হিন্দুসমাজের মরণোন্মুখ অবস্থার ইহাই কি অকাট্য প্রমাণ নহে? ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ব্রহ্মচারীবাবাও নিজে বলিয়াছেন—"হিন্দুসমাজ বর্ত্তমান অবস্থায় আর বেশীদিন জীবিত থাকিতে পারে না।"

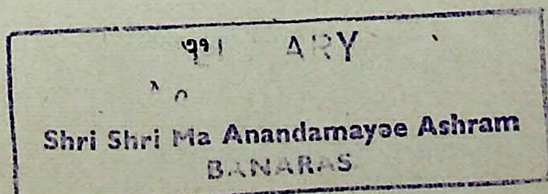
(সোনার ভারত, বৈশাখ ১৩৩৩)

তাহার পরও প্রায় ২৫ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, হিন্দুর মৃত্যু-রোগের বিশেষ কোন প্রতিকার হয় নাই—ফলে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু সমাজে যদি যথেষ্ট প্রাণশক্তি থাকিত তাহা হইলে কি বাংলার গত দুর্ভিক্ষে ১৫ লক্ষ নরনারী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিত? এবং তাহা চোখের সম্মুখে দেখিয়াও সমাজ আজ এমনই উদাসীন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত? পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের বর্ণনাতীত দুর্গতি হইতেছে কেন?

এখনও আশা-দীপ নির্ব্বাপিত হয় নাই, বহু যোগী ঋষির পুণ্যফলে এখনও হিন্দুসমাজে হৃদয়ের স্পন্দন থামিয়া যায় নাই, কিন্তু এখনও যদি প্রত্যেক হিন্দু নরনারী সমাজকে রক্ষা করা নিজ নিজ দায়িত্ব জ্ঞান করিয়া দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত মৃত্যুরোগগুলির প্রতিকারে অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই হিন্দুসমাজ হিন্দুজাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। এবং সেই সঙ্গে মানবীয় সভ্যতার মানবজাতিরও পুনরভ্যুত্থানের সকল আশা ভরসাই লুপ্ত হইবে।*

হিন্দু সমাজের মারাত্মক উপসর্গের মধ্যে প্রধান হইতেছে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা! জাতি হিসাবে মৃত্যু-পথের পথিক হইয়াও হিন্দু এই সব উপসর্গ ছাড়িতে পারিতেছে না, কারণ তাহার ভয় হয় যে ইহাতে ধর্ম্ম-হানি হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম কি? বিবেকানন্দ তীব্র বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হিঁদুর ধর্ম্ম ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে। হিঁদুর ধর্ম্ম বিচারমার্গও নয় জ্ঞানমার্গও নয় ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা বস্। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইওনা। 'আত্মবৎ

* বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ যে অভূতপূর্ব্ব বিকটতা লইয়া দেখা দিয়াছে ইহা মৃতকল্প হিন্দুসমাজকে জাগাইবার পন্থা—ভারতমাতা যেন অধৈর্য্য হইয়া মহাকালীরূপে হিন্দুসমাজকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিয়াছেন তাহার বহুশতাব্দীব্যাপী নিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য।



সর্ব্বভূতেষু' কি কেবল পুঁথিতে থাকবে না কি? যারা এক টুকরা রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে? যারা অপরের নিশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায় তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করবে? ছুঁৎমার্গ একপ্রকার মানসিক ব্যাধি।"

কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন বা দিতেছেন তাহাই ধর্ম্ম না অজ্ঞান কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশাচারকেই ধর্ম্ম বলিয়া মানিতে হইবে? যে-সকল অবতার ও মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করিলাম তাঁহারা কেহই জাতির বিচারকে ধর্ম্ম বলেন নাই—অতএব জাতিভেদের উচেছদ করিলে ধর্ম্মহানি হইবে এ-আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তবু দৃঢ়মূল সংস্কার সহজে দূর হয় না, তাহা ছাড়া আজ পর্য্যন্ত অনেকেরই ধারণা আছে, এবং স্বার্থপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রচারও করিতেছেন যে, হিন্দুর যে পরম আদর্শ বর্ণাশ্রম তাহাই জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা। ব্রহ্মচারীবাবা এই মারাত্মক ভ্রান্তি লোকের মন হইতে দূর করিবার জন্য বর্ণাশ্রম তত্ত্ব অতি সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। "সত্যযুগাঙ্কুর" পুস্তিকায় তিনি লিখিয়াছেন—

"প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, মানব-মনও ত্রিগুণাত্মক, যাহার মন যে গুণে অধিক কাল স্থিতিলাভ করে, তাহাকে সেই গুণ সম্পন্ন বলিয়া থাকে। এই ত্রিগুণের ন্যূনাধিক্য বশতঃ মানবগণ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত।

"সত্বগুণাধিক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বর্ণ, সত্ব ও রজোমিশ্র গুণাধিক ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বর্ণ, রজঃ ও তমোমিশ্র গুণাধিক ব্যক্তি বৈশ্য বর্ণ এবং তমোগুণাধিক ব্যক্তি শূদ্র বর্ণ। যে বর্ণে যে পরিমাণ জ্ঞানের বিকাশ হওয়া স্বাভাবিক, তদনুযায়ী সদসৎ ভাব বিকাশক কর্ম্মসকল ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বর্ণের কেবল ভক্তিমুক্তিলাভের জন্য ধ্যান ধারণাদি অধ্যাত্মক্রিয়া ও শাস্ত্রচর্চায় রত থাকা এবং যথালব্ধ

বা ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। ক্ষত্রিয় বর্ণের অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে জগতে শান্তি বিধানের জন্য প্রভুত্বভাব (দুষ্ট-দমন ও শিষ্ট-পালনের ইচ্ছা) স্বাভাবিক। তাঁহারা কর বা বেতন স্বরূপ যাহা প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহিত হয়।

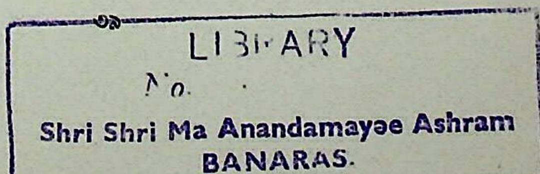
বৈশ্যগণের রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণে দুষ্টদমনের ইচ্ছা লুপ্ত হইয়া অধ্যাত্মজ্ঞান লাভেচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে (সত্য ধর্ম্ম রক্ষার্থে পরার্থে আত্মোৎসর্গের) ইচ্ছা এবং লোভ ও শঠতা শূন্য কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাই স্বাভাবিক।

শূদ্র তমোগুণাচ্ছন্ন, অতএব তাহাদের অধ্যাত্মজ্ঞান না থাকায় ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সেবা করাই কর্ত্তব্য। ইহাতেই আত্মোন্নতি ও জীবিকা নির্ব্বাহ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম-শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্। গীতা

আধুনিক সমাজ যে পুষ্প দ্বারা মল ঢাকিবার মত চলিতেছে, তাহা বোধ হয় সকলেরই প্রাণের কথা। আমরা দেখিতেছি যে, শাস্ত্রকারগণ ত্রিগুণের যে সব লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে উচ্চশ্রেণীরও অধিকাংশ লোকই তমসাচ্ছন্ন বা শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছেন। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ তমোগুণাধিক ব্যক্তিই শূদ্র এবং তাহাদেরই আত্মসম্মান বোধ নাই।

যে সব উচ্চশিক্ষিত জ্ঞান-গৌরবান্বিত ব্যক্তিদের উপর দেশের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই সামান্য স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া, সত্যধর্ম্মে বঞ্চিত হইয়া, চাকুরী, প্রবলের পদলেহন, দুর্ব্বলের পীড়ন, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল জুয়াচুরি ইত্যাদিই জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় বুঝিয়া একেবারে ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা বেতনভোগী হইয়া ক্ষাত্র ধর্ম্মোচিত



রাজকার্য্যে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশ ব্যক্তি সততা রক্ষা করিতে অক্ষম হওয়াতেই শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছেন।

শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণসমাজের কথা আলোচ্য হইতে পারে না। কারণ শাস্ত্রই তাঁহাদের জীবন। শাস্ত্রবহির্ভূত কর্ম্মদ্বারা যে ত্রিবর্ণেরই বিনাশ সাধন হইতেছে, ইহা তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিতে হইবে না। আমরা আশা করি যে তাঁহারা যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার্থ কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তবে অচিরেই চতুর্ব্বর্ণের মঙ্গল সাধিত হইবে।

ঋষিপ্রবর্ত্তিত জাতীয়তা রক্ষার একমাত্র অবলম্বন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম একেবারে ধ্বংসপ্রায় হইয়া অস্পৃশ্যদোষ দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, এখন আবার এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালনে বদ্ধপরিকর না হইলে দেশের বা জাতির কোন প্রকারেই কল্যাণসাধন হইতে পারে না।

এহেন দুর্দ্দিনে উচ্চসমাজ ও উচ্চ শিক্ষিত যুবকগণ অন্যাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশের ও জাতির মঙ্গলের জন্য তমোগুণের লক্ষণ-সমূহ পদতলে নিক্ষেপ করিয়া সত্ত্বগুণ বিকাশে যত্নবান হইবেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি-প্রয়াসী হইয়া প্রথমতঃ বৈশ্য-ব্যবসায় প্রচুর শস্যোৎপাদনের জন্য কৃষিকার্য্য, খাদ্য দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানীর জন্য সততা রক্ষা করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় এবং ধর্ম্ম, অর্থ, স্বাস্থ্য, বলপ্রদায়িনী দেশ রক্ষার একমাত্র সম্বল গোধন পালনে অবহেলা পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ দেবার্চ্চনা ভাবিয়া গোসেবায় মনোনিবেশ করিবেন, কারণ দেশ শূদ্রত্বে পরিণত হওয়াতেই ধর্ম্মনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়জনিত অভাব অশান্তি ঋণ, রোগ অন্নাভাব বস্ত্রাভাব অর্থাভাব ও হিংসাদ্বেষ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি বৈশ্যোচিত পালনকার্য্যে দেশ উন্নত হইলে ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রহ্মতেজ বিকাশের অভাব হইবে না।

এদিকে আবার আইন ব্যবসায়, চাকুরী ও ডাক্তারী ইত্যাদির স্থান এমনভাবে পূর্ণ হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের একেবারেই আশা না থাকায় আজকাল যুবক সমাজে বিষয়কর্ম্মের যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতেও অনুমিত হয় যে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদিতে আত্ম-নিয়োগ করাই একমাত্র পন্থা।

আমাদের মনে হয় যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে যাঁহারা বেতন গ্রহণে গ্রাম যাজন, দেবপূজা ইত্যাদি কাজ করিয়া থাকেন তাঁহারাও এমন ব্রাহ্মণত্ববিনাশক হেয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রানুমোদিত কৃষি-বাণিজ্যাদি কার্য্যসমূহকে জীবিকা নির্ব্বাহের হেতু করিয়া, অন্যান্য সমাজকে শিক্ষা প্রদানে যত্নবান হইলে আধুনিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

হেয় কর্ম্ম দ্বারা যেমন ব্রাহ্মণত্বের হানি হয়, তেমনই যজমানেরও মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। এইরূপে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে বর্ত্তমান যুগ সত্যযুগে পরিণত হইবে।"

(শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারী—সত্যযুগাঙ্কুর—১৬-১৭-১৮-২১)

বর্ত্তমানে সমাজে যে জন্মগত জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত আছে ইহা যে সেই প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা নহে এবং ইহার যে কোন আধ্যাত্মিক ভিত্তি নাই এ-সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীবাবা জগন্মাতারই প্রত্যাদেশ পাইয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা সাহায্যে বুঝাইয়া দিয়াছেন। "সেবাপূজা ও ভোগরাগ সম্বন্ধে তথা-কথিত সামাজিক ও জাতিগত প্রশ্নাদি উত্থাপিত হইলেই তিনি সাধন-জীবনে এ সম্বন্ধে ভগদ্বাণীতে যে মীমাংসা পাইয়াছিলেন তাহাই বলিতেন। মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "জাত কিরে?" এই প্রত্যাদেশ হইতেই

তাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণে আধুনিক জাতিগত সমস্যাদির মীমাংসা হইয়া যায়।" (ভারত সমাজ—পৃষ্ঠা-২৯)

শ্রীমান শঙ্করানন্দ এই বিষয়ে ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে যে প্রাঞ্জল উপদেশ পাইয়াছিলেন তাহা—"গুরুশিষ্য-সংবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধে (ভারত সমাজ পত্রিকায় ১ম সংখ্যা কার্ত্তিক ১৩৩৬) প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা সেইটি এখানে সম্যক্‌ভাবেই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"গুরুশিষ্য"

সত্যদ্রষ্টা বিদেহমুক্ত মহাপুরুষ পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গুরুদেব ভারতব্রহ্মচারীবাবা কথা প্রসঙ্গেই আমাদিগকে যে-সব অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আজ তাহার কিয়দংশ "সমাজের" পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছি।

তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ একটা কথা বলিয়াছিলাম। গুরুদেবের জন্মভূমি ও আমার জন্মভূমি একই গ্রামে, বিশেষতঃ মদীয় পিতৃদেব ও গুরুদেবে একান্ত হৃদ্যতা ছিল, অনেক সময়ে উভয়ে একত্রে মিলিয়া উপাসনাদি করিতেন। তখন আমি বালক হইলেও বুঝিতে পারিতাম যে, গুরুদেব আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। আমার ব্রাহ্মণ্যাভিমান বুঝিয়া গুরুদেব অতি সরলভাবে পরম স্নেহে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি ব্রাহ্মণ ?"

আমি বিনীতভাবে উত্তর দিলাম "আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে গৌরবান্বিত, আমার উপনয়ন সংস্কার হইয়াছে; অতএব আমিও ব্রাহ্মণ।"

গুরুদেব—ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিলেই বা উপনয়ন সংস্কার হইলেই "ব্রাহ্মণ" হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণোচিত গুণলাভ হইলেই "ব্রাহ্মণ"

হওয়া যায়। যে-কোন ব্যক্তি তপস্যাপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিতে পারেন।

আমি—এই যে সমাজশুদ্ধ দেশশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশীয় জনগণ উপবীত ধারণ করিয়া "ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছেন, ইঁহারা কি তবে "ব্রাহ্মণ" নহেন?

গুরুদেব—একমাত্র ব্রাহ্মণোচিত গুণলাভেই "ব্রাহ্মণ" হওয়া যায়। শাস্ত্র বলেন—

জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারাদ্দ্বিজোচ্যতে।
বেদপাঠাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্মজানাচচ ব্রাহ্মণঃ ॥

মানব মাত্রই জন্মগ্রহণ করিয়া "শূদ্র" থাকেন। উপনয়ন সংস্কার বা বৈদিক দীক্ষা লাভ হইলে দ্বিতীয় বার জন্ম হয় বলিয়া দ্বিজ বলে। দ্বিজত্বলাভ হইলেই বেদে ও ঈশ্বরারাধনায় অধিকার জন্মে। দ্বিজ গুরুগৃহে গিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে করিতে যখন বেদের মর্ম্মার্থ সাধারণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন তখন তাঁহাকে বিপ্র বলে। তদনন্তর গুরুদেবের উপদেশানুযায়ী উপাসনা করিতে করিতে এবং বেদে ব্রহ্ম বিষয়ক বিচার দ্বারা প্রথমতঃ পরোক্ষভাবে ব্রহ্মভাব বুঝিয়া পরে অপরোক্ষানুভূতি হইলে ব্রাহ্মণ্য লাভ হয়। তখন তাঁর চরিত্রে ব্রাহ্মণোচিত গুণ কর্ম্ম প্রকাশ পায়। "ব্রাহ্মণ" সর্ব্বত্যাগী, বিশ্বপ্রেমিক। জগতের সমস্ত মানব ব্রাহ্মণের নিকট নিতান্ত আপনার জন। ব্রাহ্মণ, সর্ব্ব জীব জগৎ একতত্ত্বের প্রকাশ জানিয়া (শুধু শুনিয়া নহে) আত্মপর-ভেদ-বিরহিত হইয়া সমাজের প্রকৃত মঙ্গলজনক উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে এই আদর্শ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

আমি—বুঝিয়াছি, ব্রাহ্মণজাতীয় জনগণ ব্রাহ্মণ্য হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। আচ্ছা বলুন, আমি কিরূপে "ব্রাহ্মণ" হইতে পারিব? ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়া যদি ব্রাহ্মণ্য লাভ না হয় তবে, জন্ম বিফল, জীবন বিফল।

গুরুদেব—যে কোন ব্যক্তি তপস্যা প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিতে পারেন, চেষ্টা করিলে তুমিও অবশ্যই পারিবে। শম, দম, শৌচ, সরলতা, ধৈর্য্য অহিংসা ও ত্যাগ ইত্যাদি সদ্‌গুণ আশ্রয় করিয়া একনিষ্ঠভাবে উপাসনায় প্রবৃত্ত হও, মায়ের কৃপায় অবশ্যই তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।

আমি—আপনার আশীর্ব্বাদ। ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া, ব্রাহ্মণোচিত আচার প্রতিপালন না করিলে, মিথ্যা কপটতা ও হিংসা দ্বেষাদি প্রকাশ পাইলে তাহাকে কি বলা যায়?

গুরুদেব—সমাজের প্রচলিত প্রথাক্রমে তিনি ব্রাহ্মণ জাতিই বটেন, কিন্তু তোমার কথিত মত চরিত্র দৃষ্ট হইলে তাহাতে শূদ্রত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। মনে রাখিও, একমাত্র তপস্যা দ্বারাই শ্রেয়োলাভ হয়, অন্য কোন উপায়ে নহে। মানবজীবনের চরমলক্ষ্য বিষয়ানন্দ নহে, "মুক্তি"। ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা মুক্তিই পুরুষার্থ; পুরুষ পুরুষার্থবান হইবে।

অন্য এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল?

গুরুদেব—সগুণ ও নির্গুণ তত্ত্ব স্থূলে-সূক্ষ্মে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করাই ব্রহ্মোপাসনা এবং এইরূপ উপলব্ধিই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম। অতি প্রাচীন কালে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের উপদেশে মানব মাত্রই ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, অতএব সকলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মানব মাত্রই ব্রহ্মার অপত্য ব্রাহ্মণগণের বংশধর, অতএব সকলেই ব্রাহ্মণজাতীয়। প্রাচীন যুগে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতি ছিল না। ব্রাহ্মণজাতিতেই গুণকর্ম্ম বা আচার ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর পান ভোজন ও বিবাহের আদান প্রদান অবাধে চলিত। চতুর্ব্বর্ণ সসীম ছিল না, যখন যে ব্যক্তিতে যে চরিত্র প্রকাশ পাইত, তখন তাঁহাকে তদনুরূপ "বর্ণ" বলিয়া অভিহিত করা হইত। এইরূপেই ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র হইতেন এবং শূদ্রও

ক্রমে বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হইতেন। প্রাচীনযুগে অনেক জারজ সন্তানও তপস্যা প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়াছেন। স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেরই বেদাধিকার ছিল, সকলেই বৈদিক ক্রিয়াকলাপ স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতেন। তখন সমাজে হিংসা দ্বেষের নাম গন্ধও ছিল না, চিরকালের জন্য কেহ কাহাকে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট মনে করিতেন না, কেহ কাহারো প্রতি ক্রূরদৃষ্টিযুক্ত ছিলেন না। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" জানিয়া তাঁহারা সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব পোষণ করিতেন। এই যুগের নাম বৈদিক যুগ।

তারপর যখন কাল প্রভাবে সমাজে হিংসা দ্বেষ প্রসারিত হইতে লাগিল, তখন বর্ণগুলি সসীম জাতিতে পরিণত হইল। এই সময়ে পরস্পর পান ভোজন ও বিবাহের আদান প্রদান ইত্যাদি সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণ জনসাধারণের সহানুভূতির অভাবে ক্রমে সমাজ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে সমাজ মূল আদর্শ হইতে ক্রমে ভ্রষ্ট হইয়া শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এমনকি বেদেরও অপব্যাখ্যা করিয়া মাতৃজাতি ও শূদ্রবর্ণ বা তথাকথিত শূদ্র-জাতিভুক্ত জনগণকেও বেদাধিকার বা সর্ব্বপ্রকার বৈদিক ক্রিয়াকলাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হইল। যেদিন সার্ব্বজনীন বেদাধি-কারের প্রথা সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়াছে, সেইদিন অবধি সমাজে নিদারুণ হিংসাদ্বেষ ও বিশৃঙ্খলা বিশেষরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর পর আজ পর্য্যন্ত তাহারই জের চলিতেছে।

আমি—হিংসাদ্বেষের জ্বালায় সমাজে গুরুতর অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। কাহারও প্রাণে সুখ নাই, শান্তি নাই, প্রেম নাই, আনন্দ নাই। এ অশান্তির কিরূপে প্রতিকার হইতে পারে?

গুরুদেব—সমাজে পুনরায় বেদাচার প্রতিষ্ঠিত হইলেই শান্তি আসিবে। চতুর্ব্বর্ণ চরিত্র ভেদে চারিটি বিভাগ মাত্র, তাহা ব্যক্তিগত। ইহা কোন জাতিত্বের পরিচায়ক নহে। বর্ত্তমানে ভগবদিচ্ছায় এই

সসীম চারিটি বৃহৎ জাতি এবং শত শত উপজাতি ভাঙ্গিয়া সমাজকে এক ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত করিতে হইবে। স্ত্রীশূদ্রনির্ব্বিশেষে মানবমাত্রকেই বেদাধিকার প্রদান করিতে হইবে। জগতের যে কোন ব্যক্তি বৈদিক ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিলে তাহাকে বৈদিক দীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক বেদাচার শিক্ষাদানে গড়িয়া লইতে হইবে। সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতে হইবে। মনমুখ এক করিয়া বুঝিতে হইবে ও বলিতে হইবে—"আমরা সবাই একের সন্তান, একের অংশ, আমরা সবাই ভাই ভাই, আমরা সবাই এক পরিবার ভুক্ত।" শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টরূপ ক্রূরদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া সকলকেই আত্মস্বরূপ জানিতে হইবে। ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া হিন্দুমাত্রকেই বৈদিক দীক্ষা (উপনয়ন সংস্কার বা বেদাধিকার) গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্বিজাচারী ও সদাচারী হইয়া বৈদিক যুগের অনুসরণে চলিতে হইবে। এইরূপে শুদ্ধ বিজ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মোপাসনায় জগৎ দীক্ষিত হইলেই বিশ্বব্যাপী এক ও অদ্বিতীয় সত্তা উপলব্ধির ফলে হিংসাদ্বেষ সমূলে অপসারিত হইয়া শান্তি প্রেম ও একতা স্থাপিত হইবে।

আমি—সমাজের পুনর্গঠনে বৈদিক দীক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে কি না ?

গুরুদেব—অন্য সমাজের কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রাচীন ঋষি-গণ ভগবদিচ্ছা অবগত হইয়া যে ধারা অবলম্বনে সমাজ গঠন করিয়া গিয়াছেন, এখনও সেই পন্থাই অনুসরণ করিতে হইবে। বৈদিক দীক্ষা ব্যতীত বেদাচার প্রতিপালনে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ স্বয়ং স্বহস্তে অনুষ্ঠানে অধিকার জন্মে না। জপধ্যান পূজার্চ্চনা যজ্ঞ ও ভোগরাগাদি-কার্য্য আত্মযজ্ঞনামে অভিহিত। যজ্ঞসূত্র হস্তে লইয়া আত্মযজ্ঞ ঋষিদের বিধান। অতএব সে বিধান মানিয়া লইয়া বৈদিক দীক্ষা গ্রহণ সকলের পক্ষেই অবশ্যকর্ত্তব্য।

আমি—আপনি যে মাঝে মাঝে বলিয়া থাকেন "আমার মন্ত্র যাহারা গ্রহণ করিবে, তাহাদের শূদ্রত্ব থাকিবে না, অতএব তোমরা উপবীত গ্রহণ কর" এ কথার ভাবার্থ কি?

গুরুদেব—আমি মায়ের কোলের শিশু। শ্রীভগবান স্বয়ং কৃপা করিয়া, কখনও নানাবিধ শ্রীরূপে প্রকাশিত হইয়া কখনও বা "বাণী" দ্বারা আমাকে নানা মন্ত্র ও পূজার্চ্চনাদি শিক্ষাদানপূর্ব্বক সাধনায় অগ্রসর করাইয়াছেন। "আমি তাঁর হয়ে গেছি" অর্থাৎ মায়ের ইচ্ছায় আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। মায়ের ইচ্ছায় তোমাদিগকে যে মন্ত্র শুনাইয়া থাকি, তাহা সাক্ষাৎ ভগবদ্বাক্য। আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বয়ং মা-ই তোমাদিগকে দীক্ষা প্রদান করেন। এইজন্যই মায়ের অযাচিত কৃপা প্রভাবে অতিসহজেই তোমাদের দর্শনাদেশলাভ (পুরশ্চরণ সিদ্ধি) বা ব্রহ্মভাব স্ফুরিত হইয়া থাকে। ইহা তোমাদের তপস্যার ফল নহে, ইহা মায়ের অযাচিত কৃপা। মা এইরূপ ভাবে ব্রহ্মানন্দদানে তোমাদিগকে উপাসনায় অগ্রসর করাইয়া ক্রমে চিত্তশুদ্ধি করাইয়া লইতেছেন। মায়ের কৃপাতেই তোমাদের শূদ্রত্ব (ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা) দূরীভূত হওয়ার পথ সুগম হয়। তোমাদের উপনয়ন সংস্কার বা বৈদিক দীক্ষা গ্রহণ পুনর্গঠনশীল সমাজের কল্যাণ সাধনে বিশেষ সাহায্যকারী। অতএব জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে তোমাদের সকলকেই বৈদিক দীক্ষাগ্রহণ করিতে বলিয়া থাকি।

আমি—জগতের সকলেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হইবেন, ইহা কি সম্ভব?

গুরুদেব—সেই এক ও অদ্বিতীয় তত্ত্ব সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া সমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা। আবার যখন অধি-কাংশ ব্যক্তিই এই তত্ত্ব অনুভূতি করিবার চেষ্টায় সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক

যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন, তখনই সমাজে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা দেখা দিবে।

আমি—এই যে সমগ্র জগদ্ব্যাপী অশান্তি ইহা কি সাধারণ মানবের চেষ্টায় দূরীভূত হইবে? শত সহস্র মানবের চেষ্টায়ই বা কতদূর সফলতার আশা করা যায়?

গুরুদেব—কোন চিন্তা নাই। সন্তানের অপার দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া এবার "মা" স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং এবং জগতের সদ্ব্যক্তিগণের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মীশক্তিপ্রকাশ করতঃ শান্তি স্থাপন কার্য্য সম্পাদন করিবেন। প্রতিকূল অবস্থাসকল মায়ের ইচ্ছায়ই অনুকূল হইয়া আসিবে। মা স্বয়ং কৃপা করিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে "ক্রমে জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে।"

আমি—আপনি "মা" কাহাকে বলেন?

গুরুদেব—যে নির্গুণ পরতত্ত্বে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড লয় পাইতেছে, এবং যাঁহা হইতে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইতেছে, ইনিই ব্রহ্মযোনি আমাদের মা। শুধু আমাদের কেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডেরই মা।"

(শঙ্করানন্দব্রহ্মচারী—"ভারতসমাজ পত্রিকা—গুরুশিষ্য" ১ম সংখ্যা—কার্ত্তিক, ১৩৩৬)

জাতিভেদ ও হিন্দুশাস্ত্র

যে জন্মগত জাতিভেদ হিন্দু সমাজের কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সকল সিদ্ধ মহাপুরুষই যাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে বলিয়াছেন তাহার সমর্থনে এখনও অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত শাস্ত্রের দোহাই দিতেছেন। মহাভারতে বনপর্ব্বের ১৭৯ অধ্যায়ে সর্পের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণোচিত গুণ যাহার আছে সেই ব্রাহ্মণ। অথচ মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে—পিতা ও মাতা যদি এক জাতির হয় তাহা হইলে তাহাদের সন্তানও সেই জাতির বলিয়া গণ্য হয়। (মনু ১০।৯)। পণ্ডিতেরা বলেন, মনুসংহিতার বাক্য এ-বিষয়ে প্রমাণ—মহাভারতে বনপর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে সেটা শুধু ব্রাহ্মণোচিত গুণ সকলের প্রশংসা করিবার জন্য, ব্রাহ্মণের জাতি নির্ণয়ের জন্য নহে। এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া পণ্ডিতেরা নিজেদের মতের বিরুদ্ধ প্রমাণ সকলকে উড়াইয়া দিয়া অজ্ঞান জনসাধারণের উপর নিজেদের মতটি চালাইয়া দেন। এই ক্ষেত্রে নিজেদের যুক্তির দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা জাতিভেদের সমর্থনে আরও দুই একটা যুক্তি উত্থাপন করেন। প্রথম যুক্তি এই যে গুণ অনুসারে বর্ণনির্ণয় করা কার্য্যতঃ সম্ভব নহে, কাহার কি গুণ আছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? অল্পবয়সে তো গুণসকলের স্পষ্ট বিকাশই হয় না—আবার বয়স বৃদ্ধির সহিত লোকের গুণেরও পরিবর্ত্তন হয়—এ-অবস্থায় গুণকে চিহ্ন বলিয়া ধরিলে সমাজে বর্ণবিভাগ রক্ষা করা যায় না; অথচ বর্ণবিভাগ হইতেছে হিন্দুসমাজের ভিত্তি। তাই জন্ম অনুসারেই জাতিবিভাগ সেই মহাভারতের যুগ হইতেই চলিয়া আসিয়াছে, গুণ বা কর্ম্ম অনুসারে নহে—

দৃষ্টান্ত দ্রোণ যোদ্ধা হইলেও এবং অশ্বত্থামা ক্রূর হইলেও সে যুগে ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। এই যুক্তির উত্তর হইতেছে এই যে, গুণ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ কার্য্যতঃ সম্ভব না হওয়ায়, বর্ণবিভাগ জাতি-ভেদেই* পরিণত হইয়াছিল—ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা; অতএব জাতিভেদ এবং চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা এক জিনিষ নহে। সে-যুগে জাতিভেদের দ্বারা অর্থনৈতিক কর্ম্মবিভাগ হইত—সমাজে একটা শৃঙ্খলা বজায় থাকিত, তাই মনুসংহিতা জাতিভেদ প্রথা সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু উহা যে চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রথা হইতে বিভিন্ন তাহাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এবং বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠির স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন। দ্রোণ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে মহাভারতের যুগেই বৈদিক সমাজের চারিবর্ণ বিভাগ গোলমাল হইয়া গিয়াছিল। আবার মনুসংহিতায় যে চারি জাতিভেদের কথা আছে তাহার স্থানে আজ সহস্র জাতিভেদের উদ্ভব হইয়াছে—ইহাকে সেই প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্য বলা কি উন্মাদের প্রলাপ বাক্য নহে? মনুসংহিতার জাতিভেদের দ্বারা যে অর্থনৈতিক কর্ম্মবিভাগের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া সমাজে শৃঙ্খলা থাকিত—বর্ত্তমানে জাতিভেদের দ্বারা সেই উদ্দেশ্যও সাধিত হইতেছে না—কারণ বর্ত্তমানে যে-কোন জাতির লোক যে-কোন বৃত্তি বা ব্যবসা গ্রহণ করিতেছে—যত জাতির হিসাব কেবল নিমন্ত্রণ খাইবার সময় এবং বিবাহের সময় ইহাতে, সমাজ শতধা ছিন্ন হইয়া দ্রুত মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতেছে, ইহার দ্বারা সমাজের কোন প্রয়োজন, কোন কল্যাণই সাধিত হইতেছে না।

কিন্তু উক্ত পণ্ডিতেরা ছাড়িবার পাত্র নহেন—তাঁহারা বলেন ম্লেচ্ছ রাজার অধীনে ব্রাহ্মণাদি জাতি নিজ নিজ গুণের বিকাশ করিতে পারে নাই—দেশ স্বাধীন হইলে তাহা পারিবে। কিন্তু এখন জাতিভেদ

---

* জাতিভেদ অর্থাৎ জন্ম অনুসারে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ—ইহা প্রাচীন বর্ণবিভাগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ।

উঠাইয়া দিয়া আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রচলন করিলে, রক্তের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করিলে আর সেই চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণাদি জাতির রক্তের পবিত্রতা কি এখনও বজায় আছে? অর্জুন বলিয়াছিলেন কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসকাণ্ড হইলে বর্ণসঙ্কর হইবে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সেই ধ্বংসকাণ্ড ঘটাইয়াছিলেন। তাহাতে বর্ণসঙ্কর অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল এবং তাহার দ্বারাই ভারতীয় হিন্দুজাতি বাঁচিয়া গিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন জাতির জীবনীশক্তি যখন ক্ষীণ হইয়া আসে তখন নূতন রক্তের মিশ্রণের দ্বারাই সেই জাতি নবজীবন লাভ করে। আর ইহাও দেখা যায় যে, যে-কোন বংশের, যে-কোন জাতির লোকই উপযুক্ত শিক্ষা ও দীক্ষা পাইলে ব্রাহ্মণোচিত গুণসকল, এমন কি পরম গতি ও ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে। গীতায় ভগবান অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন,

মাং হি পার্থ। ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ গীতা ৯৷৩২

"হে পার্থ, পাপযোনিতে যাহার জন্ম হইয়াছে এবং স্ত্রী, বৈশ্য অথবা শূদ্র যে-কেহ আমার আশ্রয় লয় সেই পরমগতি লাভ করে।"

গীতার এই উদার মহাবাক্য অনুসরণ করিয়াই শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারী স্ত্রী, পুরুষ ব্রাহ্মণ শূদ্র অস্পৃশ্য সকলকেই দীক্ষা দিতেন, কারণ দীক্ষা দেওয়ার অর্থই হইতেছে মানুষকে ভগবন্মুখী করা, ভগবানের শরণাপন্ন হইতে, ভগবানকেই পরম আশ্রয় ও অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া। শ্রীচৈতন্যও মূলতঃ ঠিক এই পন্থা অবলম্বন করিয়া জাতি-ভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন উঠিবে যে জাতিভেদ যদি উঠাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে হিন্দুর সনাতন বর্ণাশ্রম প্রথার কি অবশিষ্ট থাকিবে, আর হিন্দুত্বই বা

কেমন করিয়া বজায় থাকিবে? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈদিক ভারতের সেই প্রাচীন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সেই বাহ্যরূপ বহুকাল আগেই বিশৃঙ্খল ও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—তথাপি হিন্দুত্ব ও হিন্দুসমাজ লুপ্ত হয় নাই। বস্তুতঃ সমাজকে চারিবর্ণে বিভাগ করা একটা সনাতন সত্য নহে—উহা প্রাচীন ভারতে একটা সাময়িক সুবিধাজনক ব্যবস্থা ছিল মাত্র—কালক্রমে তাহা প্রকৃতির বশেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বণ বিভাগের মূলে যে মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক সত্য রহিয়াছে—তাহাই শাশ্বত ও সনাতন এবং গীতায় ভগবান সেই সত্যটিই দেখাইয়া দিয়াছেন,

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

"গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।" এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, কে কোন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহা দ্বারা বর্ণ নির্ণীত হয় না, কাহার মধ্যে কি গুণ আছে তাহা দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ নির্ণীত হয়—আর যাহার যাহা স্বভাবজাত গুণ সেই অনুসারে কর্ম্ম করিলেই তাহার আত্মার বিকাশ সুগম হইবে এবং সেই স্বাভাবিক কর্ম্ম, স্বকর্ম্ম, ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে অর্পণ করিয়া সম্পাদন করিলে মানুষ সেই কর্ম্মের ভিতর দিয়াই সিদ্ধি লাভ করিবে—

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিংলভতে নরঃ।
স্বকর্ম্ম নিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু।।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।। গীতা ১৮-৪৫।৪৬

শ্রীঅরবিন্দ Essays on the Gita গ্রন্থে এই তত্ত্ব বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে ইহা সেই চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ নহে—ইহা তাহার বিকৃতি ও প্রহসনমাত্র, ইহা এখনই পরিহার করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন উঠিবে মনুসংহিতায় যে জন্মগত জাতিভেদের ব্যবস্থা আছে গীতা তাহার বিরোধী হইলে শাস্ত্রের সমন্বয় কেমন করিয়া হয়? হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থায় মনুসংহিতা যে প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থ তাহা বহুকাল হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে—সেই মনুসংহিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া জাতিভেদ উঠাইয়া দিলে কি হিন্দুত্বেরই লোপ সাধন হইবে না ? আর বেদে বলা হইয়াছে,

যদ্ বৈ কিঞ্চিৎ মনুরবদৎ তৎ ভেষজম্—তৈত্তিরীয় সংহিতা "মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধ তুল্য উপকারী" তাহা হইলে গীতা কি বেদবাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছে ? তাহা নহে, কারণ মনুসংহিতা নামক প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রটি যে বস্তুতঃ বেদে কথিত মনুর দ্বারাই রচিত গীতা তাহা স্বীকার করে নাই। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই গীতা বলিয়াছে যে মনু শিক্ষা ও উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন—কালক্রমে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—সেই মনুর যাহা প্রকৃত শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনের নিকট তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব বর্ণবিভাগ জন্ম অনুযায়ী নহে, গুণ কর্ম্ম অনুযায়ী ইহাই গীতার মতে প্রকৃতপক্ষে মনুর বচন এবং ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে ঔষধতুল্য উপকারী।

তাহা হইলে মনুসংহিতা কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছে ? মনুসংহিতার ভাষা ও ব্যবস্থা সকল হইতে বুঝা যায় যে, উহা বৈদিক যুগের বহু পরে রচিত হইয়াছে। তৎকালীন সমাজকর্ত্তাগণ সমাজের পক্ষে যাহা ভাল বিবেচনা করিয়াছিলেন তদনুযায়ী বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করিয়া মনুর নামে চালাইয়া দিয়াছিলেন—বস্তুতঃ মনুসংহিতা ঋগ্বেদাদির ন্যায় সংহিতাও নহে এবং উহা মনুর দ্বারা রচিত হয় নাই। তথাপি মনুসংহিতা খুবই মূল্যবান গ্রন্থ—হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ইহার স্থান খুবই উচ্চে। হিন্দুত্বের যে মূল লক্ষ্য মানুষকে ক্রমশঃ প্রাকৃতজীবন হইতে উত্তোলিত করিয়া অধ্যাত্ম ভাগবত জীবনের দিকে

লইয়া যাওয়া—সেই বৈদিক লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়াই মনুসংহিতা দেশ ও কালানুযায়ী সমাজ-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে—মনুর অনেক ব্যবস্থাই কালক্রমে হিন্দুসমাজ বর্জন করিয়াছে—এমন কি যে জাতিভেদ এখন হিন্দুকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিকে টানিয়া লইতেছে তাহাও মনুকথিত জাতিভেদ নহে—কারণ এখন জন্মের দ্বারা কাহারও ব্যবসা বা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইতেছে না—যাহার যেমন ইচ্ছা, যেমন সুযোগ ও ক্ষমতা—সে সেইরূপই ব্যবসা বা বৃত্তি গ্রহণ করিতেছে। অতএব কি ধর্ম্মের দিক দিয়া, কি সমাজ বা অর্থনীতির দিক দিয়া বর্ত্তমান জাতিভেদ-প্রথাকে বজায় রাখিবার আর কোনই সার্থকতা বা উপযোগিতা নাই। আর এই জাতিভেদ-প্রথা উচ্ছেদের একমাত্র পন্থা হইতেছে আন্তর্জাতিক বিবাহের প্রচলন—যাঁহারা হিন্দু সমাজের প্রকৃত কল্যাণ চান তাহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে অবাধ আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রচলন করা। মেয়েদিগকে যদি অল্পবয়সে বিবাহ করিতে বাধ্য করা না হয়, তাহাদিগকে ব্রহ্মচারী-বাবার নির্দ্দেশমত ধর্ম্মমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাদিগকে ইচ্ছামত স্বামী নির্ব্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রচলিত করা হয় তাহা হইলেই জাতিভেদ এবং মারাত্মক পণ-প্রথা আপনিই উঠিয়া যাইবে এবং হিন্দু সমাজে নূতনশক্তি ও নূতন প্রাণের সঞ্চার হইবে।

অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন

জাতিভেদের সঙ্গে সঙ্গে অস্পৃশ্যতাও দূর করিতে হইবে। সত্য-যুগাঙ্কুর নামক পুস্তিকায় ব্রহ্মচারীবাবা লিখিয়াছেন—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

"গুণ ও কর্ম্মবিভাগ অনুসারেই আমি চতুর্ব্বণ সৃষ্টি করিয়াছি।" ভগবৎ প্রেরিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই জাতিগঠন বা অস্পৃশ্যদোষ বর্জনের একমাত্র উপায়। অস্পৃশ্য দোষ কোন জাতিগত বা সমাজগত নহে, ইহা ব্যক্তি-গত; কারণ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের লক্ষণ বিশিষ্ট অল্পবিস্তর লোক সকল সমাজেই দেখা যায়।

অর্জুন ও দুর্য্যোধন উভয়েই ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব হইলেও অর্জুনের ক্ষাত্রস্বভাব ছিল বলিয়া, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ ও পালনে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন ইহার অভাববশতঃ তাঁহার উপদেশ গ্রহণে সমর্থ হইলেন না। দুর্য্যোধনের প্রকৃত ক্ষত্রিয়োচিত গুণ থাকিলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কোন প্রয়োজনই হইত না।

যাহার স্বভাবতঃই সৎকর্ম্মে, ও সদুপদেশ শ্রবণ ও গ্রহণে অপ্রবৃত্তি বা ভয় (ইহাই শূদ্রত্ব) তিনি এই সকল অপ্রবৃত্তি বা ভীতি দূর করিবার জন্য অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির অভিলাষে ব্রাহ্মণাদি সজ্জনের সঙ্গসেবা করিবেন, ইহাই শূদ্রের কর্ম্ম।

সেবা পরিচর্য্যাদির ফলে ব্রাহ্মণাদি সজ্জনের সংশ্রবপ্রভাবে তাহার আংশিক চিত্তশুদ্ধি হইলে সদ্‌গুরু তাহাকে অধিকারী বুঝিতে পারিয়া ব্রহ্মবীজ বা নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিবেন।

তিনিও তত্ত্বোপদেশ লাভ করিয়া সেবাপূজা ধ্যান ও ধারণাদি দ্বারা চিত্তভূমি কর্ষণ ও তৎসঙ্গে ভাববিনিময় করিবেন, ইহাই আধ্যাত্মিক কৃষিবাণিজ্য এবং বৈশ্যের কর্ম্ম।

তারপর চিত্তশুদ্ধির পথে প্রবল বেগে অগ্রসর হইয়া মনোবৃত্তি-সমূহ জয় করতঃ অসত্যের নাশে সত্য প্রতিষ্ঠা বা দেহ রাজ্যে ধর্ম্মসংস্থাপন করিবেন, ইহাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।

তদনন্তর উপাসনা প্রভাবে আত্মসমর্পণ করিতে বা নির্ব্বাণমুক্তি লাভে যত্নবান হইবেন, ইহাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

সদসৎগুণ স্বভাব ও সংশ্রব এই দুই প্রকারেই প্রকাশ পায়, অতএব ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ স্বাভাবিকগুণে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে নিজ প্রভাবের পরিচয় প্রদান করিবেন, ইহাই শ্রেয়ঃ এবং ইহাই অস্পৃশ্যদোষ বর্জন।

অস্পৃশ্যদোষ বর্জন অর্থে শুধু একত্রে পান ভোজনাদি করাই লক্ষ্য, এরূপ নহে; অস্পৃশ্য দোষমূলক দুর্নীতি বর্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সদাচার এবং নিষ্ঠা পবিত্রতার অঙ্গ, কিন্তু গন্ধহীন পুষ্প যেরূপ শুধু সৌন্দর্য্যে আদরণীয় হইতে পারে না, সেইরূপ সদাচার ব্যতীত শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও আদরণীয় নহে।

প্রাচীন কালে আচারবান ব্যক্তিগণ আচারহীন ব্যক্তিদিগকে অধিকার করিবার জন্য সদাচার শিক্ষাদানে উন্নত করিতেন। কাল প্রভাবে ইহার অভাবে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং হিংসাদ্বেষ আসিয়া জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ করায় বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ ইহাকেই "ছুৎমার্গ" বলিয়াছেন।

(শ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারী—সত্যযুগাঙ্কুর)

শঙ্করানন্দ "ভারত-সমাজ" পত্রিকায় অস্পৃশ্যতা বর্জন সম্বন্ধে যে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"অস্পৃশ্যতা বর্জন শ্রীভগবানের আদেশ।"

"ভগবান সর্ব্বভূতে, সর্ব্বজীবে সমভাবে বিরাজমান, ইহা সকল শাস্ত্র, সকল ঋষি, সকল মহাপুরুষ ও সকল মহাত্মাই দৃঢ়ভাবে প্রচার করিতেছেন। তথাপি আমরা আমাদের অজ্ঞানতাবশতঃ এ সব কথা শুনিতে বুঝিতে বা পালন করিতে চাহি না।

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ,
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন।।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরঃ।
যৎ-কিঞ্চ-ভূতং প্রণমেদনন্যঃ।।

(উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবান—শ্রীমদ্ভাগবত)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি বলিতেছেন 'আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী নক্ষত্রাদি ভূতগণ (প্রাণীসকল) দিক্ সকল নদী সাগর ইত্যাদি যাহা কিছু দৃষ্ট পদার্থ তৎসমস্তই ভগবান হরির শরীর মনে করিয়া প্রণাম করিবে। শুধু তাহাই নহে সর্ব্বভূতে সর্ব্বপদার্থে ভগবানের বিকাশ প্রতিকৃতি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া নানাপ্রকারে সম্বর্দ্ধনা ও সকলের উদ্দেশে বলিদান করিবে।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলের উপাস্য, নমস্য। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়া ভক্তির জন্য সকলে লালায়িত; কিন্তু তাঁহার উপদেশ লঙ্ঘন করিলে তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করা হয়? যাঁহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বা তাঁহার অন্য শ্রীরূপের প্রতি পরমশ্রদ্ধাভাজন, যাঁহারা গঙ্গাস্নান করেন, কাশীগয়াদি তীর্থ ভ্রমণ করেন, তুলসী পূজা করেন, গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সেবা করেন, সেই সব সদাচারপরায়ণ

ভাইদিগকে অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় করিয়া রাখিলে, সানন্দে সম্বর্দ্ধনা না করিলে, তাহাদের জল ও অন্ন গ্রহণ না করিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ও উদ্দেশ্যই লঙ্ঘন করা হয়। কাজের বেলায় শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ও উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া, দশজন সাধারণ মানুষের কথায় চলিলে বুঝিতে হইবে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ লঙ্ঘন করিতে ভয় হয় না, ভয় হয় মানুষকে! ইহাই বুঝি সাধন ভজনের পরিণাম!

ভগবান মনু বলিয়াছেন—

এষ সর্ব্বানি ভূতানি পঞ্চভির্ব্যাপ্য মূর্ত্তিভিঃ।
জন্মবৃদ্ধিক্ষয়ৈর্নিত্যং সংসরয়তিশ্চক্রবৎ।।
এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মনমাত্মনা।
স সর্ব্ব সমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরংপদম্।।

মনু ১২শ অঃ ১২৪-১২৫

পরমাত্মরূপী ব্রহ্মই পৃথিবী, জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মূর্ত্তি দ্বারা সমুদয় প্রাণী ব্যাপিয়া বৃদ্ধি ও নাশ দ্বারা এই সংসার চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত করিতেছেন। এইরূপে যিনি আত্মদ্বারা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন, তিনি সর্ব্ব সমতা প্রাপ্ত হইয়া পরমপদ লাভ করেন।

সর্ব্বভূতেই আমি আত্মারূপে বিদ্যমান, অতএব কেহ আমার অস্পৃশ্য বা বর্জনীয় নহে এবং হইতেও পারে না। হঠাৎ কোন ঘটনায় কেহ জাগতিক হিসাবে অস্পৃশ্য হইয়া পড়িলে, তাহাকে সংশোধনপূর্ব্বক স্পৃশ্য করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। তত্ত্বতঃ সকলেই অভিন্ন, ইহা শুধু শ্রবণ করিলে বা মুখে মুখে বলিলে কি ফল? যিনি এ-কথা বুঝিতে চাহেন না, তিনি সত্য লঙ্ঘনকারী। অতএব তাহার উপদেশ মানিয়া তাহার আদর্শে চলিলে সত্য লঙ্ঘনই করা হইবে। যাঁর জল বা অন্ন

গ্রহণ করিলে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ কোন ক্ষতির কারণ নাই, দেশাচার লোকাচারের দোহাই দিয়া তাহাকে বর্জন করিয়া রাখা নিতান্ত অনুচিত। পরন্তু দেশাচার ও লোকাচার লক্ষ্য করিয়া চলিতে গেলে অনেকস্থলেই 'বর্জনীয়' লোকের জল ও অন্ন গ্রহণ করিতে হয়, ইহাতে সত্য লঙ্ঘন করা হইয়া থাকে।

স্কন্দোপনিষৎ বলেন—

"জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ স জীবঃ কেবল শিবঃ।

তুষেন বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবেন তণ্ডুলঃ॥ ৬

জীবই শিব, শিবই জীব, সেই জীব শিব ব্যতীত আর কিছুই নহে। জীব যখন জীব-ভাব হইতে মুক্ত হইয়া কেবল স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন, তখনই তিনি শিব। যেমন তুষবদ্ধ অবস্থার নাম ব্রীহি বা ধান্য, আর তুষমুক্ত অবস্থার নাম তণ্ডুল বা চাউল।

এবং বদ্ধস্তথাজীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।

পাশবদ্ধস্তথাজীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ॥ ৭

অষ্টপাশবদ্ধ শিবই জীব, অষ্টপাশমুক্ত জীবই শিব।

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবল শিবঃ।

ত্যজেদজ্ঞানং নির্ম্মাল্যং সোঽহম্ভাবেন পূজয়েৎ।

এই দেহই দেবালয়, এই দেহে জীবরূপী শিব সদাবিরাজমান অজ্ঞানতারূপ নির্ম্মাল্য ত্যাগপূর্ব্বক 'সোঽহং' ভাবে 'আমিই ব্রহ্ম' এইভাবে জীবরূপী শিবের পূজা করা কর্ত্তব্য। এই যে 'শিবের বাক্যরত্ন' এই সব আলোচনা করিলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, জীবে ও শিবে কোন প্রভেদ নাই। শিব, মহামায়ার মহামোহে—ঘৃণা লজ্জা ভয় ইত্যাদি অষ্টপাশের প্রভাবে পড়িয়া, আপনার স্বরূপ ভুলিয়া 'জীব' হইয়া পড়িয়াছেন। এই ভুলও তাঁহারই খেলা, তাঁহারই লীলা। যাঁহারা অষ্টপাশ হইতে কিয়ৎ পরিমাণেও মুক্তি লাভ করিয়াছেন, 'জীব'

যে 'শিব' ব্যতীত আর কিছুই নহেন, ইহা আংশিকভাবেও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকের শিবত্ব এইরূপ অনুভব করিয়া, অন্যের সহিত শিবজ্ঞানে ব্যবহার করিবেন। দেহ যখন দেবালয়, তখন অন্য দেহের প্রতি অমর্য্যাদা করিলে, দেবালয় ও দেবালয়স্থ দেবতার প্রতিই অমর্য্যাদা করা হয়।

জীবের প্রতি শিবভাব এবং দেহকে দেবালয় জ্ঞান, ইহা শুধু মুখে বলিলে সে জ্ঞান প্রকাশ পায় না। সে জ্ঞানের অনুভূতি কাজে দেখাইতে হইবে। যিনি শিব, যিনি দেবালয়স্থ দেবতা, তাঁকে আদর যত্ন করিয়া আনন্দে সম্বর্দ্ধনা করিতে হইবে। তাঁহাকে আপনার মত করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে, গড়িয়া লইয়া তাহার জল ও অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহার শিবত্বজ্ঞানলাভে সাহায্য করিতে হইবে। তবেই ভগবান শিবের উপদেশ প্রতিপালিত হইবে, তাঁহার আদেশ রক্ষিত হইবে।

মানুষের ভয়ে মানুষের কথায় না চলিয়া ভগবান শিবের আদেশোপদেশ যথাযথভাবে বুঝিয়া প্রতিপালন করিলে 'মানব' নামের যথার্থ গৌরব রক্ষা হইবে।" (শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ—ভারত সমাজ পত্রিকা—(২য় সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ সন)

"ভগবান মনু বলিয়াছিলেন—

এধোদকং মূল ফলমন্নমভ্যুদ্যতঞ্চবৎ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়া-মধ্বথাভয় দক্ষিণাম্।। ৪।২৪৭

কাষ্ঠ জল মূল ও খাদ্য যাহা অযাচিতভাবে অর্থাৎ আপনা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয় সে সব এবং মধু ও অভয়দান সকলের নিকট হইতেই গ্রহণ করিবেন।

শয্যাং গৃহাণ্ কুশান্ গন্ধানপঃ পুষ্প মনীন্ দধি।
ধানা-মৎস্যান্ পয়োমাংসংশাকঞ্চৈব ন নির্ণুদ্যেৎ।।৪।২৫০

শয্যা গৃহ কুশ কর্পূর গন্ধদ্রব্য ও জল পুষ্প মণি দধি যবের চাউল ভাজা মৎস্য দুগ্ধ মাংস ও শাক—এ সমুদয় অযাচিতভাবে উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যান করিবে না।

বর্ত্তমানেও অনাচরণীয় শ্রেণাভুক্ত ভাইগণের জল অযাচিতভাবেই আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, ভগবান মনুর মর্য্যাদারক্ষা করিবার জন্যই তাহা প্রত্যাখ্যান না করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা ব্রহ্মহত্যা সুরাপান ও স্বর্ণচুরি ইত্যাদি মহাপাতকে পাতিত্য-দোষ-দুষ্ট ব্যক্তিগণের স্পৃষ্ট জল গ্রহণের পক্ষপাতী নহি, কিন্তু যিনি সদাচারী এবং চরিত্র মাহাত্ম্যবশতঃ যাঁহার জল গ্রহণে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহার জল গ্রহণ করা উচিত। শাস্ত্রে আহার শুদ্ধির বিচারে স্পর্শদোষযুক্ত অর্থাৎ দুষ্ট ভাবযুক্ত কুক্রিয়াসক্ত লোকের স্পৃষ্ট অন্ন ও জলাদি খাদ্য বর্জনেরই ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন।

অখাদ্য ও কুখাদ্যভোজীকেও প্রায়শ্চিত্তান্তে শুদ্ধিভাবযুক্ত করাইয়া লইবার বিধান শাস্ত্রে লিখিত আছে। অতএব অনাচরণীয় ভাইদিগকে যথাশাস্ত্র শুদ্ধিসাধন করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় সমাজে স্থানদান করিলে শাস্ত্র ও ধর্ম্মেরই মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে।"

(সোনার ভারত পত্রিকা ৪র্থ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৩৩)

কিন্তু শুধু প্রচার কার্য্যের দ্বারা অস্পৃশ্যতা দূর হইবে না। বহুযুগের দৃঢ়মূল সংস্কার সহজে দূর হইতে চাহে না। যাহাতে এই সংস্কার প্রতিবন্ধক না হয় সেইজন্য ব্রহ্মচারীবাবা সকল অস্পৃশ্য শ্রেণীকে বৈদিক দীক্ষা বৈদিক আচার দিয়া শুদ্ধ ও সংস্কৃত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যও প্রচার করিয়াছিলেন "সকলেই বেদজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী" কিন্তু তখন হিন্দুসমাজ এমনই জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে সমগ্র সমাজ তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই—সমাজের কোন কোন অংশে সাড়া পড়িলেও সর্ব্বত্র সর্ব্বাংশ সে-ভাবে

সাড়া দিতে পারে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা অনেকটা অনুকূল হইয়াছে—পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্রসংঘাতে হিন্দুর আত্মচেতনা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, এই শুভ মুহূর্ত্তে যথাযথ পন্থা ও পদ্ধতি অনুসরণ করিলে হিন্দু সমাজকে বৈদিক আদর্শে সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত করিয়া সত্যযুগের সূচনা করা সম্ভব হইবে।

ব্রহ্মচারীবাবা সেই পন্থাই দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বৈদিক আদর্শে সমাজকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য তিনি যে "ভারত সমাজ গঠন প্রতিষ্ঠান" স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে (১২ই কার্ত্তিক ১৩৩২) কার্য্য বিবরণীতে দেখা যায়

"পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমৎ বাবা ভারত ব্রহ্মচারী মহোদয়ের উপদেশানুসারে বিগত ১৪।১৫ বৎসর যাবৎ এতদঞ্চলে (প্রধানতঃ পূর্ব্ব ময়মনসিংহের) ব্রাহ্মণেতর সমাজে শতাধিক ভক্ত উপবীত গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং সপরিবারে শ্রীশ্রীশিবলিঙ্গ, শ্রীশ্রীশালগ্রামাদি বিগ্রহ, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীকৃষ্ণ, মা কালী ও মা দুর্গা ইত্যাদি নানা শ্রীমূর্ত্তির প্রাত্যহিক ও সাময়িক পূজা এবং অন্নাদি ভোগ নিবেদন করতঃ বৈদিক আচার বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণেতর সমাজে স্বহস্তে শ্রীশ্রীশালগ্রামাদি বিগ্রহ ও অন্যান্য শ্রীমূর্ত্তির পূজাদি প্রথা না থাকায়, এক কথায় বলিতে গেলে, বেদাধিকার না থাকায়, হিন্দুসমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং তজ্জন্যই বহুলোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছেন।

অতএব হিন্দুমাত্রেরই বৈদিক আচার অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক এবং ইহাই হিন্দুসমাজের উন্নতির একমাত্র উপায়।"

'সোনার ভারত' পত্রিকায় ৪র্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৩৩) আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী শ্রীঅশ্বিনীকুমার বর্ম্মাধর মহাশয় লিখিয়াছেন—

"কেহ কেহ বলেন যে অনাচরণীয় ভাইগণ আগে সদাচারী হউন, আমরা পরে তাঁহাদের জল গ্রহণ করিব, তাঁহারা সদাচারী হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাদের জল গ্রহণে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে না।

ইহার ভাবার্থ এই যে, বহু পুরুষ যাবৎ যে সংস্কার চলিয়া আসিতেছে, বিশেষরূপ সদাচার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সেই বিরোধী সংস্কার দূরীভূত হওয়া খুবই কঠিন।

বাস্তবিক এ কথাটা অনেকাংশে সত্য। বহুযুগের বদ্ধমূল সংস্কার দূরীভূত হওয়া খুবই কঠিন। আর যাঁহারা জলাচরণীয় হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাও আপনাদের নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত ভাইদের জল গ্রহণে সহজে স্বীকৃত হইতেছেন না। প্রত্যেকে উচ্চতর শ্রেণী হইতে যে অধিকার লাভ করিতে চাহেন, নিম্নতর শ্রেণীকে ঠিক সেই অধিকার না দিলে তাঁহারা স্বয়ং সেই উচ্চ অধিকার লাভের দাবী হইতে অনধিকারী হইয়া পড়েন। এখন দেখা যাইতেছে যে, সদাচার প্রতিষ্ঠাই এইসব আপাতবিরোধী সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।

অতএব উচ্চশ্রেণীদের প্রতি আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা স্বেচ্ছায় অন্যান্য শ্রেণীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া, প্রাণ খোলাখুলি ভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া, প্রত্যেক কথা ও কার্য্যে তাঁহাদিগকে সদাচারী করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করুন। নিজ পরিবারের বালকদিগকে তাহাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল বিধানের অভিপ্রায়ে সদুপদেশ দানে মানব নামের গৌরব রক্ষার অধিকারী করিয়া তুলিতে যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করেন, আপনারাও সমাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে শীর্ষস্থানে অবস্থান করতঃ কনিষ্ঠভ্রাতাদিগকে সৎশিক্ষা প্রদানে আপনাদের ভাই বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকারী করিয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করতঃ আপনাদের স্বাভাবিক মাহাত্ম্যের পরিচয় প্রদান করুন।

বদ্ধমূল বিরোধী সংস্কার প্রথমতঃ আপনাদিগকেই ভঙ্গ করিয়া আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে। আপনারা আদর্শ প্রদর্শন করিলে অন্যেরাও ক্রমে পরস্পরের মধ্যে সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার শক্তিলাভে সমর্থ হইবেন। কার্য্যতঃ আদর্শ প্রদর্শন ব্যতীত শুধু মুখের কথা কোনদিনই কোনরূপ ফল প্রদানে অসমর্থ।

অতঃপর উন্নতিকামী ভ্রাতাগণের প্রতি বিনীত প্রার্থনা এই যে আপনাদের দাবী পূর্ণ হওয়া বা না হওয়ার ভার সম্পূর্ণভাবে আপনাদের উপরেই নির্ভর করে। যদি অন্যেরা শুধু অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান সামাজিক দুর্দ্দিনে আপনাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন তবে আপনারা পূর্ব্বের ন্যায়ই অকর্ম্মণ্য ও অনধিকারী থাকিবেন এবং আপনাদের কার্য্যকরী শক্তি এব মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে প্রবল বাধা ঘটিবে। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্" পরবশ হইতে বা শুধু পরের অনুগ্রহ-ভাজন হইতে চেষ্টা না করিয়া আপনারা আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মনির্ভরতা সহায়ে কার্য্যে অগ্রসর হউন। আপনারা সদাচারী হইতে চেষ্টা করুন। সে চেষ্টা আপনাদের ভিতর না থাকিলে বাহির হইতে শত চেষ্টায়ও কিছুমাত্র ফলপ্রদ হইবে না।

আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি যে, আপনাদের মধ্যে আস্তিক ধর্ম্ম ও ভগবদ্বিশ্বাসী, সত্যনিষ্ঠ সাধুগুরু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সেবক, তুলসী গঙ্গাজল ও হরিনামে ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ, পরোপকারী, পরসুখে সুখী, অনিন্দুক, অকপট, অনলস, লোভহীন, ভোগ-বিলাসে বিরোধী, ত্যাগী, অহঙ্কারশূন্য, অতিথিপূজক, পবিত্রহৃদয়ে তীর্থভ্রমণকারী, সৎকার্য্যে শারীরিক পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ বা ভূসম্পত্তি দাতা মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠাকারী গোপালক এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কর্ত্তব্য কর্ম্মে যথাশক্তি ক্রিয়াবান লোকের অভাব নাই। এরূপ লোকের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইবে, সমাজ ততই উন্নত হইবে। আগুন যেমন

চিরকাল ছাই-চাপা থাকে না, তেমনি আপনারাও সদাচারী হইলে কে আপনাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া রাখিতে পারিবেন? সমাজের স্রোত ফিরিয়াছে, ভাবের পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, সত্যের বিমল জ্যোতির আভায় মানবহৃদয়ের কালিমারাশি অপনীত হইয়া যাইতেছে, গ্রামে গ্রামে সত্য-ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সেবক ত্যাগী কর্ম্মী দেখা দিতেছেন। চিন্তাশীল দূরদর্শী ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, আপনাদিগকে পৃথক রাখিলে সমাজের অস্তিত্ব রক্ষাই দুষ্কর হইয়া উঠিবে এবং ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ পাপেরই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। এ শুভ সুযোগ, প্রাকৃতিক গতির এই অনুকূল অবস্থা উপেক্ষা না করিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ভরশীল হইতেও বিশেষরূপ যত্নবান হওয়া উচিত।

"সমুদয় জীব জগৎ যে এক ব্রহ্মেরই অনন্ত বিকাশ—এই অদ্বৈত-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার আন্তরিক চেষ্টাই সদাচারী হইবার মূল ভিত্তি। তন্ত্রোক্ত "সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" বা সামবেদীয় 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যসকল সেই অদ্বৈততত্ত্ব ধারণার সহায়। দীর্ঘকাল এ মহাবাক্যে দীক্ষা বা ব্রহ্মদীক্ষার প্রথা সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই, কেবল দ্বৈতভাব, কেবল ভেদবুদ্ধি, কেবল হিংসাদ্বেষ, কেবল পরকে ছোট করিয়া নিজকে বড় বলিয়া ঘোষণা করিবার হীন প্রবৃত্তির প্রবলতায়, উচ্চাদর্শের অভাববশতঃই সমাজ অবনতির চরম সীমায় অবতরণ করিয়াছে।

ব্রহ্মদীক্ষা বা মহাবাক্যে দীক্ষা ব্যতীত এই দ্বৈতভাব জনিত হিংসা দ্বেষ বা অশান্তির ও অমঙ্গল হইতে মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই।

সর্ব্বশ্রেণীরই, মানবমাত্রেরই ব্রহ্মদীক্ষার উপযুক্ততা লাভের জন্য প্রাচীন ভারতের বৈদিক ঋষিগণ আত্মজ্ঞান প্রভাবে ভগবদিচ্ছা জানিয়া সমাজে সদাচার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

অতএব মানবমাত্রেরই নৈতিকচরিত্র সংশোধনপূর্ব্বক ব্রহ্মদীক্ষা গ্রহণ করতঃ অদ্বৈত তত্ত্বানুভূতি অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভের জন্য যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য এবং ইহাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।"

চতুরাশ্রম

হিন্দুরা বর্ণাশ্রমের বড়াই করেন। কিন্তু বস্তুতঃ সেই প্রাচীন বণবিভাগও যেমন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তেমনই চতুরাশ্রমও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। "সোনার ভারত" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আমাদের চতুরাশ্রমের অবস্থাও এই প্রকার। নাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, নাই গার্হস্থ্যাশ্রম, নাই বাণপ্রস্থাশ্রম, আর সন্ন্যাসাশ্রম থাকিয়াও নাই। কাহাকেও আর বাণপ্রস্থ আশ্রমের পর সন্ন্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখা যায় না এবং নৈষ্ঠিক (কুমার) সন্ন্যাসীদের সহিত সমাজের বিশেষ কোন সম্বন্ধও নাই।

ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার ফলে ওজঃ, বীর্য্য, ধী, মেধা, স্মৃতি ও বুদ্ধিশক্তি ইত্যাদির পুষ্টিসাধন হইত এবং তজ্জন্যই ষড়ঙ্গ বেদচতুষ্টয়াদিতে পারদর্শী হইয়া জ্ঞান বিজ্ঞানে হিন্দু সমাজ এত উন্নত ছিলেন যে, পৃথিবীতে কোথাও তাহার তুলনা মিলে না। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের লোপের সঙ্গে সঙ্গে এ-সবও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বটে, তথাপি এখনও যাঁহারা সাহিত্য বা বিজ্ঞানাদিতে প্রতিভা বিকাশপূর্ব্বক দেশের উন্নতি সাধনে তৎপর হইয়াছেন, তাঁহাদের এই অসাধারণ ধীশক্তি কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্য্য সাধনারই ফল।

এখন আর বালক বালিকাদিগকে চরিত্র গঠনের জন্য ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবার প্রয়োজন বোধ নাই। ছোটবেলা হইতেই ইহাদিগকে

কেবলমাত্র অর্থার্জনের উপযোগী করিবার জন্য স্কুল কলেজাদিতে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া হয়, চরিত্রের সঙ্গে সদাচারের সঙ্গে তাহাদের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা প্রায়ই ভোগবিলাসে মোহিত হইয়া পড়ে, এই অবস্থায় অনেকেরই চরিত্রদোষ ঘটিয়া থাকে। আবার সদাচার প্রতিপালনের অভাব হেতু এবং মনের স্থিরতা সাধনের উপায় অবগত না থাকায়, শারীরিক ও মানসিক আধিব্যাধিতে জর্জরিত হইতে হয়। নাই তাহাদের শারীরিক সুস্থতা, নাই তাহাদের মানসিক চিন্তা-রাশি, নাই তাহাদের পারমার্থিক জ্ঞান।

তাহাদের জ্ঞান শিক্ষার দিক দিয়া এই পর্য্যন্তই দেখা যায় যে, ময়মনসিংহ সহরের তেরীপট্টি যাইতে অমুক রাস্তা, টেমস নদীটা এইরূপ, বুদ্ধদেব অমুক সনে দেহত্যাগ করেন, অমুক রাজার বংশাবলী এইরূপ এবং জাপানে প্রস্তুত দেশলাই আমাদের অভাব পূরণ করে ইত্যাদি; না হয় অন্ততঃ দুচারিটি মহাদেশের কথা।

অবশ্য মানব মাত্রেরই ভাষা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও কল কারখানা ইত্যাদি শিক্ষা করা প্রয়োজন, ইহা আমরা শতবার স্বীকার করি। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, এবার আমরা দেবদুর্ল্লভ মানব জন্ম পাইয়াছি বলিয়াই ত এই সবের প্রয়োজন বোধ করিতেছি ও নানা-রূপ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতেছি। এমন সাধের মানবজন্ম আবার পাইবার জন্য কি কাজ করা হইতেছে? যে-দেহে বাস করিয়া যে-মন দ্বারা সারা পৃথিবীর খবর পাওয়া যাইতেছে, সেই দেহের বা মনের স্বরূপ সম্বন্ধে কি জ্ঞান লাভ হইতেছে? তারপর ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা ত বড় কথা।

এই ত গেল আমাদের প্রথম আশ্রমের কথা। দ্বিতীয় আশ্রমের অবস্থা ততোধিক শোচনীয়। বিবাহের পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক, অর্থোপার্জনের জন্য কোন বিষয়কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা হইল, ভাগ্য-

ক্রমে অর্থার্জনের সুবিধাও হইল, তখনও আমরা ঈশ্বরচিন্তার সময় পাই না। সারাদিন সংসার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, আর রাত্রিতেও শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে আলস্য জড়তা আসিয়াই ঘিরিয়া ফেলে, তখন আর শাস্ত্রালোচনা বা ঈশ্বরচিন্তা করিবার অবসর কোথায়?

তারপর তৃতীয় আশ্রমের ত অবসরই নাই, কারণ যমের বাড়ীতে গিয়া আর বাণপ্রস্থ হয় না!

চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস। যদি কেহ পূর্ব্ব কোন জন্মের বিশেষ সুকৃতি বলে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পাঠ্যাবস্থা হইতেই 'শ্রীহরি' স্মরণপূর্ব্বক এক চম্পটে হরিদ্বার বা হৃষীকেশে বা মহাপুরুষের আশ্রয় লইলেন, তবে ত তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কোনমতে শ্রীভগবানের কৃপায় মহাপুরুষদের আশ্রয়ে থাকিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিবার শুভ অবসর পাইলেন।

যাহা হউক, সন্ন্যাসাশ্রম তাঁহারাই ঠিক রাখিয়াছেন। তাঁহারাই বিশেষ অনুভূতির সহিত বেদান্ত ও উপনিষদাদি আলোচনা করিয়া জীব-ব্রহ্মের একতা প্রতিপাদনে সমর্থ এবং একমাত্র তাঁহারাই ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপায় অবগত আছেন। কিন্তু সমাজে ইহার কিছুই নাই। দ্বিজশ্রেণীর উপনয়ন প্রথা মাত্র আছে, ব্রহ্মদীক্ষার প্রথা একেবারেই নাই, কারণ চতুরাশ্রম ত এখন আর নাই, ব্রহ্মদীক্ষার ক্ষেত্র পাওয়া যায় কোথায়?

"এই অবস্থায় কিরূপে হিন্দুধর্ম্মের বা সমাজের উন্নতি হইতে পারে, তাহা সকলেরই চিন্তার বিষয়।"

(সোনার ভারত পত্রিকা ১ম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৩৩ সন—সম্পাদক)

ব্রহ্মচারীবাবা বর্ণাশ্রম আদর্শই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেজন্য উহার মূলে যে চিরন্তন সত্য ছিল, যাহা প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম সেইটিকেই ধরিয়াছেন, কারণ তিনি ছিলেন সত্যাশ্রয়ী, বর্ণাশ্রম

এবং অস্পৃশ্য বর্জনের নামে বর্ত্তমান সমাজে যে মিথ্যা ও অনাচার চলিতেছে সে-সবই তিনি নির্ম্মমভাবে বর্জন করিতে বলিয়াছেন।

চতুরাশ্রমের অন্তর্নিহিত সত্য হইতেছে এই যে, মানুষ অধ্যাত্ম আদর্শ অনুসারে সাংসারিক জীবন যাপন করিয়া ক্রমশঃ দিব্য অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিবে এবং যাহাতে সে ইহা করিতে পারে সেজন্য প্রথম বয়সেই তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে।

প্রাচীন কালে এই শিক্ষাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নামে অভিহিত ছিল এবং ছিল চতুরাশ্রমের সুদৃঢ় ভিত্তি। আজকাল কোথাও কোথাও ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে—ইহা আশার কথা, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বাহ্যিক আচরণের উপরই জোর দেওয়া হইতেছে, ছেলেদিগকে গেরুয়াবস্ত্র পরিধান, কম্বলে শয়ন, উপবাস, স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি করান হইতেছে। কিন্তু নানারূপ কঠোরতা অভ্যাস করাইলেই ব্রহ্মচর্য্য হয় তাহা ঠিক নহে—বরং অনেক সময়েই বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। ছেলেমেয়েদিগকে সরল সৌন্দর্য্যময় আনন্দময় জীবন দিতে হইবে এবং যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিতে হইবে—তাহারা মাটি বা লোহা নহে যে বাহির হইতে পিটাইয়া মনের মত গড়িয়া তোলা যাইবে, তাহারা জীবন্ত সত্তা, গাছ পালা যেমন অনুকূল আলো বাতাস, জল পাইলে আপনা আপনি ভিতর হইতে গড়িয়া উঠে—ছেলেমেয়েদিগকেও সেই-ভাবে বর্দ্ধিত হইতে দিতে হইবে। শিক্ষকদের অধ্যাত্ম-চরিত্রের প্রভাবে ছাত্রদের চরিত্র আপনি সুন্দর সচ্চরিত্র হইয়া গড়িয়া উঠিবে—ইহা ছাড়া সুশিক্ষার অন্য পন্থা নাই। পুরাকালে মুনি ঋষিদের আশ্রমে গিয়া ছাত্রগণ বাস করিত এবং তাহাই ছিল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—এখনও যত-দূর সম্ভব সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে এমন আব-হাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে যেন ছাত্রদের মনে আপনি ভগবদ্‌ভক্তি

জাগ্রত হয়—তাহারাও স্বাভাবিক প্রেরণার বশে পূজা উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেই সঙ্গে এমন শিক্ষা দিতে হইবে—যেন তাহাদের জ্ঞানার্জনীশক্তিগুলি পুষ্ট হয়, কেবল কতকগুলি তথ্য মুখস্থ করিলেই শিক্ষা হয়না। শিক্ষার এক মূল নীতি হইতেছে, "কাহাকেও কেহ কিছু শিখাইতে পারে না" সকলকেই আপনা আপনি শিখিয়া লইতে হয়। এ-বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের A National System of Education গ্রন্থে যে-সব মূল সূত্র দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি অনুসরণ করিলেই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আদর্শ রক্ষিত হইবে।

অল্পবয়স হইতে যাহাতে বালকগণ বীর্য্যক্ষয় করিতে অভ্যস্ত না হয়—সেদিকে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ একবার এই অভ্যাস হইলে তাহা দূর করা কঠিন এবং তাহাতে সমস্ত জীবনই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বীর্য্যক্ষয়ে দোষ কি, বীর্য্য রক্ষা করিলে রেতঃ কেমন ওজঃ হইয়া শরীরকে সুস্থ বলিষ্ঠ দীর্ঘায়ু করে ইহা বালকগণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু শুধু মৌখিক উপদেশ দিলে চলিবে না। সঙ্গদোষে ছেলেরা এই সব কু-অভ্যাস অর্জন করে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তিরা যদি কনিষ্ঠদের শিখাইয়া না দেয় তাহা হইলে তাহারা শিখিতে পারে না। এ-বিষয়ে বয়স্কদের দায়িত্ব খুব বেশী—সমাজের জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে এই অসৎকার্য্য হইতে বিরত হইতে হইবে। এবং ইহার জন্য প্রয়োজন হইতেছে—সমগ্র সমাজে একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ,—এমন এক বিরাট ধর্ম্ম আন্দোলন যাহাতে সকল মানব ভগবানকে লাভ করাই জীবনের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করে এবং তাহার জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য-রূপে বহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ ও পালন করে।

ব্রহ্মচারীবাবা বিবাহের খুব পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বকালে নিয়ম ছিল যে প্রথমে ঈশ্বরলাভ ব

চিত্তশুদ্ধি করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবে। এইজন্য উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করার বিধি। শাস্ত্রে আছে, ক্রমে বার বৎসর অটুট ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষা করিলে মেধা নামক নাড়ী জন্মে। ইহার প্রভাবে সাধক শমদমাদি গুণ সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকারী হন। পরে বেদান্ত বা গুরুবাক্যে অথবা নিজের অনুভূতিতে অপরোক্ষ-জ্ঞান জন্মিলে ঈশ্বর লাভের অধিকার জন্মে। শমদমাদি গুণযুক্ত না হইলে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের উপলব্ধি হয়না। আগে ঈশ্বরলাভ বা জ্ঞানলাভ করিয়া পরে ঈশ্বরেচ্ছায় গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবে, কিম্বা সমাজ পরিচালনা (সমাজের নেতৃত্ব) করিবে।

"শাস্ত্রে ইহাও আছে যে ঈশ্বরলাভের পূর্ব্বেই যদি গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করা যায়, তবে একটি দুটি সন্তান হইলে পর পুনরায় বাণপ্রস্থ আশ্রমের ভিতর দিয়া সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরলাভ করিবে, ইহা কিন্তু গৌণ বিধি। মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বর-লাভ না হইলে নরলীলার অধিকারী হওয়া যায়না। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ জীবন্মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিতেন বলিয়াই সমাজ উন্নত হইত। এমন কি রাজেন্দ্রগণের মধ্যেও মহারাজ জনক, অম্বরীষ, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বরলাভের পর রাজ্য পরি-চালনা করিয়াছিলেন। কথা এই যে, সংসারের বিষয় বিভীষিকা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের দর্শন-বাক্য পাওয়ার জন্য বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।"

(ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ৮৪।৮৫ পৃঃ)

"ব্রহ্মচর্য্য অর্থে ব্রহ্মে বিচরণ বা ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়া। রজস্তমো-গুণ হইতে ক্রমে মনকে সম্পূর্ণ সত্ত্বে আনিতে পারিলে ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়া যায়। ব্রহ্মভাবই সর্ব্বোপরিভাব। নচেৎ কেবল দুই একবার ঈশ্বর দর্শন হইলেও সিদ্ধিলাভ হয় না।

"এই যে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে লিখিলাম, ইহা দুই প্রকার **বীর্য্যধারণ ও ব্রহ্মে বিচরণ**। বীর্য্যধারণকে কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া থাকেন। অতএব ছেলেমেয়ে তোমাদের সকলকেই বলি যে আমার আদিষ্ট উপাসনা দ্বারা একাগ্রতা ও ধারণাশক্তির বলে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ কর অর্থাৎ ধর্ম্ম-সম্মিলন রূপ প্রকৃতি পুরুষের মিলনে (বিবাহে) মানবলীলার অধিকারী হও।"

(ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ১৩১ পৃঃ)

কিন্তু আগে ঈশ্বর লাভ করিয়া পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবার নীতি সকলেই গ্রহণ করিতে পারে না, করিবেও না। অতএব অধিকাংশ লোককেই গার্হস্থ্যজীবনের ভিতর দিয়াই ক্রমশঃ ঈশ্বরলাভের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত যে গার্হস্থ্যজীবন, তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে গার্হস্থ্যাশ্রম বলা যায়। বিবাহ করিয়াই গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। সহসা যেমন কাহাকেও গুরু করিয়া তাহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে নাই, তেমনই সহসা কাহাকেও বিবাহ করিতে নাই—ইহাই ছিল ব্রহ্মচারীবাবার মত। তিনি বলিয়াছেন, ছেলে মেয়েরা রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া চরিত্র গঠন করুক, কোন বৃত্তি শিক্ষা করিয়া জীবিকা অর্জন করুক, ইতিমধ্যে যদি ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুলতা আসে তাহা হইলে আর বিবাহ না করিয়া সাধক-জীবন গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য ; নতুবা মনের মত জীবনসঙ্গী বাছিয়া লইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবে। বর্ত্তমান সমাজে যেরূপ বিবাহ চলিতেছে, বাবা ইহার আমূল সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যগণকে "কন্যাদায়ে" বিব্রত হইতে নিষেধ করিতেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার দুইখানি পত্র এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"শ্রীমান শঙ্করানন্দের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, গচিহাটা নিবাসী শ্রীমান পূর্ণেন্দুর জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহের

প্রস্তাব চলিতেছে। পাত্রটি নাকি ৺শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত অথচ উপাসক। তোমার মনোনীত হইয়া থাকিলে অত্যন্ত সুখের বিষয়ই বটে, কারণ সৎপাত্রে কন্যাদানই তোমার সঙ্কল্প অথচ শ্রেয়; তবে নির্ব্বন্ধের উপর নির্ভর করে। ভগবান করুন যাহাতে সৎপাত্রে দান করিতে পার তাহাই বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান সময়ে যে-ভাবে বিবাহ চলিতেছে, তাহাতে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, ক্ষেত্রের সকলেই সে আলোচনা করিতেছে। কারণ এই যে, বিবাহের যজ্ঞটি পর্য্যন্ত পুরোহিতই করিয়া থাকেন। যজ্ঞের মন্ত্রের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্বয়ং বরই যজ্ঞক্রিয়ার অধিকারী। ইহার ব্যতিক্রম অর্থাৎ পুরোহিত যজ্ঞক্রিয়া করিলে বেদাচার মতে বিবাহ অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। যদি পাত্র এই মর্ম্ম অবগত না হন, অথবা নিজে যজ্ঞ করিতে অপ্রস্তুত বা অসমর্থ হন তবে তাহাকে কি ভাবে সৎপাত্র বলা যায় তাহা বিবেচ্য বিষয়। বিশেষতঃ শূদ্রাচারী পাত্র সৎপাত্র হইতে পারে না। গ্রাম যাজক পুরোহিত দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করাও অশাস্ত্রীয়, এতৎ সম্বন্ধে পাত্রপক্ষের সঙ্গে বা পাত্রের সঙ্গে আলোচনা আবশ্যক যাহাতে শূদ্রত্ব বা শূদ্রাচার পরিহার করা যায়। এ-সবের জন্য যদি বিবাহের ব্যাঘাত ধারণা করা যায়, তবে নির্ব্বন্ধকেও খণ্ডন করা হয়।

"জনক মহারাজ ধনুর্ভঙ্গপণ করিয়া, দ্রুপদরাজা লক্ষ্যভেদ করিয়া সৎপাত্র নির্ব্বাচনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অতএব সত্য সংস্থাপন করিতে যাইয়া নির্ব্বন্ধের উপর সন্দেহ আনয়ন করা অজ্ঞতা বই আর কিছুই নয়, ইহাতে ধনী দরিদ্রের তুলনা আবশ্যক করে না। এ সব সম্বন্ধে তোমাদের সমাজে বিশেষরূপ আলোচনা আবশ্যক।

গতকল্য রাত্রিতে মা বলিয়াছেন—বিবাহের মন্ত্র বাঙ্গালায় ব্যাখ্যা করিতে হইবে।"

(ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ১৮০পৃঃ)

"তোমার পত্র পাইলাম। শ্রীমতী বাণীর বিবাহ সম্বন্ধে মা বলিয়াছেন 'সে (যোগেন্দ্র নারায়ণ কারকুণ) যে রকম ঘরে বিবাহ দিতে ভাল মনে করিতেছে আমি সেরূপ ঘরে দিব না। আমি যে ঘরে ভাল মনে করি তেমন ঘরে দিব। সে এত চিন্তা করে কেন?' সুধীরের মায়েও ডাকিয়াছিল—তাহারও আদেশ হইয়াছে—'আরও পরে বিবাহ হইবে—চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।'

"আমিও দেখিতেছি অনর্থক মনটাকে অস্থির করিতেছ। কারণ একদিকে আমরা সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বাবস্থায় সকল প্রকারে মায়ের শ্রীপদে নির্ভর করিয়া চলিতেছি এবং চলিতে চাহিতেছি। অপরদিকে দার্শনিক হিসাবেও যাহা প্রচলিত সমাজের রীতি, তন্মধ্যে যাহা অসমীচীন তাহা পরিবর্ত্তন করিতেও আমরা প্রয়াসী।

"বর্ত্তমান সময়ে প্রাকৃতিক হিসাবে বা মায়ের ইচ্ছায়ই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে অনেক মেয়ের ও ছেলের বয়স বেশী হইয়া বিবাহ হইতেছে। অথচ আমরাও দেখিতেছি যে ২০।২২ বৎসরের মেয়ের সহিত ৩৫।৩৬ বৎসরের ছেলের বিবাহ হইতে জরা ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু ইত্যাদি দোষসমূহ ক্রমে অপসারিত হইবে। ভারতীয় জাতীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মিলনই প্রচার্য্য বিষয়। পাশ্চাত্য শিক্ষিত ছেলের বৈষয়িক উন্নতি থাকিলেও ইহা পুরীষ মূত্রের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

"পুরাণে পাওয়া যায় যে, রাজার কন্যা ইচ্ছা করিয়া পর্ণকুটিরবাসী সত্যপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ভগবদ্ভক্তকে বরণ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মানুযায়ী কোন সময়ে সপ্তম অষ্টম বা নবম বৎসর বয়সে মেয়ে বিবাহের প্রথা ছিল, কোন সময়ে ২০।২২ বৎসর বয়সে মেয়ে বিবাহের প্রথা ছিল।

"অতএব লিখি আমাদের সঙ্গে মায়ের কোন প্রকার শত্রুতা নাই। অথচ তাঁহার উপরেই নির্ভর দিয়া যখন চলিতেছি তখন জানিবা যে, এখন যাহা জীবনে ঘটে ইহাই ভবিষ্যতে আদর্শরূপে পরিণত হইবে।

"আমরা লৌকিক ভালমন্দের ধার ধারি না এবং ধারিবও না। কারণ লৌকিক হিসাবেও কোন কাজ করিতে চাহিলে, একদলে ভাল বলিয়া থাকে, আর একদলে মন্দ বলিয়া থাকে, এসব দেখিলে চলিবে না। আজকালের কত মেয়ে ২০।২২ বৎসরেও অবিবাহিতা অবস্থায় আছে, সীমা নাই, আর বাণীর বয়সত ১৭ বৎসরই এ জন্য চিন্তা আনয়ন করা একেবারে অসঙ্গত মনে করিবা।

"কেবল মানুষের নিকট বিবাহ দেওয়া কেন? এই মনে করিয়া অদ্য প্রায় ৪।৫ বৎসর হইল শ্রীমান্ গোবিন্দ তাহার কন্যা সুমতিকে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দনের নিকট বিবাহ দিয়াছে।"

(ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ১৮১পৃঃ।)

ব্রহ্মচারীবাবা বিবাহকে কত উচ্চস্তরে তুলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি স্ত্রীকে জগন্মাতারূপেই দেখিতে উপদেশ দিতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার আর একখানি দিব্যপত্র এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"তোমার পত্রখানিতে শুভ সংবাদ পাইয়া খুব আনন্দিত হইলাম। মা যে কৃপা করিয়া মানবীয় রূপে তোমার সহধর্ম্মিণী হইয়া রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে আসিবেন ইহা বড়ই আনন্দের কথা। সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেই অধীনা হইয়া আশ্রয় দিয়াছেন, ইহাকেই তোমরা বিবাহবন্ধন বলিয়া থাক। বিবাহ অর্থে অধীনা, আশ্রিতের জীবনের সম্পূর্ণ ভার অঙ্গীকার করিয়া গ্রহণ করা বুঝায়।

"এই যে তোমরা মাতৃমূর্ত্তিতে অকর্ত্তৃত্বের লক্ষণ অধীনা, আশ্রিতা, অবলার ভাব দেখিতেছ ইহাই পরাপ্রকৃতির ধর্ম্ম। মানুষমাত্রেরই নিজেকে এইরূপ অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সোঽহংজ্ঞানে নির্লিপ্ত অকর্ত্তা জানিতে হইবে। এই জন্যই মাতৃজাতি তোমাদের আদর্শ-রূপে গ্রহণীয়। তাই লিখি পূর্ব্বোক্ত দৃষ্ট ভ্রান্ত বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক

মায়ের করুণা স্মরণ করিয়া তাঁহারই দান জানিয়া, আদর্শরূপে গ্রহণ করিও; অথচ সতীর সতীত্বের রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিও। মা মহাশক্তির অংশসম্ভূতা পতিব্রতা সতী সঙ্গিনী হইলে পুরুষের কোন বিপদ আশঙ্কা থাকিতে পারে না।

"পুরাণাদি আলোচনা করিয়া জানা যায় যে সহধর্ম্মিণী প্রভাবে কেহ ঘোর বিপদ হইতে ত্রাণ পাইয়াছেন। আর কেহ কেহ সহধর্ম্মিণীর অভাবে নানা প্রকার লাঞ্ছনাও ভোগ করিয়াছেন। তবে কথা এই যে পূর্ব্বে ছেলেমেয়েদের উপাসনা প্রভাবে ভগবৎ আদেশ অনুযায়ী মিলন হইত। এখন সে সময় নাই। কাজেই তোমাদের ইহাই ভগবদ্ ইঙ্গিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতেও কিছু আসে যায় না। জ্ঞান অর্জন করিতে চেষ্টা কর। আত্মসমপণ ভাব বলবতী হউক, কোন চিন্তা নাই।

"সতীর সতীত্ব রক্ষার হেতু কি জান? তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য লালন পালন ও তাড়না করিবে কিন্তু কোন প্রকার অসৎ ব্যবহার করিবে না। বিবাহ বলিতে একটি বিলাসের জিনিষ গ্রহণ করা বুঝায় না। জগতের কোন মঙ্গলের জন্য যে কয়টি সন্তান হইবে, কোন তারিখে তাহাদের গর্ভাধান হইল তাহা মাতা পিতার বিশেষরূপ জ্ঞাত থাকা চাই নচেৎ সৃষ্টি রক্ষার ভাণ করিয়া অযথা সন্তান জনিত কুব্যবহার করিলে সতীর সতীত্বের শক্তিহ্রাস হেতু লক্ষ্মীনাশ হইয়া, ধনহানি, দৈহিক রোগ, পীড়া মনস্তাপাদি ত্রিতাপ এবং পুনঃপুনঃ জন্মমরণ জনিত জ্বালা যন্ত্রণা ভুগিতে হয়।"

(ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ১৬১পৃঃ)

কর্ত্তব্যোপদেশ

বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক কি ভাবে গৃহস্থের কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, সে সম্বন্ধে তিনি বিশদভাবেই উপদেশ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই সব বিধি নিষেধ পালন করিয়া গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করাই দিব্য ভাগবত জীবন নহে। দিব্য জীবনে মানুষ হইবে এই দেহেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—তাহার প্রকৃতি এমন ভাবে রূপান্তরিত হইবে যে তাহার সকল চিন্তা, সকল ভোগ, সকল কর্ম্ম ও অনুভূতি স্বভাবতঃই হইবে সত্য, শিব, সুন্দর—তখন কোন বাহ্য নিয়ম পালনের প্রয়োজন হইবে না। সে জীবনের স্বরূপ কি হইবে অজ্ঞান মন তাহার স্পষ্ট ধারণা করিতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার The Life Divine গ্রন্থে সেই জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত ও আভাস দিয়াছেন। ভারতব্রহ্মচারী সেই দিব্য জীবন বর্ণনার কোন প্রয়াস করেন নাই—কেবলমাত্র এইটুকু বলিয়াছেন যে, আগে ভগবানকে লাভ করিয়া তাহার পর ভগবানের সহিত নিগূঢ় ঐক্য ও যোগে যে সাংসারিক জীবন তাহাই হইবে দিব্যজীবন। গার্হস্থ্যজীবন কি ভাবে যাপন করিলে মানুষ ক্রমশঃ সেই দিব্যজীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিবে সেই সম্বন্ধেই তিনি উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যহ নিয়মিত ধ্যান ও উপাসনা করা। প্রাচীন যোগপন্থা অনুযায়ী তিনি আসন ও প্রাণায়ামের উপদেশ দিয়াছেন—কিন্তু এ-সব বহিরঙ্গ, মূল জিনিষ হইতেছে মনের একাগ্রতা এবং আত্মসমর্পণ। তিনি বলিতেন—"যাহাতে শ্রীভগবানে পূর্ণ নির্ভরতা আসে, তজ্জন্য সমস্তদিন সাংসারিক কাজ করিতে করিতে যথাসাধ্য ইষ্টমন্ত্র জপ এবং 'মাগো, বাবাগো!

আমাকে কৃপা কর, অপরাধ ক্ষমা কর, পাপতাপ দূর কর, ভক্তি দাও, আমার দেহ মন প্রাণ তোমার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করাও ও গ্রহণ কর' এইরূপ প্রার্থনা করিবে।

"শ্রীভগবানের কৃপালাভের জন্য এবং উপাসনার বিশেষ অবলম্বন স্বরূপ প্রতি বাড়ীতে অভীষ্ট দেবতার আসন করিয়া যথাসম্ভব পূজার্চনাদি করিবে। উচ্চাধিকারী হইলে ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবে। কিছুদিন পূর্ব্বেও প্রতি বাড়ীতে মা মহালক্ষ্মীর আসন স্থাপিত ছিল, কালক্রমে সেই আসন "মধ্যমপালা" রূপে পরিণত হইয়াছে।"

সাধারণভাবে তিনি নিম্নলিখিত উপদেশগুলি দিয়াছেন—

"সত্যবাক্য অর্থাৎ আবশ্যকীয় বাক্য ভিন্ন অযথা বাক্যব্যয় করিবে না।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাদি কীটাণু পর্য্যন্ত যত নাম ও রূপ সমস্তই এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ভাবিয়া হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলকে সমভাবে ভালবাসিবে।

ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে সুখ দুঃখ নিন্দাস্তুতিতে অবিচলিত থাকিয়া শান্তি দয়া, সমতা, সরলতা ও নিস্পৃহতা প্রভৃতি সাত্ত্বিকগুণসকল সহায়করতঃ সত্যরক্ষার জন্যে নিজের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে হইলেও তজ্জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে।

যাহাতে ইষ্টভক্তির ব্যাঘাত জন্মে অথবা অন্যের ক্ষতির কারণ হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।

কাহারও দ্বারা কোনরূপ আঘাত বা দুঃখ যন্ত্রণা পাইলে, নিজ হাতে নিজ হাত কাটার ন্যায় মনে করিয়া আপনার অজ্ঞাত দুষ্কৃতিবোধে অপরাধ ক্ষালনার্থ শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে।

আবশ্যকীয় কার্য্যকাল ভিন্ন অন্য সময়ে ভগবদ্ভক্তির উদ্দীপনার জন্য ভগবৎ প্রসঙ্গে কাল কাটাইবে।

নিজের দোষ সংশোধন করিবে ও অপরের গুণ গ্রহণে যত্নবান হইবে। নিজের অভাব থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেশীর বিশেষ অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে আপনা হইতেই সার্ব্বজনীন ভালবাসা বা বিশ্বপ্রেম আসিবে।

কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার না করিয়া অথবা কর্ম্মফলে স্পৃহা না রাখিয়া, নিজের ভোগ বিলাসের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, কেবল সদুদ্দেশ্যে কর্ত্তব্য-বোধে যাবতীয় কর্ম্ম সমাধা করিবে; ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ।

পুরুষ কি মেয়ে কাহারও চক্ষে চক্ষে চাহিবে না। আবালবৃদ্ধ যুবা কাহারও সঙ্গে কোনও রূপ তুচ্ছার্থিক বাক্য প্রয়োগ করিবে না।

ব্রহ্মচর্য্য এমনভাবে রক্ষা করিবে যে, বিবাহ হইলেও যে কয়েকটি সন্তান হইবে, ততদিনের অধিক বীর্য্যক্ষয় না হয়। এই নিয়ম লঙ্ঘনে সতীর সতীত্বের শক্তিক্ষয় হেতু আয়ুক্ষয় ও লক্ষ্মীনাশ হইয়া অশেষবিধ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

প্রত্যেকেই কায়ক্লেশে প্রতিমাসে চারপাঁচটি ব্রতোপবাস করিবে এবং পরিবারস্থ সকলকে অভ্যাস করাইবে। ইহা সংযমের খুব সহায়।

ভগবৎ প্রসঙ্গে বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা করিবে না। মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিবে না।

অধিক আহার ও নিদ্রা উপাসকের উপাসনার বিশেষ অন্তরায়। স্মরণ রাখিবে যে প্রসাদ পাওয়ার সময় কয়েক গ্রাস কম খাইয়াই দেহকে কর্ম্মোপযোগী রাখিতে হইবে, বিশেষতঃ ভরা পেটে রাত্রির উপাসনা চলেনা।

ঘুমাইবার ইচ্ছা করিয়া ঘুমাইবে না, ঘুম মনের বিশ্রাম মাত্র। তমোগুণী অসাধকেরাই বেশী ঘুমাইতে চায়। একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে করিতে মনের যে বিশ্রাম আসিবে, তাহাতেই ঘুমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

ভবিষ্যতের কোন প্রয়োজনীয় কাজ মনে মনে পছন্দ করিয়া করিবে না। পূর্ব্বে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনাদি করিয়া স্বপ্নাদেশ বা বাক্যাদেশ পাইলে তদনুযায়ী কাজ করিবে। এইরূপ আদেশলাভ ও প্রতিপালনে আপনা হইতেই আত্মসমর্পণ আসিবে, নচেৎ বন্ধনাশঙ্কা। এমনকি পূর্ব্বকালীন রাজন্যবর্গের অনেকেই এইরূপ ভগবদাদেশে ও তাঁহাদের গুরু ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের উপদেশানুসারে রাজ্য পরিচালনা করিতেন।

গুরুবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস ও তাহা অবিচারে প্রতিপালন করিবে কারণ তোমার অজানা পথ বলিয়া গুরুই একমাত্র পথপ্রদর্শক।"

(ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ১৯৭-২০০পৃঃ)

উল্লিখিত উপদেশগুলির মধ্যে একটি উপদেশ সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন "পুরুষ কি মেয়ে কাহারও চক্ষে চক্ষে চাহিবে না।" কিন্তু সামাজিক জীবনের প্রধান আনন্দই হইতেছে পরস্পরের সহিত আলাপ, দৃষ্টি-বিনিময়, চিন্তার আদান প্রদান। ইহাই যদি বর্জন করিতে হয় তাহা হইলে আর সংসারে থাকিবার প্রয়োজন কি? সন্ন্যাসী হইয়া বনে বা মঠে বাস করিলেই ত গোল চুকিয়া যায়। সংসারেও থাকিব অথচ কাহারও চক্ষে চক্ষে চাহিব না—ইহা কি সম্ভব বা বাঞ্ছনীয়? বস্তুতঃ সকল জীব সকল মানুষ মূলতঃ এক, সকলেই এক ব্রহ্মের প্রকাশ এইজন্য স্বভাবতঃই মানুষ পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়, সমাজবদ্ধ হয়। কিন্তু সেইসঙ্গেই আবার প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অহংভাব সেই মূলগত ঐক্যকে ঢাকিয়া দেয়; প্রত্যেকেই নিজেকে অপর সকল হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে—-এই অহংভাবের প্রেরণায় লোকে অপরকে নিজের বশীভূত করিতে চায়; অপরের ক্ষতি করিয়াও নিজেকে লাভবান করিতে চায়—এইভাবে সমাজে পারস্পরিক সম্বন্ধ মিথ্যা ও বিকৃতিতে পূর্ণ হইয়া উঠে।

তাহা ছাড়া মানুষ অজ্ঞান নিজের মধ্যে কি হইতেছে তাহা জানে না, অপরের ভিতরের ভাব কেমন করিয়া বুঝিবে? আর পরস্পরকে ভুল বুঝার দরুন সত্য সম্বন্ধও স্থাপিত হয় না। অতএব যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হইতেছে, অহংভাব দূর হইতেছে—ততক্ষণ অপরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাইলেই বিকৃতি আসিয়া পড়ে। তাই সাধন অবস্থায় সাংসারিক কর্ম্মের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাহার অধিক কাহারও সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিবে না—এই নিয়ম মানিয়া চলাই সমীচীন বিশেষতঃ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময়ে কামভাব জাগিয়া উঠিতে পারে ইহা অতীব অনিষ্টকর। সেইজন্যই এই নিয়ম করা খুবই সমীচীন যে, কোন স্ত্রীলোকের দিকে চাহিবে না, স্ত্রীসঙ্গে আমাদের নিম্নতর প্রাণসত্তা যে আনন্দ পায় তাহার লোভ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিবে ইহাই হইতেছে ব্রহ্মচর্য্যের মূল সাধন। জ্ঞানলাভের পর, ভগবান লাভের পর সকলের সঙ্গেই সম্বন্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়—তখনই প্রকৃত আত্মবিনিময় ও আদান প্রদানের দিব্য আনন্দ লাভ করা যায়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার The Life Divine গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন—

There is, indeed, an underlying principle of oneness and Nature insists on its emergence in a construction of unity; for she is collective and communal as well as individual and egoistic and has her instrumentation of associativeness, sympathies, common needs, interests, attractions, affinities as well as her more brutal means of unification: but her secondary imposed and too prominent basis of ego-life and egonature

overlays the unity and afflicts all its constructions with imperfection and insecurity. A further difficulty is created by the absence or rather the imperfection of intuition and direct inner contact making each a separate being forced to learn with difficulty the other's being and nature, to arrive at understanding and mutuality and harmony from outside instead of inwardly through a direct sense of grasp, so that all mental and vital interchange is hampered, rendered ego-tained or doomed to imperfection and incompleteness by the veil of mutual ignorance. In the collective gnostic life the integrating truth-sense, the concording unity of gonstic nature would carry all divergences in itself as its own opulence and turn a multitudinous thought, action, feeling into the unity of a luminous life-whole."

(Sri Aurobindo—The Life Divine p 1095-1096)

ইহা সত্য যে, প্রকৃতিতে একটি অন্তর্নিহিত ঐক্যের নীতি আছে এবং ঐক্যের সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতি তাহা প্রকট করিতে বিশেষ প্রয়াস করে; কারণ প্রকৃতি যেমন একদিকে অহংভাবাপন্ন, ব্যষ্টিভাবাপন্ন, তেমনই অন্যদিকে সমষ্টি ভাবাপন্ন, সমূহভাবাপন্ন; সে ঐক্য সাধনার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে—সাহচর্য্য, সহানুভূতি, স্বার্থ-সমন্বয়, পারস্পরিক আকর্ষণ, এসব উপায় ছাড়াও কখনও কখনও ঐক্য স্থাপনের

রূঢ় উপায় অবলম্বন করে ; অহংকেই জীবনের ভিত্তি করায় ঐ ঐক্যের নীতি অনেকখানি চাপা পড়িয়া গিয়াছে এবং এইভাবে জীবনের সকল স্থষ্টিতেই আসিয়াছে অপূর্ণতা, অনিশ্চয়তা। অবস্থা আরও জটিল ও কঠিন হইয়াছে এইজন্য যে, মানুষের সহজ উপলব্ধি ও সাক্ষাৎজ্ঞান এখনও খুবই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, অপরের মন বা প্রকৃতি বুঝিতে হইলে বাহ্য ইন্দ্রিয় ও বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহাতে পদে পদে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়—আর পরস্পর সম্বন্ধে এই অজ্ঞানের জন্য মানুষে মানুষে মনের ও প্রাণের আদান প্রদান স্মুষ্ঠুভাবে হইতে পারে না। দিব্য অধ্যাত্ম-চৈতন্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এই অস্থবিধা ও অপূর্ণতা থাকিবে না—তাহা সকল বৈচিত্র্যকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে এবং বহুমুখী চিন্তা, কৰ্ম্ম ও প্রেমকে এক ভাস্বর পূর্ণজীবনের ঐক্যে পরিণত করিবে।

ব্রহ্মচারীবাবার আর একটি অনুপম উপদেশ "ব্রহ্মচর্য্য এমনভাবে রক্ষা করিবে যে, বিবাহ হইলেও যে কয়েকটি সন্তান হইবে, ততদিনের অধিক বীর্য্যক্ষয় না হয়।" যাহারা কামজ উত্তেজনাকে প্রশ্রয় দেয়, বীর্য্য ক্ষয় করে তাহাদের দ্বারা অধ্যাত্ম চৈতন্য, অধ্যাত্ম জীবন লাভ ত দূরের কথা সাধারণ জীবনেও তাহারা অধোগতি ও মৃত্যুর পথই পরিষ্কার করে। ব্রহ্মচারীবাবা তাই ব্রহ্মচর্য্য পালন ও বীর্য্যরক্ষার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন শুধু আধ্যাত্মিকতার জন্য নহে, সাধারণ সমাজ-জীবনেরই কল্যাণ ও উন্নতির জন্য। একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মচর্য্য ব্রতই মানব-জীবনের ভিত্তি, গৃহী ও উদাসী সকলেরই দরকার। আমি দেখিতেছি যে কেবল ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই দেশের লোকগুলি নানা আধিব্যাধিতে জর্জরিত হইতেছে। পুরুষের প্রমেহ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, কফীয়রোগ, বাতরোগ, উদরাময় এবং মেয়েদিগের মধ্যেও উৎকট রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, বাধক, সূতিকা, মৃতবৎসা

(টাকরী পাওয়া) ইত্যাদি নানা ব্যাধি প্রায়ই দৃষ্ট হয়। সন্তান সন্ততিগুলিও জীর্ণকায় অল্পায়ু হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। আমার বাঞ্ছা যে, তোমরা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনে দীর্ঘায়ু ও সুস্থকায় হইয়া জগতে বিচরণ কর।" (ব্রহ্মচারী বাবার জীবনী ও পত্রাবলী—৯১পৃঃ)

দাম্পত্যপ্রেম সম্বন্ধে তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছেন "তুমি যে দাম্পত্য প্রেম সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছ, ইহা সাধারণভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। স্ত্রীপুরুষের ভগবদ্‌ভাবে মিলনই দাম্পত্য-প্রেম। ভক্ত ভগবানকে যেমন শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চভাবেই ভাবনা করিয়া থাকেন, তেমনি স্বামীস্ত্রীতেও এই পঞ্চভাবে ভাবনা করা যায়; ইহা শাস্ত্রীয় কথা। তবে স্বামী, স্ত্রীকে কন্যা ভগিনী বা মাতৃজ্ঞান এবং স্ত্রী স্বামীকে পিতাপুত্র বা ভ্রাতা জ্ঞান করিবে, এমন নহে।

"কথা এই যে উভয়ে পরস্পরে একাত্ম-জ্ঞানে ভক্তির চক্ষে শান্ত দাস্যাদি পঞ্চভাবেই ভালবাসিবে। যেমন পিতামাতা শিশু সন্তানকে বাৎসল্যের টানে অবিচারে দাস্য-সখ্যাদির মত আদর করিতেও কুণ্ঠিত হন না, তদ্রূপ স্বামীস্ত্রীতেও উপাস্য জ্ঞানে নিষ্কাম বাৎসল্য ভাবের উদ্দীপনা হওয়া চাই।

"ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষ বাৎসল্যের বিরোধী জানিবা। এইরূপে বহুদিন বীর্য্যধারণের ফলে ভগবদিচ্ছায় সন্তানের প্রয়োজন হইলে সন্তানের জন্য ঋতুরক্ষা করিবে; ইহাই শাস্ত্রীয় কথা।

"পূর্ব্বে কিন্তু ঋষিদের বাক্যদ্বারা ও ঋতুরক্ষা হইত। কালক্রমে বর্ত্তমান সময়ে তেমন স্থিত-প্রজ্ঞ বাক্য-সিদ্ধ মহাপুরুষ গার্হস্থ্যাশ্রমে দেখা যায় না। আর তজ্জন্যই দেশের এই দুরবস্থা।

"প্রকৃতি-পুরুষের মিলনকালে উভয়ে জপধ্যান ও প্রাণায়ামাদি দ্বারা মনস্থির করিয়া মস্তকের চারি পাচ অঙ্গুলী উর্দ্ধে ধারণা করিবে, তখন সর্ব্বাঙ্গে আলিঙ্গনেও মন বিচলিত হইবে না। জানিবা শুদ্ধ

মাধুর্য্যরসাস্বাদনই মিলনের হেতু। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা মিলনের হেতু বা উদ্দেশ্য নহে।"

(ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ১২৫-১২৬ পৃঃ)

ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন—"জগতের কোন মঙ্গলের জন্য যে কয়টি সন্তান হইবে, কোন তারিখে তাহাদের গর্ভাধান হইল তাহা মাতা পিতার বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকা চাই। ঈশ্বর লাভের পূর্ব্বেই যদি গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করা যায়, তবে একটি দুইটি সন্তান হইলে পর পুনরায় বাণপ্রস্থ আশ্রমের ভিতর দিয়া সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরলাভ করিবে। ইহা কিন্তু গৌণবিধি। মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরলাভ না হইলে নরলীলার অধিকারী হওয়া যায় না।"

সমাজ-গঠন প্রতিষ্ঠান

শ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারী জগন্মাতার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী সমাজগঠনের যে-সব সূত্র দিয়াছেন তাহা অনুসরণ করিলে হিন্দুসমাজে আবার নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার হইবে—তাহার মধ্যে আবার সকল ক্ষেত্রে এমন সৃজনী প্রতিভা ও সামর্থ্যের বিকাশ হইবে যে ভারত সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তাহার প্রাচীন গৌরবকেও অতিক্রম করিয়া যাইবে। তাঁহার মূল প্রস্তাবগুলি আমরা এখানে সংক্ষেপে পুনরায় বিবৃত করিতেছি। প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। যে-শাস্ত্র ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ ও ব্যাপক সত্য ধারণা দেয় সেই শাস্ত্র অনুসরণ করিয়াই ব্যক্তির ও সমাজের জীবনকে সংগঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে। বেদ ও উপনিষদ হইতেই আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণা পাই—ঈশ্বর একোমেবাদ্বিতীয়ম্, তিনিই সকল জীব, সকল জগৎ হইয়াছেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সেই সত্য ব্রহ্মের অভিব্যক্তি বলিয়া সত্য। সকল মানুষই মূলতঃ ভগবানের সহিত এক, সকল মানবের মধ্যে আত্মারূপে একই ভগবান বিরাজ করিতেছেন—অজ্ঞানের বশে মানুষ সেই আত্মাকে জানে না। সমাজে শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতির এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যেন প্রত্যেক মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত আত্মার সন্ধান পায়, আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তিতে বাহিরের দেহ, প্রাণ, মনকে পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলে এবং যেখানে সে দিব্যভাবে যাপন করিতে পারিবে সেই জগৎকে যেন তাহার অনুকূল করিয়া দিব্যভাবে গড়িয়া তোলে।

ইহাই সত্যযুগের পরিকল্পনা। সাধুসন্তেরা সকলেই বলিতেছেন- এইবার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। ইহার অর্থ মানুষের জীবন এখন মিথ্যায় পূর্ণ—সত্য পিছনে সরিয়া গিয়াছে, মানুষের জীবনে সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। খুঁটিয়া খুঁটিয়া সেই সব মিথ্যাকে দূর করিতে হইবে—"সনাতন ধর্ম্ম" নাম দিয়া সমাজের পুঞ্জীভূত মিথ্যা ও গ্লানিসকলকে অন্ধ আসক্তির বশে ধরিয়া থাকিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। অজ্ঞান মন বুদ্ধি লইয়া মানুষ সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিতে পারে না—যাঁহারা সাধক যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহাদের নিকট হইতে জানিয়া লইয়া দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত সকল মিথ্যাকে বর্জন করিতে হইবে। গতানুগতিক সমাজ ইহাতে বাধা দিবে, অজ্ঞলোকে নিন্দা করিবে, হয়ত বা জগাই মাধাইএর মত কলসীর কানা ছুঁড়িয়া রক্তাক্ত করিয়া দিবে—কিন্তু তাহাতে থামিলে চলিবে না, নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন—"আমরা লৌকিক ভাল মন্দের ধার ধারি না, ধারিবও না। কারণ লৌকিক হিসাবেও কোন কাজ করিতে চাহিলে একদল ভাল বলিয়া থাকে, আর এক দল মন্দ বলিয়া থাকে, এ-সব দেখিলে চলিবে না।"

সমাজের আমূল সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি প্রধান কথা এখানে উল্লেখ করি। তিনি পুরোহিত প্রথার বিরোধী ছিলেন, যে-সব ব্রাহ্মণ বেতন লইয়া অপরের বাড়ী পূজা করে, শাস্ত্রমতে তাহারা ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেন, সকল জাতি, সকল শ্রেণীর লোক স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে ইষ্টদেবতার পূজা করিবে, ভোগ দিবে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যাপ্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥৯।২৬

"পত্র পুষ্প ফল ও জল যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করে সেই

প্রযত্নশীলের ভক্তিপূর্ব্বক অর্পিত বস্তু আমি সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি।" তাহা হইলে ভগবানকে পূজা করিবার জন্য পুরোহিতকে ডাকিবার কি প্রয়োজন?

বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মত ছিল—ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীরা পূর্ণ-বয়স্কা হইয়া ভগবদ্ নির্দ্দেশ অনুযায়ী পতিপত্নী নিজেরাই বাছিয়া লইবে তাহাতে জাতির বিচার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। বিবাহের মন্ত্র বাংলায় অনূদিত ও উচ্চারিত হইবে। মেয়েদের যতদিন বিবাহ না হইবে ততদিন তাহারা যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিতে পারে এমন কোন বৃত্তি শিখিয়া লইবে। মেয়েদের করিবার মত কত কাজ রহিয়াছে—শিক্ষকতা, ধাত্রীর কাজ, নার্সের কাজ, তাঁত প্রভৃতি নানারূপ কুটিরশিল্প। অশিক্ষিতা ও অপরিচ্ছন্ন ধাত্রীর দ্বারা প্রসব কার্য্য সম্পন্ন করান হয় বলিয়া আমাদের দেশে কত প্রসূতি ও শিশুর যে অপঘাত মৃত্যু হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মেয়েরা যাহাতে সমাজের পক্ষে এইসব অতিপ্রয়োজনীয় কাজ শিখিতে পারে এবং এইসব কাজ করিবার সুযোগ পায় সমাজ হইতে সেই ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

সকলকে বৈদিক আচার গ্রহণ করিতে হইবে। বৈদিক আচারের মূল কথা হইল ঈশ্বরলাভকে জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া সকল জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা। বেদ এখনও আছে, কিন্তু বেদের অর্থ বুঝা এতই কঠিন যে সাধারণ লোকের পক্ষে বেদকে শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভবই বলা যাইতে পারে। কিন্তু গীতায় বেদের সার উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"বেদান্তকৃৎ বেদবিদেবচাহম্"

"আমিই বেদবেত্তা বেদান্তের কর্ত্তা"। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, স্বয়ং ভগবান গীতাতে বেদের চরম ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। অতএব গীতাকে অনুসরণ করিলেই, বেদবেদান্তের অনুসরণ করা

হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা নিয়মিতভাবে গীতা পাঠ করুন, গীতার নির্দ্দেশ অনুযায়ী জীবনকে গঠিত পরিচালিত করুন তাহা হইলেই বৈদিক আচার পালন করা হইবে, সকলেই ক্রমশঃ ভগবানের দিকে, আনন্দময়, শান্তিময়, শক্তিময় প্রেমময়, জ্যোতির্ম্ময় দিব্যজীবনের দিকে অগ্রসর হইবে।

কিন্তু সমাজের রীতিনীতি আচার এইরূপ আমূল পরিবর্ত্তন দুইএকজন লোকের কাজ নহে বহুলোক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইলেই ইহা সফল হইতে পারে। এইজন্য ব্রহ্মচারীবাবা সমিতি গঠন করিয়া কাজ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং নিজে একটি এইরূপ সমিতি গঠন করিয়া আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে যাহা লিখিয়াছিলেন ''ভারত-সমাজ'' পত্রিকা হইতে আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা"

(পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমৎ ভারত ব্রহ্মচারী মহোদয় লিখিত)

''প্রত্যেকের জীবনে অনেক সময়েই এমন সমস্যা উপস্থিত হয় যে, নিজের বিচারশক্তি হার মানিয়া হয়ত নিজেরই বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়া বসেন, নতুবা নিজের স্বার্থসিদ্ধির ভাব আসিয়া অপরের অনিষ্টাচরণ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করেন না। আর এমনও হইতে পারে যে, খুব সরল সাত্ত্বিক ব্যক্তিকেই দশের সহিত ভাব বিনিময়ের অভাবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নানারূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। সাংসারিক ও সামাজিক কাজে এবং দেশের উন্নতি-বিধায়ক যাবতীয় বিষয়েই দশের পরামর্শানুসারে সম্পাদন করিতে পারিলে প্রত্যেকেরই নানারূপ ভ্রান্তি কপটতা চরিত্রের মলিনতা ও দুর্ভাবনা দূরীভূত হইয়া থাকে, এমন কি ঈশ্বরোপাসনায় অগ্রসর হইতে হইলেও সজ্জনের

সঙ্গ-প্রভাবে মনের উদ্যম সাহস ও বল বৃদ্ধি হইয়া অতি সহজেই শান্তির পথ সুগম হইয়া পড়ে।

অতএব আমি সম্প্রতি এই ক্ষেত্রের গার্হস্থ্যাশ্রমত্যাগী সাধু সন্ন্যাসী-গণ, আশ্রম ও দেবালয়ের পরিচালকগণ এবং গার্হস্থ্যাশ্রমী সর্ব্বসাধারণ সকলে মিলিত হইয়া একপ্রাণতার সহিত ভাব-বিনিময় করিবার জন্য কয়েক বৎসরের চেষ্টায় একটি সমিতি গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহার নাম—"সমাজগঠন প্রতিষ্ঠান"।

দেশের সর্ব্বসাধারণের যথাসম্ভব নানাপ্রকার উন্নতির চেষ্টা করা, প্রাচীন উদারচেতা তত্ত্বজ্ঞ মুনিঋষিদের বাক্যানুযায়ী সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং আশ্রম ও দেবালয়গুলি যথাযথভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা এই সমিতির উদ্দেশ্য।

এই সমিতির কার্য্যপ্রণালীতে নানাস্থানের নানা সমাজের ও নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের যোগদান করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বর্ত্তমান সময়ে আমি যে কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি, তাহা এই সমিতির অনুমোদন অনুসারে করিতেছি; এমন কি কোন বিষয়ে ভগবদাদেশ হইলে, তাহাও এই সমিতিকে জানাইয়া থাকি।

এইভাবে এই ক্ষেত্রের সাধুসন্ন্যাসীগণ আশ্রম ও দেবালয়ের পরি-চালকগণ এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া সমিতির পরামর্শানুযায়ী যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন, ইহাই পরস্পরের একতা সম্পাদনের ও শান্তি-স্থাপনের একমাত্র উপায়।

কেহ এই সমিতির ইচ্ছার বহির্ভূত কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। যদি কেহ এই সমিতির প্রচারিত বিষয়সমূহের অন্যথাচরণ করেন তবে তাহাকে এই সমিতির বহির্ভূত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।"

(ভারত সমাজ পত্রিকা—১ম সংখ্যা কার্ত্তিক, ১৩৩৬ সন)

সমাজ-গঠন প্রতিষ্ঠান

পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন ব্রহ্মচারীবাবা সমিতির মধ্যে সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের লোক লইতে বলিয়াছেন। বস্তুত তাঁহার যে ধর্ম্ম-মত ও সামাজিক পরিকল্পনা তাহাতে মুসলমানেরাও অবাধে এইরূপ সমিতিতে যোগদান করিতে পারেন। তাঁহার অনেক মুসলমান শিষ্য ভক্ত ছিল। ভগবান এক বই আর দুই নহেন। তাঁহার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন করিতে হইবে ইহা যেমন হিন্দুর ধর্ম্ম, তেমনই মুসলমানের ধর্ম্ম। অতএব উভয় সমাজেরই কল্যাণ ও উন্নতির জন্য একত্র সম্মিলিত ভাবে কাজ করিতে বাধা কি ?

শুধু আদর্শ বুঝিলে বা গ্রহণ করিলেই চলিবে না, তদনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। যাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন তাঁহারা আর কাহা-রও মুখ না চাহিয়া, কাহাকেও ভয় না করিয়া ব্রহ্মচারীবাবার পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েকজনে মিলিত হইয়া সমাজ-গঠনের জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করুন। সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হউক। তবে শুধু কাগজে কলমে সমিতি হইলেই চলিবে না—বাস্ত-বিক কাজের ভিতর দিয়াই সমিতির শক্তি ও কার্য্যকারিতা বর্দ্ধিত হয়। কোন স্থানে সমিতি গঠিত হইলে তাহারা সর্ব্বপ্রথমেই অস্পৃশ্যতা নিবা-রণের কাজ আরম্ভ করিবেন। লোকের দৃঢ়মূল সংস্কারের বাধা দূর করিবার জন্য শুদ্ধিযজ্ঞ করা প্রয়োজন। ব্রহ্মচারীবাবা সকলকে উপনয়ন ও দীক্ষা দিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতেন। কিন্তু সকলেই মহাবাক্যে দীক্ষা লইবার অধিকারী নহে। যে-সব মানব সমাজের নিম্নতম স্তরে পড়িয়া আছে, যাহাদের মধ্যে মনবুদ্ধির এখনও যথোচিত বিকাশ হয় হয় নাই—তাহাদের পক্ষে শ্রীচৈতন্যের ব্যবস্থাই প্রকৃষ্ট। গলায় উপবীত ধারণ যেমন দ্বিজ আচরণের চিহ্ন, গলায় তুলসী মালা ধারণকে বৈষ্ণবেরা তেমনই ভক্তের চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করেন। যে-কোন জাতির

লোকই হউক না কেন তাহার গলায় তুলসীর মালা থাকিলে লোকে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া মনে করে এবং তাহার হস্তে জল খাইতে দ্বিধা করে না। অতএব গ্রামে গ্রামে হরিনামসংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ করিয়া হাড়ি, বাগ্দী, ডোম—সকলকেই হরিনাম জপ করিতে উপদেশ দেওয়া হউক, এবং সকলকেই তুলসীর মালা দিয়া তাহাদের হস্তে জল পান করা হউক। এইভাবে হরিনামে দীক্ষা দিয়া যাহাদের গলায় তুলসীর মালা দেওয়া হইবে তাহারা অতঃপর আর হাড়ি, ডোম বাগ্দী প্রভৃতি পরিচয় না দিয়া নিজদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবে। এইরূপ স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজ হইতে অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপ দূর করিতে পারিলে সমগ্র সমাজ-দেহে যে নবজাগরণ আসিবে, আধ্যাত্মিকতার আবেশ আসিবে তাহাতে অন্যান্য সংস্কার কার্য্য করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।

সেই সঙ্গেই দেশের সর্ব্বত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যাহারা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অথবা গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ভগবদ্-উপাসনা করিতে চাহিবে তাহাদের জন্য এই সব আশ্রমে সাধন ভজনের সকল সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। ব্রহ্মচারী-বাবা নিজে এইরূপ কয়েকটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু ঘরবাড়ী সাধক সাধিকা হইলেই আশ্রম হয় না কোন সিদ্ধ মহা-পুরুষকে অবলম্বন করিয়াই আশ্রম গড়িয়া উঠিতে পারে। দেশে এইরূপ আশ্রমের সংখ্যা যত বর্দ্ধিত হইবে, তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া সমাজে অধ্যাত্ম প্রভাব ততই বর্দ্ধিত হইবে, ক্রমশঃ সমাজ-জীবনের রূপান্তর সাধিত হইবে। বলা বাহুল্য মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের আশ্রম হইলে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না—যাহারা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চান, সত্যযুগ আনয়ন করিতে চান তাঁহাদের দ্বারাই এইরূপ আশ্রম গঠিত ও পরিচালিত হইবে। শ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারীর ইহাই

ছিল সাধনা ও লক্ষ্য। তিনি যখন পূর্ব্ববঙ্গে এই আদর্শ প্রচার করিতে ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই শ্রীঅরবিন্দ "ধর্ম্ম" পত্রিকায় মায়াবাদ সম্বন্ধে যাহা লেখেন আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"যদি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজনসম্মত আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত আর্য্যজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত করিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্র চিরকাল একপক্ষ প্রকাশক ও অসম্পূর্ণ। সমস্ত জগৎ এক সঙ্কীর্ণ মতের অনুযায়ী তর্ক দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে গেলে সত্যের একদিক বিশদরূপে ব্যাখাত হয় বটে, কিন্তু অপরদিকের অপলাপ হয়। অদ্বৈত-বাদীদিগের মায়াবাদ এইরূপ অপলাপের দৃষ্টান্ত। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ইহাই মায়াবাদের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র যে জাতির চিন্তাপ্রণালীর মূলমন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই জাতির মধ্যে জ্ঞানলিপ্সা বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসপ্রিয়তা বর্দ্ধিত হয়, রজঃশক্তি তিরোহিত হইয়া সত্ত্ব ও তমঃ প্রাবল্যপ্রাপ্ত হয় এবং একদিকে জ্ঞানপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী, সংসারে জাতবিতৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত ও শান্তিপ্রার্থী বৈরাগীর সংখ্যাবৃদ্ধি, অপরদিকে তামসিক অজ্ঞ অপ্রবৃত্তি-মুগ্ধ অকর্ম্মণ্য সাধারণ প্রজার দুর্দ্দশাই সংঘটিত হয়। ভারতে মায়াবাদের প্রচারে তাহাই ঘটিয়াছে। জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তবে জ্ঞানতৃষ্ণা ভিন্ন সর্ব্বচেষ্টা নিরথক ও অনিষ্টকর বলিতে হয়। কিন্তু মানুষের জীবনে জ্ঞান তৃষ্ণা ভিন্ন অনেক প্রবল ও উপযোগী বৃত্তি ক্রীড়া করিতেছে, সেই সকলের উপেক্ষায় কোন জাতি টিকিতে পারে না। এই অনর্থের ভয়ে শঙ্করাচার্য্য পারমার্থিক ও ব্যবহারিক বলিয়া জ্ঞানের দুইটি অঙ্গ দেখাইয়া অধিকার ভেদে জ্ঞান ও কর্ম্মের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তিনি সেই যুগের ক্রিয়াসঙ্কুল কর্ম্মমার্গের তীব্র প্রতিবাদ করায় বিপরীত ফল ফলিয়াছে। শঙ্করের প্রভাবে সেই কর্ম্মমার্গ লুপ্ত হইল, বৈদিক ক্রিয়া সকল তিরোহিত হইল, কিন্তু সাধারণ লোকের মনে জগৎ মায়াসৃষ্ট, কর্ম্ম অজ্ঞান-প্রসূত ও মুক্তির বিরোধী, অদৃষ্টই সুখদুঃখের কারণ

ইত্যাদি তমঃ-প্রবর্ত্তক মত এমন দৃঢ়রূপে বসিয়া গেল যে, রজঃশক্তির পুনঃপ্রকাশ অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর্য্যজাতির রক্ষার্থ ভগবান পুরাণ ও তন্ত্রপ্রচারে মায়াবাদের প্রতিরোধ করিলেন। পুরাণে উপনিষৎ-প্রসূত আর্য্যধর্ম্মের নানাদিক কতকটা রক্ষিত হইল, তন্ত্রশক্তি-উপাসনায় মুক্তি ও ভুক্তিরূপ দ্বিবিধ-ফল-প্রাপ্ত্যর্থ লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইলেন। প্রায়ই যাঁহারা জাতি রক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রতাপসিংহ, শিবাজি, প্রতাপাদিত্য, চাঁদরায় প্রভৃতি প্রায় সকলেই শক্তিউপাসক বা তান্ত্রিক যোগীর শিষ্য ছিলেন। তমঃ-প্রসূত অনর্থের নিষেধ করিবার জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মসন্ন্যাসের বিরোধী উপদেশ দিয়াছেন।"

(ধর্ম্ম ও জাতীয়তা—শ্রীঅরবিন্দ—২১-২৩ পৃষ্ঠা)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সর্ব্বজনসম্মত আর্য্যধর্ম্মের প্রচার করিতে হইলে গীতাকেই মূল শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু দেশে গীতার যে-সব ভাষ্য ও টীকা প্রচলিত আছে সে-সবই মূলতঃ শঙ্করের মায়াবাদমূলক ভাষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে-সবকে বর্জন করিতে হইবে, শ্রীঅরবিন্দ অপূর্ব্ব সাধনালব্ধ দিব্যদৃষ্টি লইয়া গীতার যে স্বর্গীয় ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

ধর্ম্ম ও জাতীয়তা

রাজনীতি শ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারীর কর্ম্মক্ষেত্র ছিল না, তিনি ছিলেন নিগূঢ় অধ্যাত্ম ক্ষেত্রের কর্ম্মী—সেই ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়াই তিনি সত্যযুগ আবির্ভাবের পরিস্থিতি স্জনে কঠোর তপস্যা করিয়া দেহপাত করিয়া গিয়াছেন। তথাপি তিনি জানিতেন যে, ভারতের অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়াই জগতে সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে এবং তাহার জন্য ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন। তিনি জানিতেন জগন্মাতা নিজ দিব্যশক্তির প্রয়োগে যথাসময়ে ভারতকে স্বাধীনতা আনিয়া দিবেন। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে কাহার দ্বারা কিভাবে এই কার্য্য হইবে মা তাঁহাকে জানান নাই, কারণ এইটি তাঁহার কর্ম্মের অন্তর্গত ছিল না। যখন ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইল তখন তিনি মনে করিয়াছিলেন—এই আন্দোলনের ভিতর দিয়াই মা ভারতকে স্বাধীন করিয়া দিবেন। ঐ সময়ে ১৩২৮ সনের ১৫ই পৌষ তারিখে তিনি ময়মনসিংহের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত মহিম চন্দ্র রায়কে লিখিয়াছিলেন—

আমার সিদ্ধিলাভের পর—মা আমাকে কৃপা করিয়াছেন পরই বলিয়াছেন যে "আমি ইউরোপের শক্তি হ্রাস করিবার জন্য মহাসমরের সংঘটন করিব; পরে ভারত স্বাধীন করিয়া পৃথিবীতে সত্যধর্ম্ম স্থাপন করিয়া ভারতে দেবতা মানবে অপূর্ব্ব লীলা করিব।" তদবধি আমি এই অপেক্ষায় বসিয়া আছি এবং দেখিয়া আসিতেছি। আর সব দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়া শুনিয়াও স্থির থাকিতেছি। কি করি এসব আমার কাজ নয়। আমি সন্ন্যাসী, আমি ছোট হইতেই এসব

সাংসারিক বা রাজনৈতিক কোন কাজই করি নাই। তাই মা আমাকে এ সব বড় বড় কাজে অবোধ সন্তান বিধায় নেন না। এসব আপনাদের কাজ আপনারাই করিবেন। আমি জগতে সুখ সচ্ছন্দ ও আনন্দ দেখিয়া যে কবে এই আনন্দ সাগরে ভাসিব তাই আমার উদ্দীপন। আমার দ্বারা কোন কাজ হবে যে এমন বুঝিতেছি না। এমন কি এ জন্য মার নিকট প্রার্থনা করিবারও নাই। আমি জানি বর্ত্তমানে মা সমুদয় দেবদেবী সমভিব্যাহারে বিষ্ণুশক্তি সহায় করিয়া ভারতোদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন। তিনিই করিতেছেন ও করিবেন। মহাত্মা গান্ধীই বিষ্ণুস্বরূপ; তাঁহাতেই বিষ্ণুর আবির্ভাব। তাই লিখি আর সময় নাই। তাড়াতাড়ি কাজে মন প্রাণে হাত দেন এই আমার মনের কথা। লিখিতে লিখিতে মনের আবেগে কত কথাই লিখিয়া ফেলিলাম। আমি কিন্তু মূর্খ, এমন কি ছোট বেলায় কোন স্কুলেও লেখা পড়া করিয়া কোনও জ্ঞানলাভ করিতে পারি নাই।”

(ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ৮৬-৮৭ পৃঃ)

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন প্রথমে দেশে যে বিপুল উৎসাহ আনয়ন করিয়াছিল এবং মহাত্মাগান্ধী যে-ভাবে সত্য ও অহিংসার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে শুধু ব্রহ্মচারীবাবা নহেন, ভারতের সকল সাধু সন্তেরই ধারণা হইয়াছিল যে, ভারত উদ্ধারের জন্য ঐশী শক্তির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং মহাত্মা গান্ধী হইয়াছেন তাঁহার যন্ত্র। কিন্তু সে আন্দোলন সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হইল—যে মহাশক্তি আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা উপযুক্ত যন্ত্র না পাইয়া অন্তর্হিতা হইল, ভারতের স্বাধীনতা আবার বহু বৎসরের জন্য পিছাইয়া গেল। এই আন্দোলন এই ভাবে ব্যর্থ হওয়ায় ব্রহ্মচারীবাবা কিরূপ ব্যথা পাইয়াছিলেন, তাঁহার ঐ সময়ে লিখিত একখানি পত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায়। অসহযোগ আন্দোলনে যে-সব উকীল যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা আবার নিজ ব্যবসায়

ফিরিয়া যাইতেছেন দেখিয়া ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসে তিনি নেত্রকোনার বিশিষ্ট উকিল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কুমার দে মহাশয়কে এই পত্র লিখিয়াছিলেন—

"শ্রীমান সুশীলের পত্রে জানিতে পারিলাম আপনাদের কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত রমণামোহন মজুমদার, তিনি নাকি উক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আবার তাঁহার পূর্ব্ব কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আজকাল এমন বিষম সমস্যার সময় ইহার মধ্যে যদি তাঁহারা বা অন্যকেহ পশ্চাৎপদ হন, তবে বড়ই ক্ষতি। কারণ যাহারা উপরস্থ কর্ম্মচারী তাহাদিগকে দেখিয়া শত শত লোক উক্ত কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, ইহাদিগকে এমন বিপদ সাগরে ফেলিয়া কেবল নিজেদের অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা। নচেৎ কোন লাভের আশায় যেমন কাজ করা হইয়াছিল, এখন লাভ নাই বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া। আমি কিন্তু এসব লিখিতে পারি না কারণ আমি সাধারণ লোক। আমার বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, অর্থবিত্তও কিছুই নাই, কিন্তু মনে কষ্ট হইলে বিদ্যা বুদ্ধির অপেক্ষা করে না, মনে যাহা আসে বলিয়া ফেলে। আমার কথায় যেন কেহ বিরক্তি প্রকাশ না করেন এই জন্য আমার শত অনুরোধ। তবে কথাটা এই যে, যে যাহা করুন না কেন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে খুব ভাবিয়া করিতে হয়। আমি কিন্তু উপদেশ দিতেছি না, এবং এমন কেহ বুঝিবেন না, তাহা হইলে আমি বড় দুঃখিত হইব। আমি কেবল আত্মীয় জ্ঞানে মনের কথা জানাইতেছি। আমি সন্ন্যাসী, আমার ভোগবিলাস সুখস্বচ্ছন্দ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ এই স্বরাজের জন্য বা স্বাধীনতার জন্য কোন ঠেকা নাই কারণ আমি সর্ব্বদাই স্বাধীন—কেননা আমি কাহারও অধিকারে থাকি না। যেমন এ জগতে ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছি তেমন ইচ্ছা করিয়া যাইতে পারিব। দেহের সুখদুঃখে আমাকে আটকাইতে পারিবে না। তবে যে এমন

ভাবে চলিতেছি ইহার কারণ কেবল পল্লীগ্রামে থাকিয়া সকলের সুখ-দুঃখে তেমন না হইয়া পারা যায় না। গত পৌষের পূর্ব্ব পৌষে দেখিলাম আপনাদের নেত্রকোনার কতকগুলি ছেলে মহাত্মার আদেশে বা উপদেশে বা বস্ত্রসমস্যা দূরীকরণার্থে খুব উৎসাহিত হইয়াছে এবং কেহ কেহ আমার নিকট আসিয়াছিল। তাহাদের কথায় আমি ইহা সঙ্গত মনে করিয়া হস্তক্ষেপ করিলাম। স্বরাজ-টরাজ বুঝিতে ইচ্ছাও করিলাম না। এখনও ইহা আমার মনে নাই। ক্রমে ক্রমে দেখিয়া আসিতেছি শ্রীযুক্ত রমেশবাবু উকিল (তিনিও) দেশের উপকারার্থ গ্রামে গ্রামে যাইয়া লোককে উপদেশ দিয়া উৎসাহিত করিতেছেন এবং এইভাবে অনেক উকিল বাবু বেগবতী নদীসম কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইয়া দেশকে মাতাইয়া ফেলিয়াছেন। লোকগুলি তাঁহাদের কথায় এমন রাজদ্রোহ কাজে হাত দিয়া বসিয়াছে—এই দেখিলাম একদিন। পরে তাহারা কেহ কেহ আবার ক্রমে ক্রমে যাহার তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কাজে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের লোকদিগকে হাসিকান্নায় ভাসাইতেছেন, বহুলোক বিপদগ্রস্ত হইয়াছে,কেহ বা হাসিতেছে। আর বলিয়া আসিতেছে তিনিরাই যখন এমন ভাবে উৎসাহিত করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ হইলেন তবে আর কিসে কি হবে। আবার দেখিয়া শুনিয়া আসিতেছি সকলেই নাকি সভাসমিতি করিয়া একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া এই কাজ করিয়া আসিতেছেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমি সুহৃদ জানিয়া আর কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব? কে আমার কথার সদুত্তর দিয়া বাধিত করিবেন? আর কেই বা কথার মর্ম্ম বুঝিয়া আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমাকে আশ্বস্ত করিবেন? যদি কেহ থাকেন তবে তাঁহার নিকট চিরঋণী হইব। আমি দেখিতেছি এইবার দেশের দুর্ঘটনা এইভাবে শিথিল হইয়া থাকিলে কাহারও অব্যাহতি নাই। কারণ বাঘ যদি ক্রোধান্বিত হয় তবে হত্যাকারীকেও মারে আর তামেশগিরকেও মারে।”

"তাই আবার লিখি, পূর্ব্বেই বুঝা উচিত ছিল যে, এমন লণ্ডভণ্ড তপস্বীর কথায় (মহাত্মার অর্থাৎ যাহার কাণ্ডজ্ঞান নাই, কোটি কোটি টাকার এমন বিপুল সম্পত্তির দিকে যাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই), এমন লোককে যখন আদর্শ করিয়া কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে, তখনই বুঝিয়া শুনিয়া কাজ করা উচিত ছিল। তাই লিখি, যাহারা ধরিয়াছেন আর ছাড়িবেন না, এবং আরও সাথী করিয়া তাড়াতাড়ি অগ্রসর হউন, এই আমার শেষ কথা।"

(ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ৯৬-৯৯ পৃঃ)

শ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারী শীঘ্রই ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিল তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। এই ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য তিনি 'সত্য যুগাঙ্কুর' পুস্তিকায় লিখিয়াছিলেন—"কংগ্রেসের সমর্থনে শ্রীমৎ মহাত্মা গান্ধী সনাতন ধর্ম্মমূলক যে কয়টি নীতি প্রচার করিয়াছেন, তৎফলে দেশ অশেষ কল্যাণের পথেই চলিয়াছে; কিন্তু কংগ্রেসের প্রচারিত উক্ত নীতিগুলি ধর্ম্মনীতি হইতে পৃথক করিয়া রাজনৈতিকভাবে ধরিয়া লওয়াতে, ভাব-বৈষম্য আসিয়া পড়িতেছে। যাঁহারা সত্যাগ্রহ করিতেছেন তাঁহারাও অনেকেই মিথ্যাপ্রবঞ্চনা ত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না; আবার কেহ কেহ বলিতেছেন ইহা কংগ্রেসের বাণী, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহে—এক কথায় এক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত—কংগ্রেস রাজনৈতিক ক্ষেত্র, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় উপদেশ না থাকায় ইহা আমাদের জন্য নহে; আর এক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত—কংগ্রেস ঈশ্বর সম্বন্ধে উপদেশ দিলে লোকশিক্ষার বা সমাজগঠনের অসুবিধা ঘটিবে; কারণ ধার্ম্মিক ঈশ্বরোপাসকগণ প্রায়ই অলস ও দুর্ব্বলমস্তিষ্ক হইয়া থাকেন। ইহাতে দেশের অসুবিধাই হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, উভয় দ্বন্দ্ব মিটিয়া

ধর্ম্মনীতির প্রতিষ্ঠায় চিত্তশুদ্ধি হইলে মিথ্যাপ্রবঞ্চনা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি অপসারিত হইয়া অহিংসা ও একতা আসিয়া আপনা হইতেই বর্ত্তমান যুগ সত্যযুগে পরিণত হইবে ; কারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে মানবজাতি সকলেরই একমত। ঋষিগণ বলিয়াছেন—

ধৃতিঃক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধং দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ।।

উক্ত লক্ষণগুলিই মানবীয় ধর্ম্ম। ইহাতে হিন্দুমুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক ভেদ থাকিতে পারে না ; কারণ এই লক্ষণগুলি অল্প বিস্তরভাবে সকলেই পালন করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও সকলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কংগ্রেসের প্রচারিত সত্যাগ্রহ, অহিংসা, ব্যয়সঙ্কোচ, প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার, চরকা প্রচলন ইত্যাদি নীতিগুলি ধর্ম্মমূলক, অতএব সমাজের গ্রহণীয়। সত্যাগ্রহ বলিতে কেবল মিথ্যাবর্জন এমন নহে, বাক্যের অপব্যবহারও না করা ; ব্যয়সঙ্কোচ করা শুধু মিতব্যয়িতা নহে, নানাপ্রকার বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া সংযমী হইয়া জীবন গঠন করা ; শস্য বিদেশে রপ্তানী করিতে না দেওয়া নয়, প্রতি গ্রামের প্রয়োজনমত শস্য মজুত রাখা ; শাসন করা নহে, ভালবাসা দ্বারা নীতিপরায়ণ করা ; বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব না এইভাব নহে (ইহাতে হিংসার লেশমাত্রও আসিতে পারে) নিজেদের উপার্জিত দ্রব্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করা অর্থাৎ কৃষিশিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি স্বাধীন ব্যবসা দ্বারা অন্ন বস্ত্রাদি যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা।

সত্যবাক্য প্রয়োগই সত্যপ্রতিষ্ঠার দ্বারস্বরূপ। হিন্দুগণ বাক্যকেই "শব্দব্রহ্ম" এবং মুসলমানগণ "জবানই জব্রিল" এইরূপ বলিয়া থাকেন ; কিন্তু আমাদের বাক্যের অপব্যবহারে ব্রহ্ম ভাবের অর্থাৎ সদ্ভাবের

অভাব হইতেছে। একমাত্র সত্য বাক্যের অভাবেই একে অন্যে এমনভাবে বিশ্বাসহারা হইয়াছে যে, এক পয়সার জিনিষও একদরে ক্রয়বিক্রয় চলে না ; এইজন্য হাটে বাজারে একান্ত গণ্ডগোল। ছেলে মেয়েদিগকে ভয় দেখাইতে বা ঘুম ভাঙ্গাইতে অথবা খেয়ালবশতঃ এমন কি আমোদ প্রমোদেও অযথা বাক্যের অপব্যবহার হইতেছে। ইহাই চিত্তচাঞ্চল্যের বিশেষ কারণ।

সত্য প্রতিষ্ঠার প্রণালীগুলি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোচিত শিক্ষার অন্তর্গত। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হইলেই মানবগণ আত্মনির্ভরশীল আত্মবিশ্বাসী হইয়া ক্ষাত্রশক্তির বিকাশে ব্রহ্মত্বলাভ করিয়া থাকেন ; অতএব দেশনায়কগণ প্রতি পল্লীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং প্রতি সমাজের নেতৃবর্গ, সর্ব্ব-সাধারণকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোচিত শিক্ষাদানে সমাজ গঠিত করুন। তবেই সত্যের প্রভাবে দেশের নানাপ্রকার অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া অচিরেই শান্তি স্থাপিত হইবে।"

(শ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারী—সত্যযুগাঙ্কুর পুস্তিকা ৫।৬।৭ পৃষ্ঠা)

ভারতের জনসাধারণ দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। শীঘ্রই প্রচুর ধন সম্পদ সৃষ্টি করিতে না পারিলে ভারতীয় জাতি বর্ত্তমান জীবন সংগ্রামে কিছুতেই টিকিতে পারিবে না এবং ইহার জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কলকব্জার সাহায্য গ্রহণ করার একান্ত প্রয়োজন। গান্ধীজীর চরকার বাণী আত্মঘাতী বাণী। তিনি জনসাধারণকে দারিদ্র্যব্রতে দীক্ষা দিলে তাহারা লক্ষ্মীছাড়া হইয়া মৃত্যুকেই ডাকিয়া আনিবে। মহালক্ষ্মীর কৃপালাভ করাই এখন ভারতের বাঁচিবার একমাত্র পন্থা। শ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারী এই প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাবের জন্য বিশেষভাবে সাধনা করিয়াছিলেন—এবং এইটিই হইয়াছিল তাঁহার জীবনের শেষ মহৎ কার্য্য। তিনি ১৩৩১ সালে লিখিত একখানি পত্রে বলিয়াছিলেন—

"আমি মায়ের আদেশে শ্রীশ্রী ৺বৃন্দাবনধাম বেলবনে আছি। এখানে শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী মায়ের বাড়ী তাঁহারই কৃপা ভিখারী হইয়া চরণতলে পড়িয়া আছি। যতদিন মা কৃপাদান না করেন ততদিন এখানে থাকিতে হইবে। রাজলক্ষ্মী জগজ্জননীর করুণা ভিন্ন "জগতের" মঙ্গল-সাধন হইতে পারেনা, তাই তাঁহার আদেশ অনুসারে বৃহৎ কার্য্যে ব্রতী হইলাম।"

(ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ১৬৭ পৃঃ)

এই মহান সাধনায় অপূর্ব্ব ঐকান্তিকতা দ্বারা তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা মহালক্ষ্মী ব্রহ্মচারীবাবাকে বলিয়াছিলেন "ভারতের তথা সকল জগতের মঙ্গলার্থ আমি প্রকাশিত হইব।" কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল কংগ্রেস যে ভাবে কার্য্য চালাই-তেছে তাহাতে পল্লীগঠনও হইবে না, স্বরাজও হইবে না। তখন তিনি "কংগ্রেস ও পল্লীসংস্কারে আমাদের কথা" নামে একখানি পুস্তিকা ১৩৩১ সনের চৈত্র মাসে প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তিকায় প্রকাশক যোগানন্দ "নিবেদনে" লিখিয়াছিলেন—

"এতদঞ্চলে বহুলোক সূতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন কার্য্য শিক্ষা করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুলা সংগ্রহ, সূতা ও কাপড় বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত না হওয়ায় সে সব ত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের আশ্রম হইতে কংগ্রেসের সাহায্যার্থ তাঁত চরকা ও খদ্দর প্রচার কার্য্যে, দুই বৎসরের অধিক সময়ে পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ হইতে ভিক্ষালব্ধ ৮।৯ হাজার টাকা ব্যয়ে খোরাক দিয়া ন্যূনাধিক ৪০০শত ছাত্রকে বিনা বেতনে বয়ন শিক্ষাদান, ন্যূনাধিক ৪০টি তাঁত এবং প্রায় এক হাজার চরকা বিনা মূল্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয় চরকা প্রচার কার্য্যে নেত্রকোনায় আসিলে, তাঁহার নিকট সভাস্থলে উক্ত বিবরণী পাঠ করা হয় তখন

এতদঞ্চলে তাঁত-চরকার প্রচার হ্রাস পাইলেও শতাধিক তাঁত চলিতে-ছিল। উক্ত সভায় তাঁত-চরকা প্রচারের বাধা ও তৎপ্রতিকারের উপায় আলোচিত হইলেও, পল্লীবাসীগণ কংগ্রেস হইতে কোনরূপ সহানুভূতি না পাওয়ায় ক্রমে তাঁত-চরকা অদৃশ্যপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে।"

কুটির-শিল্প হিসাবে তাঁতের উপযোগিতা আছে কিন্তু চরকার কোন উপযোগিতা নাই বলিলেই হয়। যাহাদের চাষে তুলা হয়, তুলা কিনিতে হয় না, তাহারা যদি অবসর মত সূতা কাটিয়া গায়ের কাপড়, বিছানার চাদর ইত্যাদির জন্য মোটা কাপড় তৈয়ারী করায়— তাহা হইলে কিছু সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু সকলকেই সূতা কাটিতে হইবে এবং খদ্দর পরিতে হইবে ইহা অপেক্ষা অসম্ভব কথা আর কিছুই হইতে পারে না। কংগ্রেসের পল্লীসংগঠন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার দ্বিতীয় কারণ রাজনীতির সহিত উহাকে জড়াইয়া দেওয়া। কংগ্রেসের গঠন কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে জনসাধারণকে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত করা। এমনভাবে গঠন কার্য্য হইতেই পারে না। পল্লীসংগঠন কার্য্য করিতে হইবে পল্লীসংগঠনেরই জন্য, আর কিছুর জন্য নহে, যাহাতে পল্লীবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল হয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়—কেবল মাত্র সেই উদ্দেশ্য লইয়াই পল্লীবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। পল্লী-বাসীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে কৃষির উন্নতির দিকেই জোর দিতে হইবে, সেই সঙ্গে যে সব কুটির-শিল্প বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে চলিতে পারে সেইগুলি স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে চাই গ্রামের লোককে মিলিতভাবে সকলের উন্নতি করিবার জন্য প্রবুদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ করা। প্রাচীন ভারতে গ্রামবাসীর এই অভ্যাস ছিল, কিন্তু এখন তাহা লুপ্ত হইয়াছে। গ্রামের লোক সকলেই আপন আপন

ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত—ফলে দলাদলি ও মামলা মোকদ্দমা দ্বারা লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে। কংগ্রেসের শালিসীপ্রথা কার্য্যকরী হয় নাই। লোকের মতিগতির আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। আজকাল যুবকেরা অনেকেই পল্লীগ্রামে বোলশেভিজম্ কম্যুনিজম্ প্রচার করিতেছেন—তাহাতে দ্বন্দ্ব বাড়িবে বৈ কমিবে না। ভারতবাসীর ধাত এই, একমাত্র ধর্ম্ম আন্দোলনের দ্বারাই তাহাদের মধ্যে নূতন জীবন, নতন শক্তির সঞ্চার করা যায়—শ্রেণীবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, জাগাইয়া সাময়িকভাবে তাহাদিগকে উত্তেজিত করা যায় বটে কিন্তু তাহাতে তাহাদের নিজেদেরই সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইবে। এমনই গ্রামে দ্বন্দ্বের অন্ত নাই। কংগ্রেসের তথাকথিত পল্লী-সংগঠন সত্ত্বেও প্রতি দুইশত জন ভারতবাসীর মধ্যে একজন মামলা-বাজ—পৃথিবীতে ভারতের মত এত মামলা মোকদ্দমা আর কোথাও হয় না, ইহা জীবনের লক্ষণ নহে মৃত্যুর লক্ষণ। সাম্প্রদায়িকতা হীন, শ্রেণীবিদ্বেষহীন, জাতিবিদ্বেষহীন উদার ধর্ম্ম আন্দোলনের দ্বারাই ইহার প্রতিকার হইতে পারে। এইভাবে জাতীয় আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করিবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৯ সালে বাংলা "ধর্ম্ম" ইংরাজী "Karmayogin" নামে দুইটি পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি একান্তভাবে যোগসাধনা করিবার প্রত্যাদেশ পাইয়া পণ্ডিচেরী চলিয়া যাওয়ায় সে কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। ১৯২০-২১ সালে মহাত্মা গান্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করায় আশা হইয়াছিল বুঝি আবার শ্রীঅরবিন্দের সেই মহান আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু নেতাদের নিজেদের অধ্যাত্ম সাধনা না থাকায় কংগ্রেস সে পথে চলিতে পারে নাই— কংগ্রেস-কর্ম্মীদের মধ্যে যেরূপ ধর্ম্মবিদ্বেষ ও নাস্তিকতা দেখা যায় ইহা ভারতের পক্ষে ভয়াবহ। ব্রহ্মচারীবাবা ইহা লক্ষ্য করিয়াই কংগ্রেস আন্দোলনকে প্রকৃত ধর্ম্ম-



শ্রীঅরবিন্দ (স্বদেশীযুগে) পৃঃ ১০৫

আন্দোলনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। উল্লিখিত পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন—

"দেশের উন্নতিকল্পে কংগ্রেসের ভাব পল্লীতে প্রচার করিতে হইলে অগ্রে পল্লীর অবস্থা কংগ্রেসের বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে দেশ কদাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ায় অন্নাভাব, অর্থাভাব, ঋণ, রোগ, কলহ, মামলা, মোকদ্দমা, চুরি ডাকাতি, মিথ্যাভাষণ, পরস্পর অবিশ্বাস, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদিতে এমন বিপন্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে যে কংগ্রেসের নীতিগুলি গ্রহণ করিতে অসমর্থ। অতএব পূর্ব্বোক্ত অভাব ও অভিযোগসমূহ দূরীকরণার্থ বিশেষ চিন্তা বা মনোযোগের সহিত চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁত-চরকা ও খদ্দর প্রচার, সত্যাগ্রহ ও অস্পৃশ্যদোষ বর্জন ইত্যাদি কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত নীতিগুলি এতদঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারে বাধা ঘটিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশবাসী ঐ সমস্ত নীতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আংশিকভাবে পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে স্থায়ী উপকার পাইলে নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইত। স্থৈর্য্য ধৈর্য্য ও অর্থাভাবজনিত দুর্ব্বলতাই ইহার একমাত্র কারণ।

ধর্ম্মনীতির ভিতর দিয়া কংগ্রেসের ভাব প্রচারিত হইলে দেশ ও সমাজ সদাচারী, সদ্‌ভাবাপন্ন ও কর্ম্মঠ হইবে এবং যাবতীয় অভাব অভিযোগ যথাসম্ভব নষ্ট না হইলেও নীতিসমূহ ধারণা ও প্রতিপালনের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।"

১৯০৯ সালে শ্রীঅরবিন্দ এক বৎসর কারাবাসের পর তাঁহার বিখ্যাত উত্তরপাড়া অভিভাষণে এই আদর্শই প্রচার করিয়াছিলেন। জেলের মধ্যেই তিনি যোগ সাধনার ভিতর দিয়া ভগবদ্‌বাণী শুনিয়াছিলেন—

"......It is Shakti that has gone forth and entered into the people. Since long ago I have

been preparing this uprising and now the time has come and it is I who will lead it to its fulfilment."

This then is what I have to say to you. The name of your society is "Society for the Protection of Religion". Well, the protection of the religion, the protection and upraising before the world of the Hindu religion, that is the work before us. But what is the Hindu religion? What is this religion which we call Sanatana, eternal? It is the Hindu religion only because the Hindu nation has kept it, because in this Peninsula it grew up in the seclusion of the sea and the Himalayas, because in this sacred and ancient land it was given as a charge to the Aryan race to preserve through the ages. But it is not circumscribed by the confines of a single country, it does not belong peculiarly and for ever to a bounded part of the world. That which we call the Hindu religion is really the eternal religion, because it is the universal religion which embraces all others. If a religion is not universal, it cannot be eternal. A narrow religion, a sectarian religion, an exclusive religion can live only for a limited time and a limited purpose. This is the

one religion that can triumph over materialism by including and anticipating the discoveries of science and the speculations of philosophy. It is the one religion which impresses on mankind the closeness of God to us and embraces in its compass all the possible means by which man can approach God. It is the one religion which insists every moment on the truth which all religions acknowledge that He is in all men and all things and that in Him we move and have our being. It is the one religion which enables us not only to understand and believe this truth but to realise it with every part of our being. It is the one religion which shows the world what the world is, that it is the Lila of Vasudeva. It is the one religion which shows us how we can best play our part in that Lila, its subtlest laws and its noblest rules. It is the one religion which does not separate life in any smallest detail from religion, which knows what immortality is and has utterly removed from us the reality of death.

This is the word that has been put into my mouth to speak to you today. What I intended to speak has been put away from me, and be-

yond what is given to me I have nothing to say. It is only the word that is put into me that I can speak to you. That word is now finished. I spoke once before with this force in me and I said then that this movement is not a political movement and that nationalism is not politics but a religion, a creed, a faith. I say it again today, but I put it in another way. I say no longer that nationalism is a creed, a religion, a faith; I say that it is the Sanatana Dharma which for us is nationalism. This Hindu nation was born with the Sanatana Dharma, with it it moves and with it it grows. When the Sanatana Dharma declines, then the nation declines, and if the Sanatana Dharma were capable of perishing, with the Sanatana Dharma it would perish. The Sanatana Dharma, that is nationalism. This is the message that I have to speak to you.

"শক্তি আবির্ভূতা হয়েছে এবং জাতির মধ্যে প্রবেশ করেছে। বহুদিন পূর্ব্ব থেকেই আমি এই অভ্যুত্থানের আয়োজন করছিলাম, এখন সময় এসেছে, এখন আমিই একে সিদ্ধির দিকে পরিচালিত করব।"

উত্তরপাড়ায় সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণা করেন, "তাহলে আপনাদের কাছে এইটিই আমার বক্তব্য। আপনাদের সভার নাম হচ্ছে 'ধর্ম্ম-রক্ষিণী-সভা'। হাঁ, ধর্ম্মের রক্ষা, জগতের সম্মুখে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা ও অভ্যুত্থান, আমাদের সামনে এইটিই হল কাজ।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কি ? এই যে ধর্ম্মকে আমরা বলি সনাতন, সর্ব্বকালিক এই ধর্ম্ম কি ? এটি হিন্দুধর্ম্ম, কেবল এইজন্যেই যে, হিন্দুজাতি এই ধর্ম্মকে রেখেছে, হিমালয় ও সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই উপদ্বীপে নিরালায় এই ধর্ম্ম গড়ে উঠেছে, এই পুণ্য ও প্রাচীন ভূমিতে আর্য্য-জাতির উপর ভার দেওয়া হয়েছিল এই ধর্ম্মকে যুগ যুগান্তরের ভিতর দিয়ে রক্ষা করতে। কিন্তু ইহা কোন একটি দেশেরই গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জগতের কোন একটি সীমাবদ্ধ অংশের জন্যেই বিশেষভাবে এবং চিরকালের জন্যে এ ধর্ম্ম নয়। যাকে আমরা হিন্দুধর্ম্ম বলি বস্তুতঃ সেটি হচ্ছে সনাতন ধর্ম্ম, কারণ সেটি বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, অন্য সকল ধর্ম্মই তার অন্তর্গত। কোন ধর্ম্ম যদি সার্ব্বজনীন না হয় তবে তা সনাতন হতে পারে না। কোন সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম, অনুদার ধর্ম্ম কেবল স্বল্পকাল ও সীমাবদ্ধ সামান্য উদ্দেশ্যের জন্যেই জীবিত থাকতে পারে। এইটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম্ম যা বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও দার্শনিক চিন্তাধারাসকলের পূর্ব্বাভাস দিয়ে, তাদিকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে জড়বাদের উপর জয়ী হতে পারে। এইটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম্ম যা মানব জাতিকে ভাল করে বুঝিয়ে দেয়, ভগবান আমাদের কত নিকট, কত আপনার, মানুষ যত রকম সাধনার দ্বারা ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে পারে সবই এর অন্তর্গত। এইটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম্ম যা প্রতি মুহূর্ত্তে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-স্বীকৃত এই সত্যটির উপর জোর দেয় যে, ভগবান সকল মানুষ, সকল জিনিষের মধ্যেই রয়েছেন, আর আমরা তাঁরই মধ্যে চলাফেরা করছি, তাঁরই মধ্যে বাস করছি। এইটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম্ম যা এই সত্যটিকে কেবল বুঝতে ও বিশ্বাস করতেই আমাদের সাহায্য করে না পরন্তু আমাদের সমস্ত সত্তা দিয়ে এটিকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এইটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম্ম যা জগৎকে দেখিয়ে দেয় যে, জগৎটা কি, এটি হচ্ছে বাসুদেবের লীলা। এইটিই হচ্ছে একমাত্র

ধর্ম্ম যা আমাদের দেখিয়ে দেয় কেমন করে আমরা এই লীলার মধ্যে আমাদের নিজ নিজ ভূমিকা সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে গ্রহণ করতে পারি, দেখিয়ে দেয় এর সূক্ষ্মতম ধারাগুলি কি, এর উদারতম নীতিগুলি কি। এইটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম্ম যা জীবনকে ক্ষুদ্রতম ব্যাপারেও ধর্ম্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে না, যা জানে যে, অমৃতত্ব কি এবং যা আমাদের মৃত্যুভয়কে সম্পূর্ণভাবে দূর করে দিয়েছে।

এই বাণীটিই আজ আমার মুখে দেওয়া হয়েছিল আপনাদের শোনাতে। আমি যা বলবার মতলব করেছিলাম তা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আর আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তার বেশী আর একটি কথাও বলবার নেই। আমাকে যে-কথা দেওয়া হয় কেবল সেইটিই আমি আপনাদের বলতে পারি। সে কথা এখন সমাপ্ত হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে একবার আমার মধ্যে এই শক্তি নিয়ে কথা বলেছিলাম, বলেছিলাম যে এই আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, আর জাতীয়তা রাজনীতি নয়, পরন্তু একটা ধর্ম্ম, একটা বিশ্বাস, একটা নিষ্ঠা। আজ আবার আমি সেই কথাই বলছি, কেবল অন্যভাবে। আর আমি বলি না যে, জাতীয়তা একটা বিশ্বাস, একটা ধর্ম্ম, একটা নিষ্ঠা; আমি বলছি আমাদের পক্ষে সনাতন ধর্ম্মই হচ্ছে জাতীয়তা। এই হিন্দুজাতি জন্মেছিল সনাতন ধর্ম্ম নিয়ে, এর সঙ্গেই সে চলে; এর সঙ্গেই সে বিকাশ লাভ করে। যখন সনাতন ধর্ম্মের অবনতি হয় তখনই জাতীয় অবনতি হয়, আর যদি সনাতন ধর্ম্মের ধ্বংস হওয়া সম্ভব হত তা হলে সনাতন ধর্ম্মের সঙ্গে এই জাতিটাও ধ্বংস হত। সনাতন ধর্ম্ম, এইটিই হচ্ছে জাতীয়তা। আপনাদের নিকট এই আমার বাণী।

(শ্রীঅরবিন্দ—উত্তরপাড়া অভিভাষণ বঙ্গানুবাদ)
২২।২৩—২৯ পৃষ্ঠা

ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন "কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোচিত শিক্ষার অন্তর্গত। অতএব কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালী ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার অন্তর্গত রাখিয়া প্রচারিত হইলেই ভাব-বৈষম্য প্রশমিত হইয়া উদ্দেশ্য স্থায়ী সিদ্ধ হইবে।"

(কংগ্রেস ও পল্লীসংগঠনে আমাদের কথা)

ইহাই একমাত্র পন্থা—একদিকে ধর্ম্ম আন্দোলনের দ্বারা গ্রামবাসীর দুর্নীতিসকল দূর করিতে হইবে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। ধর্ম্ম-আন্দোলনের জন্য যেমন ধর্ম্মসভা, গীতা-প্রচার সমিতি, আশ্রম প্রভৃতি স্থাপন করা প্রয়োজন, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও সেইরূপ সভা সমিতি সঙ্ঘ স্থাপন করা প্রয়োজন—তবেই গ্রামবাসীদের পুনরায় মিলিতভাবে কাজ করিবার অভ্যাস ফিরিয়া আসিবে। ইহার প্রকৃষ্ট উপায় গ্রামে গ্রামে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা। ব্যাঙ্ক গ্রামবাসীকে কৃষি শিল্পাদি কর্ম্মের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ দিবে। বর্ত্তমানে গ্রামবাসী মহাজনের নিকট যে ঋণ গ্রহণ করে তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের সর্ব্বনাশ হয়। বাংলাদেশে তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের এক কারণ হইতেছে মহাজনী প্রথা। আইন করিয়া ইহা উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু গ্রামবাসীর অনেক সময়েই ঋণের প্রয়োজন হয়—একমাত্র সমবায় ব্যাঙ্কের (Co-operative Credit Bank) দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারে গ্রামের লোক অনেক সময়ে অযথা ব্যয় করিয়া ঋণজালে অচেছদ্যভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। এইসব অপব্যয়ের বিরুদ্ধে জনমত গঠিত করিতে হইবে এবং যাহার যেরূপ সামর্থ্য তাহা বিবেচনা করিয়া সমবায় ব্যাঙ্ক হইতেই লোককে ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু শুধু ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ দিলেই চলিবে

না। গ্রামের লোক কেনা ও বেচা আপন আপন স্বতন্ত্রভাবে করে তাই দুইদিকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অত্যধিক মূল্য দিয়াও ভাল খাঁটি জিনিষ কিনিতে পারে না, আবার নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্যও যথোচিত মূল্য পায়না। অতএব গ্রাম্য সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে, উহার একটি অঙ্গস্বরূপ একটি ক্রয়বিক্রয় ভাণ্ডার (Sale-purchase Store) স্থাপন করিতে হইবে। সভ্যগণ তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য সমবেত ভাবে বিক্রয়ের জন্য ঐ ভাণ্ডারে আনিয়া দিবে এবং তাহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের দ্রব্যসমূহ ঐ ভাণ্ডার হইতে ক্রয় করিবে। ব্যাঙ্ক সভ্যগণের জমির খাজনা মিটাইয়া দিবারও ভার গ্রহণ করিয়া জমিদারী কর্ম্মচারীদের অন্যায় শোষণ অত্যাচার হইতে কৃষকগণকে রক্ষা করিতে পারে।* এইভাবে ভাণ্ডারসহ সমবায় ব্যাঙ্ক থাকিলে গ্রামবাসী জমিদার, মহাজন ও ব্যবসাদারের শোষণ ও অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে এবং সকলে মিলিয়া সাধারণের কল্যাণের জন্য সমবেতভাবে কাজ করিতেও অভ্যস্ত ও শিক্ষিত হইয়া উঠিবে এবং এইভাবে গ্রামে গ্রামে যে প্রাণশক্তির উন্মেষ হইবে তাহাতে গ্রামবাসী অন্যান্য সকল সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, স্বাস্থ্যের সমস্যা, প্লাবন ও দুর্ভিক্ষের সমস্যা—সবই নিজেরা সমাধান করিতে পারিবে এবং প্রয়োজন মত গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে সাহায্য আদায় করিয়া লইতে পারিবে। চরকাকে পল্লীসংগঠনের কেন্দ্র করার পরিবর্ত্তে এইরূপ সমবায় ব্যাঙ্ক ও ভাণ্ডারকে কেন্দ্র করিতে পারিলেই পল্লীসংগঠনকার্য্য সুচারুভাবে চলিবে।

---

* জমীদারী প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে—জমীর খাজনা বা revenue সমগ্রই গ্রামবাসী গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য রাখিয়া দিবে, গবর্ণমেণ্ট তাহা হইতে কিছুই লইবেন না, তাহা হইলেই মরণোন্মুখ গ্রাম্যসমিতিকে বাঁচান সম্ভব হইবে।

কিন্তু গ্রামে গ্রামে এইরূপ কর্ম্ম করিবার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মীর প্রয়োজন। এমন কর্ম্মী চাই যাহারা হুজুগ চাহিবে না. যশোমান প্রভাব প্রতি-পত্তি চাহিবে না, কোন বাধা বিপত্তিতে বিচলিত হইবে না, যত বিলম্বেই হউক কিছুতে ধৈর্য্য হারাইবে না। যাহারা গীতার কর্ম্মযোগের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে—ভগবানের উপাসনা হিসাবে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে শিখিয়াছে—কেবল সেইরূপ কর্ম্মীর দ্বারাই প্রকৃত গ্রাম-সংগঠন, জাতি-সংগঠনের কার্য্য চলিতে পারে। ব্রহ্মচারীবাবা এইরূপই কতকগুলি কর্ম্মী প্রস্তুত করিয়া তাঁহার গৌরীআশ্রমে "মাতৃভাণ্ডার" নামে একটি "ভাণ্ডার" স্থাপন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকখানি গ্রামে আদর্শ-ভাবে গ্রাম সংগঠন করিবার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। "কংগ্রেস ও পল্লী-সংস্কারে আমাদের কথা" পুস্তিকায় তাঁহার শেষ কথা ছিল—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

অতএব প্রথমেই নিষ্কাম কর্ম্মীর প্রয়োজন। নিষ্কাম হইলেই নিষ্কাম কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যায়। নিষ্কাম কর্ম্ম শিক্ষা বা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা একই কথা।

রাজনৈতিক কার্য্যে তিনি সাক্ষাৎভাবে হস্তক্ষেপ করেন নাই—তবে তিনি গান্ধীজীর পন্থা বর্জন করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পন্থা অনুসরণ করিতেই দেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"সত্যযুগাঙ্কুর" নামক পুস্তিকায় তিনি লিখিয়াছেন—

"বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে স্বরাজ বলিয়া যে সাড়া পড়িয়াছে, গত ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় তাহার ভাবার্থ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—"আমাদের জাতীয় সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার যে আদর্শ, তাহাই স্বরাজ।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"প্রাচীন ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তি যেরূপ ব্যক্তিগতভাবে আত্মার মুক্তি চাহিয়াছেন, বর্ত্তমান

ভারতে সমগ্র ভারতের নর-নারী সমষ্টিভাবে সেইরূপ জাতীয় মুক্তি চাহিতেছেন।

"দেশবন্ধুর এই জাতীয় মুক্তিই ভারতের সনাতন নীতি। ভারতবর্ষে জাতিগঠন প্রণালীর বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ক্রমে ব্যক্তিগত মুক্তি (নির্ব্বাণ মুক্তি) লাভের পথ সুগম হইয়া পড়ে।

"যুগে যুগেই রাজশক্তির সাহায্যে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা বা ধর্ম্ম প্রচার সুসিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবাসী যদি যথাযথ ভাবে সরকারকে জাতীয়তা সংস্থাপনের তাৎপর্য্য ও উপায় বুঝাইতে পারেন, তবে অবশ্যই ভারতবাসী আশা করিতে পারেন যে রাজশক্তির সাহায্যেই এই মহান কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। ইহা ব্যতীত যদি কেহ স্বরাজ অর্থে অন্যরূপ অর্থাৎ রাজত্বলাভ বুঝেন, তবে তাহা ভারতীয় প্রকৃতির বিরোধী হইবে"। (শ্রীমৎ ভারতব্রহ্মচারী—"সত্যযুগাঙ্কুর" ১৩ পৃষ্ঠা)

গান্ধিজী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশবাসী যখন ইংরাজ-বিদ্বেষী হইয়া উঠিতেছিল—ইংরাজ গভর্ণমেন্টের সহিত বিরোধ করাকেই স্বরাজ লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া ভাবিতে শিখিতেছিল—সেই সময় প্রকাশ্যভাবে এমন উক্তি করা কম সাহসের কথা নহে। কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবা ছিলেন সত্যই সত্যাশ্রয়ী ও সত্যাগ্রহী—তিনি সত্য বলিয়া যাহা বুঝিতেন অকুণ্ঠভাবে তাহা প্রচার করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, অতীতে ইংরাজ ভারতের প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকুক এখন তাহাদের মতিগতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে—এই সময়ে একদিকে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা ও সহযোগিতা, অন্যদিকে যথাযথভাবে গঠন কার্য্য চালাইয়া দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করা ইহাই হইতেছে স্বরাজ লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।

১৯২১ সালের কংগ্রেস আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য কর্ম্মীর ন্যায় তিনি কখনও অধৈর্য্য ও হতাশ

হন নাই—তিনি জানিতেন স্বয়ং জগন্মাতা জগতের কল্যাণের জন্য, সত্যযুগ আনয়নের অপরিহার্য্য উপায় স্বরূপ স্বয়ং ভারতকে স্বাধীন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন—অতএব সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবেই, কেহই তাহা রোধ করিতে পারিবে না—মা যথাসময়ে তাহা করিয়া দিবেন, সেজন্য উৎকণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। এই যে পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমর হইয়া গেল—এ-সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্য্যরূপেই ফলিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, ঐ আগামী যুদ্ধে ভারতবাসী বৃটিশের সহায়করূপে অসাধারণ রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া জগতের রাষ্ট্র দরবারে মহনীয় স্থান অধিকার করিবে। তাঁহার বাণী সফল হইয়াছে—কারণ তাহা ভারত আত্মার বাণী। কংগ্রেস যে দেশবাসীকে ঐ যুদ্ধে সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়াছিল, "not a man not a penny" "একটি মানুষ দিয়ে সাহায্য করো না, একটি পয়সা দিয়েও না।" সে নির্দ্দেশ ব্যর্থ হইয়াছে—ভারতের ২০ লক্ষ যুবক স্বেচ্ছায় সৈন্যদলে যোগ দিয়াছে, এক কোটি ত্রিশ লক্ষ নরনারী যুদ্ধ বিভাগে কর্ম্ম করিয়াছে—আর অর্থ ও দ্রব্যসম্ভার যাহা যোগাইয়াছে তাহারও পরিমাণ কম নহে। এ-জন্য ব্রিটিশ জাতি মুক্তকণ্ঠে ভারতবাসীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল এবং ভারতকে অচিরে স্বরাজ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। ব্রহ্মচারীবাবা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, "**ঐ মহাযুদ্ধের পরিণামেই ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া স্বরাজ লাভ করিবে।**" এই সম্বন্ধে তিনি জগন্মাতার বাণী পাইয়াছিলেন—ইংরেজ রাজত্বের 'ত্ব'টুকু থাকিবে।

ব্রহ্মচারীবাবার এই সব বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী "ভারত সমাজ" পত্রিকায় ১৩৩৬ সনের পৌষমাসে অজপানন্দ লিখিত একটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল—আমরা সেই প্রবন্ধটি এখানে কিছু তুলিয়া দিতেছি।

"বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্ম বা অদ্বৈতাত্মজ্ঞানের সঙ্কোচে, দ্বৈত বোধের প্রবল প্রভাবে হিংসা-দ্বেষ ও আত্মকলহাদি জনিত ভীষণ জ্বালা হইতে জগদ্বাসীকে উদ্ধার করিবার জন্য, আপনার তত্ত্ব, আপনার স্বরূপ জগদ্বাসীকে জানাইবার উদ্দেশ্যে, প্রেম, আনন্দ ও মাধুর্য্যভাবে জগদ্বাসীকে ওতপ্রোত ভাবে ডুবাইয়া পরাশান্তিদানের লীলারস আস্বাদন করাইবার অভিপ্রায়ে সেই 'সম্ভবামি যুগে যুগে' মহাবাক্য সফল করিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিতে স্বয়ং শ্রীভগবান (ব্রাহ্মীশক্তি) ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"সত্যদ্রষ্টা, স্থিতপ্রজ্ঞ, প্রত্যাদিষ্ট, 'মায়ের কোলের শিশু' (অকর্ত্তা, দ্রষ্টা) পরম পূজ্যপাদ গুরুদেব সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারী মহোদয় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান-প্রসঙ্গে আমাদের নিকট শ্রীভগবানের মহাবির্ভাবের কথা পুনঃপুনঃ দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

"ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন যে তিনি বাল্যকাল হইতেই 'বাণী' শ্রবণ করিতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া দর্শন ও আদেশদানে তাঁহাকে তপস্যা ও সাধনায় অগ্রসর করাইয়াছেন।

"স্বয়ং শ্রীভগবান এবং তাঁহারই অভিন্নশক্তির প্রকাশ যাবতীয় দেবদেবী মুনিঋষি ও অবতারগণের সূক্ষ্মাবির্ভাবের প্রভাবে সমগ্র জগদ্ব্যাপী একটা মহাপরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। প্রত্যেকের হৃদয় মহতী আশা, প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ঐশী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে। অধর্ম্মমূলক অসত্য, কপটতা, হিংসাদ্বেষ ও আত্মকলহাদি অপনোদন করিবার জন্য, একদিকে প্রেম, আনন্দ ও মাধুর্য্যভাব লইয়া, ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিকাশ, অন্যদিকে প্রবল শৌর্য্য ও পরাক্রমাদি ও জীবনাহুতি দানের অপ্রতিহত লক্ষ্য ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া প্রবল ক্ষাত্র শক্তির ক্রমবিকাশ দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষেও এ-নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই।

"সেই মহাশক্তির সূক্ষ্মক্রিয়ার প্রভাবেই সেদিন ইউরোপে মহাসমর সংঘটিত হইয়া ইউরোপের মদগর্ব্বিত রাষ্ট্রসমূহের শক্তিহ্রাস হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে সমগ্র পৃথিবীর মদগর্ব্ব হ্রাস পায় নাই, তজ্জন্য পুনরায় যুদ্ধায়োজন চলিতেছে।

ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন যে, "অদূর ভবিষ্যতে যে পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, সে মহাযুদ্ধে ভারতবাসী ব্রিটিশের সহায়করূপে ব্রিটিশের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অসাধারণ রণ-কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক জগতের রাষ্ট্রদরবারে মহনীয় স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন। এই মহাযুদ্ধের পরিণামেই ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া "স্বরাজ" লাভ করিবেন। ব্রহ্মচারীবাবাকে "মা" (ব্রাহ্মীশক্তি) জানাইয়াছেন—ইংরেজ রাজত্বের 'ত্ব'*টুকু থাকিবে।

"মহাশক্তির আবির্ভাব স্বরাজ-লাভেই পরিসমাপ্ত নহে। আগামী মহাযুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীর অপক্ষাত্রশক্তি ধ্বংসীভূত হইলে, ভারতের সনাতন স্বভাব—প্রেম, আনন্দ ও মাধুর্য্যভাব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যশক্তি বা ব্রহ্মভাব ভারতবর্ষ ও ব্রিটিশের ক্ষাত্রশক্তির সহিত মিলিত হইয়া সমগ্র জগতে সাম্য, মৈত্রী ও প্রেম প্রতিষ্ঠা করিবে। ইহারই অন্য নাম "ধর্ম্ম-সংস্থাপন" বা "জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা"। শ্রীভগবানের মহাবির্ভাবের ইহাই পরিণাম।

"স্বয়ং শ্রীভগবান ও দেবদেবীসমূহ, শুদ্ধ-সত্ত্বগুণী মহাপুরুষ, সত্ত্বগুণ-প্রধান ও সত্ত্বমিশ্ররজগুণ-প্রধান মহাত্মাগণের উপর স্থূলে সূক্ষ্মে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের ভিতর দিয়াই ক্রিয়া করিতেছেন!...."

—অজপানন্দ

(ভারতসমাজ পত্রিকা পৌষ ১৩৩৬)

* ইংরাজ রাজত্বের "ত্ব"টুকু থাকিবার অর্থ এই যে প্রকৃত রাজ (Government) ভারতবাসী লাভ করিবে। ভারত স্বাধীন হইবে, অথবা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্য্যরূপে সফল হইয়াছে।

মায়াবাদ ও সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর

শ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারী জগন্মাতার প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে, যে ভাবে চলিবার নির্দ্দেশ ভারতবাসীকে দিয়া গিয়াছেন তাহাই যে প্রকৃত কল্যাণের পথ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে আজ পর্য্যন্ত দেশবাসী সে পথে চলিতেছে না কেন? তাঁহার প্রদর্শিত পথে সমাজ-সংগঠন কই হইতেছে? তিনি রাষ্ট্রক্ষেত্রে রাজশক্তির সহিত সহযোগের যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—তাহার পরিবর্ত্তে পুনঃপুনঃ বিদ্রোহ ও আইন অমান্য করায় ভারতবাসীর অপমান ও লাঞ্ছনার চূড়ান্ত হইয়াছে—প্রত্যেকবার এই ব্যর্থ আন্দোলনের ফলে দেশের উপর এমন মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ও হতাশার ভাব আসিয়া পড়ে, ভারতবাসী নিজেদের শক্তির উপর বিশ্বাস এমনভাবে হারায় যে, জার্ম্মানী বা জাপান ভারতকে স্বরাজ আনিয়া না দিলে আর তাহাদের গত্যন্তর নাই—এমনই অনেকের মনের ভাব হয়। আর আধ্যাত্মিকতার দিকে ভারত যে এতটুকু অগ্রসর হইয়াছে তাহার ত কোন লক্ষণই দেখা যায় না। ইহা হইতে কি মনে হয় না যে শ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারীর সকল সাধনা, সকল শ্রম পণ্ড হইয়াছে?

ভারতের এবং সমগ্র জগতেরই অবস্থা এখন যে খুবই শোচনীয় এবং বিষম বিপদসঙ্কুল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানব-জীবনের সকল ক্ষেত্রে এখনও আসুরিক প্রভাব প্রবল রহিয়াছে—পৃথিবীতে এখনও চলিতেছে অসুরের রাজ্য, কলির রাজ্য। আসুরিক শক্তিকে জয় করিয়া পৃথিবীতে মায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, দেবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—ইহাই ছিল ভারত ব্রহ্মচারীর জীবন-ব্রত। তবে সে কাজ আগে

হয় সূক্ষ্মে, তাহার পর তাহা স্থূলে প্রকাশ পায়—কুরুক্ষেত্রের সূচনায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—আমি এইসব যোদ্ধাকে আগেই মারিয়া রাখিয়াছি। ভারত ব্রহ্মচারীর অধিকাংশ কার্য্যই হইয়াছে সূক্ষ্মজগতের ক্ষেত্রে। বেলবনে কঠোর তপস্যার পর মহালক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে বরদান করিলে—ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছিলেন, "আমার কার্য্য এখন শেষ হইয়াছে।" তাঁহার সাধন-জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ৪০ বৎসর ব্যাপী বহু দেবশক্তির জাগরণ, আবির্ভাব, শক্তিসঞ্চার জগতের মহামঙ্গলোদ্দেশে চলিয়াছিল—এবং সেই সবই ছিল সূক্ষ্মজগতের ক্রিয়া—সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে। এ-সব দেখিয়া ব্রহ্মচারীবাবা স্পষ্টভাবেই মার কাছে নিবেদন করিলেন, "মা, তোমার শুভদৃষ্টি যখন ভারতের উপর পতিত হইয়াছে, তখন ভারতের মহাসৌভাগ্য উপস্থিত। তুমি যখন আবির্ভূতা হইয়াছ তখন ভারত উদ্ধার হইবেই, ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবেই। জানিনা কোন মহাপুণ্যফলে অশেষ কৃপাপূর্ব্বক এ-ক্ষুদ্রশরীরকে যন্ত্র করিয়া এ মহান কার্য্য সাধন করিয়াছ! আমি ধন্য ও কৃতজ্ঞ। আমার শরীরটা এখানেই পতিত হউক।"

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মচারীবাবার সাধনা পণ্ড হয় নাই—তাঁহার কাজ তিনি প্রকৃষ্ট-ভাবেই শেষ করিয়াছিলেন। তবু মা তাঁহাকে আরও কিছুদিন এই স্থূল দেহে রাখিয়াছিলেন, স্থূল কর্ম্মক্ষেত্রেও কিছু কর্ম্ম পরীক্ষা হিসাবে আরম্ভ করিবার জন্য। তাই তিনি পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকখানি গ্রাম লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি যখনই যে গ্রামে যাইতেন গ্রামবাসীদের মধ্যে অপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার হইত, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত, অনেক মুসলমানও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। তথাপি এ-কার্য্য বেশী-দূর অগ্রসর হয় নাই—সত্যযুগের প্রবর্ত্তনে আসুরিক শক্তির বাধা তখনও

খুব প্রবল ছিল। তাঁহার অনুগত শিষ্যদের মধ্যেই কয়েকজনের নানারূপ সন্দেহ এমন কি অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। তিনি যে শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া এই পৃথিবীতেই জগন্মাতার দিব্য-শক্তিতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার বাণী শুনাইয়াছিলেন—তাহা তাহারা সহজ সরলভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহা লইয়া গুরুর সহিত তাহাদের অনেক তর্ক বিতর্ক হইত। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কোন মহা-পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিবার কথা উঠিলে, ব্রহ্মচারীবাবা শ্রীঅরবিন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। অন্য এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন ভারতে কেবল একজন এমন মহাপুরুষ আছেন যাঁহার কাছে তিনি যাইতে পারেন—অর্থাৎ আর কাহারও কাছে তিনি কিছু শিখিবার বা পাইবার আশা করেন না। ব্রহ্মচারীবাবার পরামর্শ অনুযায়ী মায়াবাদ সম্বন্ধে যোগদানন্দ, কুমুদানন্দ (কেদার), ধীরানন্দ প্রভৃতি একযোগে কুমুদানন্দের নামে শ্রীঅরবিন্দকে যে পত্র দিয়াছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দ বারীন্দ্রকুমার ঘোষের দ্বারা যে উত্তর দিয়াছিলেন আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

আশ্রম চিত্রধাম
পোঃ নেত্রকোনা
জিঃ ময়মনসিংহ
২০শে পৌষ, ১৩৩১

পরমপূজ্যপাদ
শ্রীঅরবিন্দ
শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

প্রশ্ন—মহাত্মন, ঈশ্বর সম্বন্ধে যতই আলোচনা করিতেছি ততই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে; কারণ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত

দৃষ্ট হয়। বেদান্তে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্বন্ধে স্পষ্ট মীমাংসা নাই, আবার পুরাণ তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। পুরাণে উল্লেখ আছে যে তৎকালীন নৃপতিগণ ভগবদাদেশে অথবা তাঁহাদের গুরু ভগবদ্ দর্শন আদেশপ্রাপ্ত ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের আদেশে রাজ্য পরিচালনা করিতেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও পাওয়া যায় যখনই দেবতামানব অসুরের উৎপীড়নে জাতিধর্ম্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়াছেন, তখনই সকলে মিলিয়া মায়ের (ঐশী-শক্তির) কৃপা লাভের নিমিত্ত কঠোর তপস্যার সহিত স্তব স্তুতি করিলে মা ভগবতী (ঐশীশক্তি) আবির্ভূতা হইয়া সকলকে আশ্বস্ত করিয়া স্বয়ংই শান্তি স্থাপন করিয়াছেন।

এদিকে দেশহিতৈষী ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীশ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ এবং ঈশ্বরের স্তবস্তুতি প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সোঽহংবাদ ও ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান ও পুরাণের ঈশ্বর-বাদ প্রচার করিয়াছেন।

দেশনায়ক বিশ্ববিশ্রুত শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী জ্ঞানযোগ, ভক্তি-যোগ ও কর্ম্মযোগ পৃথক পৃথক প্রচার করিয়াছেন।

আপনাকেও দেখা যাইতেছে জগৎ-নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর মানিয়া লইতেছেন।

অপরদিকে বেদান্তের দিক দিয়া দেখিয়া জগৎ-নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ি।

বর্ত্তমান সময়েও সর্ব্বজনহিতৈষী নানা ধর্ম্ম মতাবলম্বী দেশনায়ক মহাত্মাগণ আমাদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন সত্য কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট হইতে কোন উপদেশ পাইতেছি না।

অতএব জিজ্ঞাস্য এই যে বেদান্তের আত্মজ্ঞান লাভে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ ও ঈশ্বরোপাসনায় আত্মজ্ঞান লাভ (চৈতন্যসত্তায় স্থিতি) এতদুভয়ে কি উপায়ে সামঞ্জস্য হইতে পারে? নিবেদন ইতি

নিবেদক—
কুমুদানন্দ (কেদার)

উত্তর

পণ্ডিচেরী
২৩শে মাঘ, ১৩৩১

সবিনয় নিবেদন, আপনার পত্র শ্রীঅরবিন্দের কাছে পড়া হয়েছে। তিনি নিজে পত্রাদি লেখেন বা পড়েন না। আপনার পত্রের উত্তরে তিনি যা লিখতে বললেন তা নীচে লিখছি।

আপনি লিখেছেন, "বেদান্তে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্বন্ধে স্পষ্ট মীমাংসা নাই।" এই "বেদান্ত" কথাটি যদি বেদান্ত দর্শন অর্থে লিখে থাকেন তা' হলে আপনার কথা যথার্থ। বেদান্ত দর্শন একটি মতবাদের জিনিষ, অদ্বৈত তত্ত্ব তার প্রতিপাদ্য বস্তু। কিন্তু ঐ বেদান্ত কথাটি যদি উপনিষদ্ অর্থে ব্যবহার করে থাকেন তা'হলে আপনার কথা যথার্থ নয়। উপনিষদে ও গীতায় (গীতা উপনিষদেরই বাণী বহন করে) ভগবান পুরুষোত্তম বা ব্রহ্ম একই, ভগবতী তাঁর ঐশীশক্তি।

দর্শনাদি শাস্ত্র তর্কবুদ্ধির কথা। ভগবান অনুভূতির বস্তু। মন বুদ্ধির খেলাই এই, যে, তা' বিষমতা বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। মানস জ্ঞানে একটি বস্তু সত্য বলে ধরলে আর একটি মিথ্যা দেখায়। ভগবান কিন্তু মনের অতীত বস্তু, অখণ্ডের বা বৃহৎজ্ঞানের জিনিষ। মনের উপরে সে জ্ঞানরাজ্যে উঠলে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়, সেটি সত্যের রাজ্য, সকলই সেখানে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে ধরা আছে। সেখানে ব্রহ্ম

বা ভগবানে ভেদ নাই। সাধনার দ্বারা মনবুদ্ধিকে শান্ত করে এই পরাজ্ঞানে উঠতে হয়, তখন মনের এ সব সংশয় আর থাকে না।

আমাদের প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করবেন।

ইতি নিবেদক

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

ব্রহ্মচারীবাবার উত্তর—২০শে পৌষ ১৩৩১

দ্রষ্টার আত্মসমর্পণ ও আত্মসমর্পণকারীর দ্রষ্টৃত্ব। আত্মজ্ঞান লাভে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও ঈশ্বরোপাসনায় আত্মজ্ঞান লাভ (চৈতন্য সত্তার স্থিতি)।

· যেহেতু চৈতন্য সত্তা অকর্ত্তা, প্রকৃতি হ্লাদিন্যাভিমানী শক্তি প্রকাশে সৃষ্টিলয়াদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন—অর্থাৎ চৈতন্যসত্তা প্রকৃতিতে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন। জীবাত্মার আত্মসমর্পণই আত্মজ্ঞান ও চৈতন্যস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হওয়া। কর্ত্তৃত্বাভিমানই জীবত্ব। পরমাত্মা কর্ত্তৃত্ববিহীন কর্ত্তা। জীবাত্মা কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকাতেই সুখ দুঃখ ভোগ করে, কর্ত্তৃত্বাভিমান দেহাত্মবোধে ঘটে অতএব তাহাকে বদ্ধ-জীব বলে।

পরাপ্রকৃতির ষড়ৈশ্বর্য্যের বিকাশই ঈশ্বরত্ব আর জীবাত্মা বা অপরা প্রকৃতির আত্মসমর্পণই চৈতন্য বা আত্মজ্ঞান। পরাপ্রকৃতি ও চৈতন্য অভেদ হইলেও কি এক অজানা ইঙ্গিতে যেমন কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞ মহা-পুরুষে ষড়ৈশ্বর্য্যের বিকাশে ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পায় আর কাহারো মধ্যে প্রকাশ পায় না। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে ঈশ্বরত্ব বা ষড়ৈশ্বর্য্যের বিকাশ মহাশক্তির (পরাপ্রকৃতির) বিশেষ ইচ্ছার অধীন।* জীবাত্মা বা অপরা প্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপত্ব আত্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইলে পরাপ্রকৃতিগত

* যমে বৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা—(কঠ ২।২৩)

হয় অর্থাৎ তাঁহাকে কর্ত্তা মানিয়া অকর্ত্তা হয়—ইহাকেই বেদান্তে তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও পুরাণে আত্মসমর্পণ বলিয়া থাকে।

পরে যোগানন্দ পণ্ডিচেরী আশ্রমে আসিয়া তাঁহার গুরুর শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রটি পাইয়াছিলেন—

Yogananda,

The Shankara knowledge is, as your Guru pointed out, only one side of the Truth; it is the knowledge of the Supreme as realised by the spiritual Mind through the static silence of the pure Existence. It was because he went by this side only that Shankara was unable to accept or explain the origin of the universe except as illusion, a creation of Maya. Unless one realises the Supreme on the dynamic as well as the static side, one cannot experience the true origin of things and the equal reality of the active Brahman. The Shakti or Power of the Eternal becomes then a power of illusion only and the world becomes incomprehensible, a mystery of cosmic madness, an eternal delirium of the Eternal. Whatever verbal or ideative logic one may bring to support it, this way of seeing the universe explains nothing; it only erects a mental formula of the inexplicable. It is only if you approach the Supreme through his double aspect of Sat and

Chit-Shakti, double but inseparable, that the total truth of things can become manifest to the inner experience. This other side was developed by the Shakta Tantrics. The two together, the Vedantic and the Tantric truth unified, can arrive at the integral knowledge.

But philosophically this is what your Guru's teaching comes to and it is obviously a completer truth and a wider knowledge than that given by the Shankara formula. It is already indicated in the Gita's teaching of the Purushottama and the Parashakti (Adya Shakti) who becomes the Jiva and upholds the universe. It is evident that Purushottama and Parashakti are both eternal and are inseparable and one in being; the Parashakti manifests the universe, manifests too the Divine in the universe as the Iswara and Herself appears at His side as the Ishwari Shakti. Or, we may say, it is the Supreme Conscious Power of the Supreme that manifests or puts forth itself as Iswara Iswari, Atma Atmashakti, Purusha Prakriti, Jiva Jagat. That is the truth in its completeness as far as the mind can formulate it. In the Supermind these questions do not even arise: for it is the mind that creates the problem

by creating oppositions between aspects of the Divine which are not really opposed to each other but are one and inseparable.

This Supramental knowledge has not yet been attained, because the Supermind itself has not been attained, but the reflection of it in intuitive spiritual consciousness is there and that was what was evidently realised in experience by your Guru and what he was expressing in mental terms in the quoted passage. It is possible to go towards the knowledge by beginning with the experience of dissolution in the One, but on condition that you do not stop there, taking it as the highest Truth but proceed to realise the same One as the Supreme Mother, the Consciousness-Force of the Eternal. If on the other hand you approach through the Supreme Mother, she will give you the liberation in the silent One also as well as the realisation of the dynamic One, and from that it is easier to arrive at the Truth in which both are one and inseparable. At the same time, the gulf created by Mind between the Supreme and His manifestation is bridged, and there is no longer a fissure in the truth which makes all incomprehensible. If in

the light of this you examine what your Guru taught, you will see that it is the same thing in less metaphysical language.

5-1-1936 Sri Aurobindo.

বঙ্গানুবাদ*

যোগানন্দ,

শাঙ্কর জ্ঞান, তোমার গুরুও যেমন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সত্যের একদিক মাত্র। পরমাত্মার এই জ্ঞান, বিশুদ্ধ সত্তামাত্রের নিশ্চল নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক মন দ্বারা উপলব্ধি হয়। শঙ্কর কেবল এই দিকটি দিয়া গিয়াছেন বলিয়া জগতের উৎপত্তিকে আর কোন হিসাবে স্বীকার বা ব্যাখ্যা করিতে অপারগ হইয়া বলিয়াছেন জগৎ হইল ভ্রান্তি অথবা মায়ার সৃষ্টি। পরম পুরুষকে কেবল নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয়রূপেও না উপলব্ধি করিলে, পদার্থ সমূহের প্রকৃত উৎপত্তি এবং সগুণ ব্রহ্মও সমান সত্য তাহা অনুভব করিতে পারা যায় না। শক্তি, অনন্তের শক্তি তখনই শুধু মায়ার শক্তি বলিয়া দেখা দেয় এবং এই সংসার হইয়া উঠে অবোধ্য, যেন একটা প্রহেলিকাময় বিশ্বব্যাপী পাগলামী বা অনন্তের অনন্ত প্রলাপ—ইহাকে বাচনিক বা আনুমানিক ন্যায়শাস্ত্র-দ্বারা যে যতই সমর্থন করুক। এইভাবে জগৎকে দেখিলে কিছুরই ব্যাখ্যা হয় না। ইহাতে অনির্ব্বচনীয়ের একটা মানসিক ছক তৈয়ার করা হয় মাত্র। যদি তুমি সেই পরমপুরুষকে তাহার দ্বিবিধরূপ অর্থাৎ সৎ ও চিৎশক্তি, দুই অথচ অখণ্ড—তাহার ভিতর দিয়া দেখিতে চেষ্টা কর, তবে পদার্থের সমগ্র সত্যকে তোমার অন্তরের অনুভূতি দ্বারা ধরিতে পারিবে। এই অন্য দিকটি শাক্ততান্ত্রিকগণ পরিস্ফুট করিয়াছিলেন,

* অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ("ভাস্কর" শ্রীঅরবিন্দ সংখ্যা—১৪ আগষ্ট ১৯৩৯)

এতদুভয় অর্থাৎ বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক সত্যকে একীভূত করিলে আমরা পূর্ণ জ্ঞানে পৌঁছিতে পারি।

দার্শনিকভাবে বিচার করিলে, ইহাই হইতেছে তোমার গুরুর শিক্ষার মূল কথা এবং ইহা স্পষ্টতঃ শাঙ্কর সূত্র হইতে পূর্ণতর সত্য এবং বিস্তৃততর জ্ঞান। গীতার পুরুষোত্তম এবং পরাশক্তি বা আদ্যাশক্তি (যিনি জীব হন এবং এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া থাকেন) ব্যাখ্যায় ইহাই সূচিত হইয়াছে। ইহা স্পষ্ট যে পুরুষোত্তম ও পরাশক্তি উভয়েই অনন্ত ও অভিন্ন এবং সত্তাতে এক। পরাশক্তি বিশ্বকে প্রকাশ করেন এবং এই বিশ্বে পরম পুরুষকে ঈশ্বররূপে প্রকাশ করেন এবং নিজে তাহার পার্শ্বে ঈশ্বরীশক্তিরূপে আবির্ভূতা হন। অথবা আমরা বলিতে পারি পরাৎপরের পরমা চিন্ময়ী শক্তিই নিজেকে ঈশ্বর-ঈশ্বরী, আত্মা-আত্ম-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতি, জীব-জগৎ রূপে প্রকাশ করে অথবা বাহিরে আনিয়া ধরে। মন যতদূর ধারণা করিতে পারে তদনুসারে ইহাই হইল পূর্ণ সত্য। অতিমানস অবস্থায় এই সকল প্রশ্ন আদৌ উঠে না, কারণ মনই এই সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি করে। সে পরমের বিভিন্ন রূপের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে, বাস্তবিক তাহারা পরস্পর-বিরোধী নহে বরং তাহারা এক এবং অভিন্ন।

এই অতিমানস জ্ঞান এখনও লাভ হয় নাই, কারণ এখনও এই অতিমানসেই পৌঁছান যায় নাই, তবে ইহার একটা প্রতিচ্ছায়া অন্তর্বুদ্ধি-গত চেতনার মধ্যে ধরা দিয়াছে। ইহাই তোমার গুরু তাঁহার অভি-জ্ঞতায় স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহাই তিনি উদ্ধৃত অনুচ্ছেদে মানসিক ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। আরম্ভে একের মধ্যে লয় হওয়ার অনুভূতি লইয়া সেই (অতিমানস) জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইয়া উপলব্ধি কর সেই একই পরমা মাতা বা অনন্তের চিৎ-শক্তি। অপরপক্ষে তুমি যদি পরমা মাতাকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হও তবে তিনিই নিষ্ক্রিয়

ও সক্রিয় ব্রহ্মের মধ্যে যুগপৎ মুক্তি আনিয়া দিবেন এবং তারপর যে সত্যে উভয়ে এক এবং অভিন্ন সেখানে তুমি সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। সঙ্গে সঙ্গে মন যে পরম সত্তা ও তাহার প্রকাশের মধ্যে তাহার ভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ঘুচিয়া গিয়া উভয়ের সম্মেলন হয় এবং সত্যের মধ্যে যে ফাটল দেখা দিয়া সমস্ত বিষয়টি অবোধ্য করিয়া তুলে তাহা লুপ্ত হয়। যদি তোমার গুরুর শিক্ষা এই আলোকে দেখ তবে দেখিতে পারিবে যে অপেক্ষাকৃত সহজ মনস্তাত্ত্বিক ভাষায় তিনি ইহাই বুঝাইয়া গিয়াছেন।

সত্যযুগের সূচনা

শিষ্যগণের নানা উপদ্রব এবং দেশীয় জনসাধারণের মূঢ়তার সহিত অনবরত সংগ্রাম করিতে হওয়ায় ব্রহ্মচারীবাবার শরীর শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়িল—১৩৩৩ সনের ভাদ্রমাসে তিনি দেহরক্ষা করিলেন। স্থূল জগতে কাজের ক্ষেত্র এখনও তৈয়ারী হয় নাই বলিয়া সূক্ষ্মজগতে কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য মা তাঁহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন। ঐ বৎসরটি ভারতের তথা সমগ্র জগতের ইতিহাসে এক পরম সন্ধিস্থল। ঐ বৎসরে ১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্বর তারিখে অর্থাৎ ব্রহ্মচারীবাবার দেহরক্ষার কয়েক মাস পরেই শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা পণ্ডিচেরীতে যে অপূর্ব্ব সিদ্ধিলাভ করেন তাহাতেই প্রকৃত সত্যযুগের সূচনা হইয়াছে। তখনই পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়।

ঐ সিদ্ধির নিগূঢ় মর্ম্ম এখানে সব প্রকাশ করা সম্ভব নহে। তবে ব্রহ্মচারীবাবা দেবতা ও মানবের অপূর্ব্ব মহামিলনে এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার যে বাণী বহু পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন—তাহাই এই মহা-পুণ্য দিনে সংঘটিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত স্থূলজগতে তাহার বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই—বরং বিপরীত লক্ষণগুলিই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। পৃথিবীতে সত্য-যুগ আইসে, "বিশ্বমানবে বিশ্বপ্রেম" প্রতিষ্ঠিত হয়—আসুরিক শক্তি-সকল তাহা বরদাস্ত করিতে পারে না। তাহারা চায় পৃথিবীতে তাহাদের রাজত্বই প্রতিষ্ঠিত থাকুক, মানুষ যেমন এখন অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া নানা ভাবে অসুরেরই সেবা করিতেছে এবং সেই জন্য অশেষ দুঃখলাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে—ইহাতেই অসুরের পরম তৃপ্তি, কারণ অসুরের স্বভাবই তাহা। ভগবানের সৃষ্ট জগতে অসুরের উদ্ভব

কেমন করিয়া হইল, সে প্রশ্নের আলোচনা এখানে করিব না—তবে সকল যুগে সকল দেশেই ভগবদ্‌দ্বেষী অসুর বা শয়তানের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, মানুষকে পাপতাপে নিমগ্ন রাখিয়াই তাহার আনন্দ। শ্রীঅরবিন্দ The Life Divine গ্রন্থে এই সব আসুরিক শক্তি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"There are forces, and subliminal experience seems to show that there are supraphysical beings embodying those forces, that are attached in their root-nature to ignorance, to darkness of consciousness, to misuse of force, to perversity of delight, to all the causes and consequences of the things that we call evil. These powers, beings or forces are active to impose their adverse constructions upon terrestrial creatures; eager to maintain their reign in the manifestation, they oppose the increase of light and truth and good and, still more, are antagonistic to the progress of the soul towards a divine consciousness and divine existence. It is this feature of existence that we see figured in the tradition of the conflict between the Powers of Light and Darkness, Good and Evil, cosmic Harmony and cosmic Anarchy, a tradition universal in ancient myth and in religion and common to all systems of occult knowledge.

The theory of this traditional knowledge is perfectly rational and verifiable by inner experience, and it imposes itself if we admit the supraphysical and do not cabin ourselves in the acceptation of material being as the only reality."

(Sri Aurobindo—*The Life Divine*—
(Page 468-469; Vol. II)

পৃথিবীতে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠার অনুকূল অবস্থা যাহাতে সমূলে বিনষ্ট হয়, মানুষ আবার বর্ব্বর পাশবিক অবস্থায় ফিরিয়া যায়, সেই জন্য ঐ সময় হইতেই আসুরিক শক্তিপুঞ্জ জগদ্ব্যাপী বিপ্লব ও অশান্তি সৃষ্টির এমন প্রয়াস করে যাহার তুলনা ইতিহাসে আর মিলে না—এবং এই কার্য্যের জন্য তাহারা উপযুক্ত যন্ত্র পায় জার্ম্মানীর মধ্যে। আমরা দেখিতে পাই ঐ সময় হইতেই হিটলার ও তাহার নাজীদল বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করে এবং শেষ পর্য্যন্ত এমন শক্তিসঞ্চয় করে যে, স্বয়ং জগন্মাতা মিত্রপক্ষের সহায় না হইলে এতদিন সমগ্র পৃথিবীর উপর হিটলারের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত—মানবজাতির দিব্য আনন্দময় শান্তিময় জীবন লাভের আশা-প্রদীপ চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত।

হিট্লারের উপর মিত্রশক্তির বিজয়, বস্তুতপক্ষে জগন্মাতারই বিজয়, ঐ যুদ্ধ ছিল জগন্মাতারই যুদ্ধ, জগতে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া যুগান্তর আনয়নের প্রধান বাধা হিট্লারের পরাজয়ে দূর হইয়াছে কিন্তু এখনও আসুরিক শক্তিসকল সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় নাই, নানাভাবে নানালোকের ভিতর দিয়া তাহারা আবার প্রভাব বিস্তার করিতেছে।*

---

* বর্ত্তমানে আসুরিক শক্তি কম্যুনিষ্ট রুশিয়া এবং স্টালিনকে যন্ত্র করিয়া জগৎকে বিধ্বস্ত করিবার বিরাট আয়োজন করিতেছে।

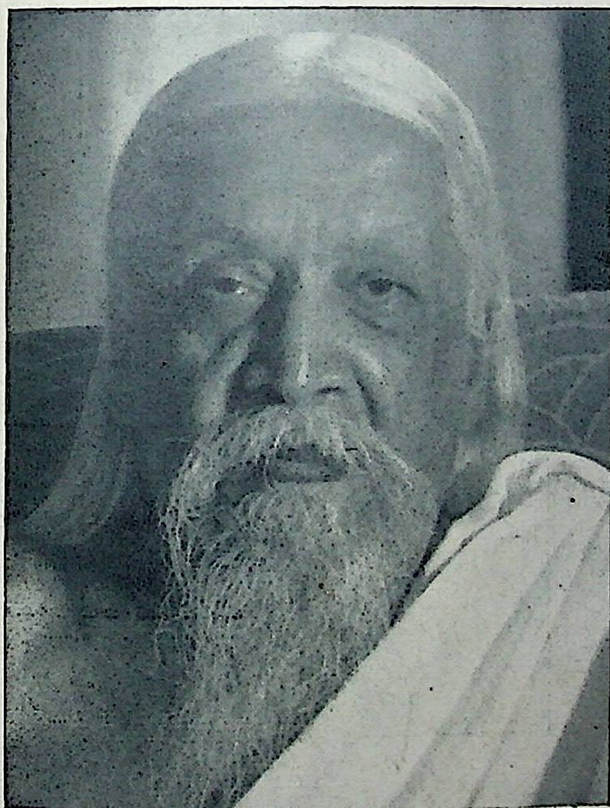
তবে এখন যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় মানব-জাতির মতিগতি আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরিবে, তখনই সকল সমস্যার চরম সমাধানের পথ পরিষ্কৃত হইবে। যাঁহারা জগতে সত্যের প্রতিষ্ঠা দেখিতে চান, এখনই তাঁহাদের বিপুল উদ্যমে কাজ করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। অধ্যাত্মসাধনার দ্বারাই সত্যযুগ আসিবে। ক্যাপিটেলিজম্, কমিউনিজম্, ফ্যাসিজম্, সোস্যালিজম্, ইম্পিরিয়ালিজম্ প্রভৃতি যে-সব মতবাদ লইয়া জগদ্ব্যাপী দ্বন্দ্ব চলিতেছে—ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য আছে, কিন্তু কোনটিই পূর্ণ সত্য নহে, ইহাদের কোন একটিকে ভিত্তি করিয়া আদর্শ মানব-সমাজ গড়িয়া উঠিবে না—চাই এই সবেরই গভীর সমন্বয় এবং তাহা কেবল আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপরই হইতে পারে। আগে মানুষের অন্তর্জীবনে অহিংসা সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না হইলে বাহিরে তাহাদের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা বালুরাশির উপর তাজমহল নির্ম্মাণ প্রয়াসের ন্যায় পণ্ডশ্রম হইবে।

কিন্তু আবার এই আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনও সহজ নহে। দেহ-ধারী মানুষের পক্ষে অহংভাব ছাড়াইয়া উঠা অতিশয় কঠিন, অথচ যতদিন এই অহং থাকিবে—ব্যক্তির অহং, জাতির অহং, দেশের অহং—ততদিন বিশ্বপ্রেম ও ঐক্যের সুপ্রতিষ্ঠা হইতেই পারে না—ততদিন জোড়াতালি ও গোজামিল দিয়া কোনরকমে হোঁচট খাইতে খাইতে চলিতেই হইবে। কিন্তু তাহা হইলে এখনই সত্যযুগের আশা কি সুদূর-পরাহত নহে? সব মানুষ যোগী ঋষি হইয়া উঠিবে, বর্ত্তমানে মানুষের প্রকৃতি দেখিয়া তাহা কি কেহ আশা করিতে পারে? ব্রহ্মচারীবাবার ন্যায় কিম্বা শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার ন্যায় অমন কঠোর ও কঠিন সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ কয়জন লোকের পক্ষে সম্ভব? অতএব সত্যযুগের স্বপ্ন কি চিরকাল স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে না? যোগলব্ধ দৃষ্টি লইয়া

শ্রীঅরবিন্দ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সত্যযুগ শুধু মানুষের চেষ্টা বা সাধনায় আসিবে না। প্রকৃতির ক্রমবিবর্ত্তন ধারাই মানুষকে আর এক উচ্চতর স্তরে তুলিয়া দিবে—এখন যাহা অতি কঠিন ও অসম্ভব মনে হইতেছে, তখন তাহা সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইবে। মানুষ এক উচ্চতর স্তরে উঠিবে উর্দ্ধ হইতে এক অভিনব ভাগবত সত্যের অবতরণের ফলে—শ্রীঅরবিন্দ তাহারই নাম দিয়াছেন Supermind অতিমানস বা বিজ্ঞানশক্তি। প্রাচীন যোগী ঋষিদের ন্যায়ই শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়াছেন যে এই জড়জগৎই একমাত্র জগৎ নহে—ইহার উর্দ্ধে স্তরে স্তরে আরও অনেক জগৎ বা লোক আছে—সেই সব উচ্চতম স্তর বা জগতের শক্তি ও সত্য সকল এই জড়জগতে এই পৃথিবীতে স্থূল আধারে প্রকটিত হইতেছে এইভাবে ক্রমশঃ প্রাণশক্তি ও মানসশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে—জড় হইতে উদ্ভিদের উদ্ভব হইয়াছে, উদ্ভিদ হইতে প্রাণীর, প্রাণী হইতে মানবের উদ্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞান বলিতেছে এই পৃথিবী সূর্য্য হইতে বহির্গত হইয়া কুড়ি কোটি বৎসর ধরিয়া শীতল হইয়াছে—তাহার পরে তাহাতে প্রাণের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাহার পর ক্রম বিবর্ত্তনের ফলে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু জড়ের মধ্যে প্রাণ কেমন করিয়া আসিল, প্রাণের মধ্যে মন কেমন করিয়া আসিল—আর এই ক্রমবিবর্ত্তনের অর্থ কি ; লক্ষ্য কি—এ-সব প্রশ্নের কোন উত্তর জড় বিজ্ঞান দিতে পারে না, কারণ সে দেখে শুধু বাহ্যদিকটা, সূক্ষ্ম অন্তর্জগতের সন্ধান দিবার মত কোন পদ্ধতি তাহার নাই। সে পদ্ধতি আছে যোগসাধনায়—তাহার দ্বারাই জানা যায় যে, এই জড় মানব-দেহে সচ্চিদানন্দের প্রকাশই হইতেছে পার্থিব ক্রম-বিবর্ত্তনের নিগূঢ় লক্ষ্য ও রহস্য—এই জন্যই উর্দ্ধ হইতে প্রাণলোকের প্রভাবে প্রাণের উদ্ভব হইয়াছে, তেমনই মানস-লোকের প্রভাবে প্রাণী হইতে মনোময় জীব মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে, এখন আবার পৃথিবীতে

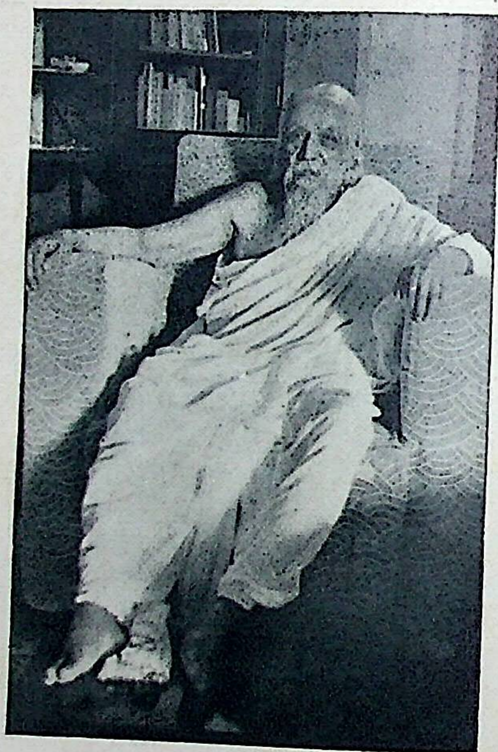
অতিমানসলোকের প্রভাব আসিয়া পড়িতেছে—এবং তাহারই ফলে মানুষ অতিমানবত্বে উত্তীর্ণ হইবে—তখনই জড় দেহ ও প্রাণের মধ্যে সচ্চিদানন্দের প্রকাশ সম্পূর্ণ হইবে, এই মাটির পৃথিবীই হইবে স্বর্গ আর এই মর্ত্ত্য মানবই হইবে দেবতা।

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা দেখিয়াছেন যে, পৃথিবীতে অতিমানস শক্তির অবতরণের শুভক্ষণ উপস্থিত এবং তাহার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই হইতেছে তাঁহাদের সকল অধ্যাত্মকার্য্যের নিগূঢ় তত্ত্ব। একবার এই শক্তি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে তাহার প্রভাবে মানুষের মতিগতির এমন পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে যাহাতে অধ্যাত্ম সাধনা সহজ ও সাবলীল হইবে, অল্প আয়াসেই মানবপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর সম্ভব হইবে, আদর্শ মানবসমাজ স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে গড়িয়া উঠিবে। ব্রহ্মচারীবাবা শ্রীভগবানের মহাবির্ভাবে ও মহাপ্রকাশের যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া গিয়াছেন এবং যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তদনুযায়ী সংস্কারমুক্ত ভাবে সমাজকে পুনর্গঠিত করিলে এই অতিমানসশক্তিকে গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে যেমন ব্যক্তিগত ভাবে, তেমনই সমষ্টিগতভাবে সহজ ও সুগম হইবে। আজ যাহারা তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী জাতি ও সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন তাহারা নিশ্চয়ই সূক্ষ্মজগৎ হইতে ব্রহ্মচারীবাবার আশীর্ব্বাদ ও অধ্যাত্মশক্তির সাহায্য লাভ করিবেন।



শ্রীঅরবিন্দ

Photo: Henri Cartier Bresson



শ্রীঅরবিন্দ

Photo: Henri Cartier Bresson

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মচারীবাবার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ এবং যোগ ও দীক্ষা গ্রহণ

বাংলা ১৩২৪ সনের শেষ ১৩২৫ সনের আরম্ভ, ইংরাজী ১৯১৮ এপ্রিল মাস। তখন আমি নেত্রকোণা উপবিভাগের অন্তর্গত কান্দী-উড়া হাইস্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমার বাড়ী কিশোরগঞ্জ উপবিভাগে—করগাঁও, কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলেই আমি পূর্ব্বে পড়িতাম, সম্প্রতি রাজনৈতিক কারণ বশতঃ কান্দীউড়াতে আসিয়া সেখানকার স্কুলে নূতন ভর্ত্তি হইয়াছি। আমার সহপাঠিগণ আমি নূতন আগন্তুক বলিয়া আমাকে খুব ভালবাসে। তাহাদের কাছেই প্রথম শুনি শ্রীমৎ ভারত ব্রহ্মচারী ও তাঁহার আশ্রমের কথা।

তন্মধ্যে আমার অন্যতম সহপাঠী স্বর্গীয় লালমোহনই আমাকে আশ্রমে যাইয়া ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বিশেষভাবে বলিতেন। লালমোহন ব্রহ্মচারীবাবার একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, ব্রহ্মচর্য্য পালন ও যোগাভ্যাস করিতেন। পরবর্ত্তীকালে এই লালমোহন সাধনায় খুব উন্নত হইয়াছিলেন। কথিত আছে ব্রহ্মচারীবাবার দেহত্যাগ সংবাদ পাইবামাত্র লালমোহন আসনঘরে প্রবেশ করিয়া ধ্যানে বসেন এবং পরদিন এই ধ্যানাবস্থায়ই তাঁহাকে বাহির করা হয়। লালমোহনের আত্মা শরীর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে তিনি দ্বারভাঙ্গার মহারাজার বাড়ীতে থাকিয়া ডাক্তারী করিতেন। লালমোহনের সদাচরণ ও সাধনার পরিচয় পাইয়া দ্বারভাঙ্গার মহারাজা রাজবাটিতে তাহার অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কান্দীউড়ার নিকটে বৈরাটি গ্রামে ব্রহ্মচারীবাবার আশ্রম। ব্রহ্মচারীবাবা এতদঞ্চলে মহাপুরুষ বলিয়া প্রখ্যাত। তিনি আদ্যাশক্তি শ্রীশ্রীজগন্মাতার আদেশ ও দর্শন পান; শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচর্য্য উপদেশ ও যোগাভ্যাস শিক্ষা দেন। স্কুলের যুবক ছাত্রদিগকে খুব ভালবাসিতেন। ব্রহ্মচারীবাবা চিরকুমার, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, কঠোর তপস্বী ও মহাযোগী ছিলেন; তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিতেন। সমুন্নত চেহারা আজানুলম্বিত বাহু, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘায়ত চক্ষু, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, চক্ষু হইতে যেন জ্যোতি বাহির হইত। তাঁহার মুখে বৈদিক ঋষিসুলভ একটা শান্ত স্নিগ্ধ করুণাময় ভাব সর্ব্বদা দেখা যাইত।

যোগ, তপস্যা, আশ্রম, গৈরিক বসন ও মুনি ঋষির কথা ও গল্প স্বভাবতঃ আমার খুব ভাল লাগিত। বাংলা নূতন বৎসর উপলক্ষে স্কুল তিন দিনের ছুটি হইবে, এই সময়েই ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম এবং সহপাঠী বন্ধুদের বলিলাম। তাহারা খুব আনন্দিত হইল, বিশেষ করিয়া লালমোহন।

স্কুলের ছুটি হইয়াছে তিন দিনের জন্য। সহপাঠীগণের প্রেরণায় এবং তাহাদের মুখে ব্রহ্মচারীবাবার কথা বার বার শুনিয়া আমার খুব ভাল লাগিয়াছে এবং তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের আগ্রহ জন্মিয়াছে। ছুটির প্রথম দিনেই খুব ভোরে উঠিয়া নিত্যকর্ম্ম—ব্যায়াম, প্রাতঃস্নান ও গীতা অথবা কোন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি যাহা আমাদের দেশকর্ম্মীদের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যকর্ম্ম ছিল—সংক্ষেপে সম্পাদন করিয়া মহাপুরুষ দর্শনোদ্দেশে বাসা হইতে বাহির হইলাম। সবে মাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে—তখনও সূর্য্যকে একখানি রক্তবর্ণ থালার মত দেখাইতেছিল। আদমপুর আমার বাসা হইতে বৈরাটি গ্রামে ব্রহ্মচারীবাবার আশ্রম মাত্র একমাইল দূরে অবস্থিত। মাঝখানে একটি বিস্তৃত মাঠ ও তার মধ্যে একটি বিল—শালিধান্যক্ষেত্র; চৈত্রমাসে বিলটি প্রায় জলশূন্য; সোজা মাঠ ও বিলটি

পার হইয়া বৈরাটি গ্রামে উপস্থিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম আশ্রমের অতিনিকটেই আসিয়াছি, ঐ যে উঁচু বটবৃক্ষটি দেখা যাইতেছে উহাই আশ্রম।

আশ্রমটি বৈরাটি গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে লোকালয় হইতে একটু স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় প্রসিদ্ধ কায়স্থ পত্রনবীশদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ এই বটবৃক্ষটি হরগৌরীরূপে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পাশেই একটি অসংস্কৃত পুরাতন পুকুর। বর্ত্তমানে এই স্থানটি পত্র-নবীশদের শ্মশান। কঠোরতপা, সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মচারীবাবার আশ্রম— অর্থাৎ এই বটবৃক্ষের নীচে কয়েকটি জীর্ণ কুটির, আশ্রমের চারিদিক খোলা, সামান্য পাতাবাহারের গাছে ঘেরা, কিছু ফুলের গাছও আছে। চৈত্রমাস খুব গরম, গাছে পাতা নাই বলিলেই চলে। স্থানটি নীরব নির্জন, আশ্রম প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখিলেই ত্যাগী তপস্বীর পর্ণ-কুটির বলিয়া মনে হয়। আসবাবপত্র কিছুই নাই, রৌদ্রবৃষ্টি হইতে দেহকে রক্ষা করিবার জন্য মাত্র কয়েকটি কুটির বিদ্যমান।

গেরুয়াবস্ত্র-পরিহিতা একটি প্রৌঢ়া মহিলা আশ্রম প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিতেছিলেন। আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া একটু অগ্রসর হইয়া উক্ত মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্রহ্মচারীবাবা কি আশ্রমে আছেন?" তিনি আমাকে বলিলেন যে,—"না, ব্রহ্মচারী আশ্রমে নাই, ও পাড়ায় সুশীলদের (সুশীলানন্দ) বাড়ীতে আছেন।" পরে জানিয়াছিলাম উপরোক্ত মহিলাটিই ব্রহ্মচারীবাবার জ্যেষ্ঠা ভগিনী নিত্যময়ী দেবী, ব্রহ্মচারীবাবার উত্তরসাধিকা। তাঁহার সুদীর্ঘকাল কঠোর সাধনাবস্থায় নিত্যময়ী দেবী খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। নিত্য-ময়ী বিবাহের পর দুইটি শিশু কন্যাসন্তান নিয়া অল্পবয়সেই বিধবা হন এবং তাহাদিগকে লইয়া শ্বশুর বাড়ী হইতে পিত্রালয়ে চলিয়া আসেন। তিনি খুব সাত্ত্বিকস্বভাবা ছিলেন, যেন ভগবদিচ্ছায়ই ব্রহ্মচারীবাবাকে

সাধনায় সাহায্য করিবার জন্যই অকাল-বৈধব্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আশ্রমে আমরা সকলেই তাঁহাকে পিসিমা বলিয়া ডাকিতাম। পিসিমা ব্রহ্মচারীবাবাকে "ব্রহ্মচারী" বলিতেন, কখন কখন "ঠাকুর" বলিতেন।

পিসিমার নির্দ্দেশমত পাড়াতে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সুশীলানন্দের বাড়ী পৌঁছিয়া ব্রহ্মচারীবাবাকে পাইলাম। বাহিরের দিকের একটি ঘরে তক্তপোষের উপর তিনি তখনও ঘুমাইতেছিলেন ; তাঁহার সঙ্গে আর একটি যুবক সাধুও ঘুমাইতেছিলেন। আরও দুইজন সাধুকে---রাজকিশোরদা ও ভজনানন্দদাকে—দেখিলাম, তাঁহারা ঘুম হইতে উঠিয়াছেন। একজন ঘরটির এককোণে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন, অপরজন কি করিতেছিলেন তাহা মনে নাই। তিনি আমাকে দেখিয়া বসিতে বলিলেন। বসিবার কিছুই ছিল না, তখন মেজেতেই বসিয়া পড়িলাম। মনটি কি এক ভাবে পরিপূর্ণ এবং একান্ত শ্রদ্ধাবনত ছিল। খানিক পরেই ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে নিদ্রিত যুবক সাধুটি শয্যাত্যাগ করিয়া হাতমুখ ধুইয়া ঘরটির একপাশে ধ্যান করিতে বসিলেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মচারীবাবাও শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং শৌচাদি সম্পন্ন করিয়া আবার আসিয়া তক্তপোষের উপর তাঁহার আসনে বসিলেন। আমি তাঁহাকে চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম, তিনি আমার পৃষ্ঠদেশে হস্তস্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রণাম করিয়া উঠিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, তোমাকে চিনি চিনি বলিয়া মনে হইতেছে।" ব্রহ্মচারীবাবা এই সর্ব্বপ্রথম আমার সঙ্গে কথা বলিলেন। আমি বলিলাম, "না, আপনার সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। তবে কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলে পড়িবার সময় আপনার নাম শুনিয়াছি। আমি সম্প্রতি আদমপুর হইতে আসিয়াছি। তথায় থাকিয়া কান্দীউড়া হাইস্কুলে পড়ি। আমার সহপাঠিগণ আপনার কথা আমাকে খুব বলে ; তাহাদের কথা শুনিয়া আমার খুব

ভাল লাগিয়াছে, তাই আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি।" ব্রহ্মচারীবাবা আমাকে আর কিছুই বলিলেন না। আমার কথা শেষ হইতেই প্রৌঢ় সাধুটি আমাকে আস্তে আস্তে বলিলেন,—"ব্রহ্মচারীবাবা যখন বলিলেন যে, তিনি আপনাকে চিনেন, তখন কি আর 'না' করিতে হয়। তিনি আপনাকে চিনেন—ইহার হয়ত কোন অর্থ আছে।" আমি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলাম না। বাস্তবিক আমার জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই ছিল না। শুধু ভাল লাগে এই বলিতে পারিতাম। কি এক শ্রদ্ধাভক্তিতে ও এক দিব্য প্রভাবে আমার মনপ্রাণ অভিভূত। তারপর যুবক সাধুটি ধ্যান ভাঙ্গিলে সেইভাবে বসিয়াই একটি সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিলেন—পরে জানিলাম ইহা শ্রীশ্রীগুরুগীতা স্তোত্র, সুর ধরিয়া আবৃত্তি করিলেন—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
বিন্দুনাদৈকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং পরমাত্মস্বরূপকম্।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব প্রণমামি জগন্ময়ম্॥
ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্॥

একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদাসাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং ত্বং নমামি।।
ইত্যাদি
শ্রীশ্রীগুরুগীতা।

তিনি এই শ্রীশ্রীগুরুগীতা সমগ্রটি কণ্ঠস্থ পাঠ করিলেন। ঘরটি পূর্ণ নিস্তব্ধ রহিল। মহাপুরুষের সম্মুখে আমার শ্রদ্ধাবনত মন-প্রাণ যেন কিসের জন্য আকাঙ্ক্ষিত—তাহা জানি না। আমি সংস্কৃত একটু একটু বুঝিতে পারিতাম, গুরুগীতাস্তোত্র এই প্রথম শুনিলাম। শুনিতে শুনিতে আমার মন যেন উর্দ্ধমুখী হইয়া উঠিল। কি যেন এক অজানা জগতের বা চেতনার সন্ধান পাইলাম, যাহার সম্বন্ধে ইহার পূর্ব্বে আমি একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলাম। শুধু যে বুঝিলাম তাহাই নয়—এই অধ্যাত্ম তত্ত্বকে জীবনের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য—এইরূপ ধারণাও জন্মিল।

এই যুবক সাধুটির নাম শ্রীমৎ শান্তিদানন্দ। সকলেই শান্তিদা বলিয়া ডাকে। তাহাকে আমার খুব ভাল লাগিল। আমিও তাহাকে শান্তিদা বলিয়া সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"শ্রীশ্রীগুরুগীতা-স্তোত্র এই যে "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ এবং ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং" ইত্যাদি বাক্য শুনিলাম ইহার মর্ম্ম আমাকে একটু বুঝাইয়া বলুন। শান্তিদা আমার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া এই উচ্চ ভাগবত ও অধ্যাত্মবিষয়সমূহ খুব সহজ সরলভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে এই আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক আলোচনাটি আমার খুব ভাল লাগিল। শুনিলাম ব্রহ্মচারীবাবা শান্তিদাকে ইঙ্গিতে বলিলেন যে আমি ছেলেমানুষ, একদিনে এত উচ্চ অধ্যাত্মতত্ত্বকথা আমার সঙ্গে কহিলে আমার মাথা ধরিতে পারে ইত্যাদি। শান্তিদা আমাকে দেখাইয়া ব্রহ্মচারীবাবাকে বলিলেন, "ইনি এসব তত্ত্ব বেশ ধরিতে ও বুঝিতে

পারেন।" খানিকক্ষণ এই সব আধ্যাত্মিক আলাপ আলোচনা করিয়া শান্তিদার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হইল। আমি স্কুলের ছাত্র, অল্পবয়স্ক, এবং অধ্যাত্ম ও ভাগবত বিষয়সকল জানিতে খুবই আগ্রহশীল দেখিয়া তিনিও আমাকে ভালবাসিলেন। ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গী এই সাধুগণের মধ্যে শান্তিদাই অগ্রণী, বেশ বুদ্ধিমান, বিচারশীল মানুষ, শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনা করেন, আসন প্রাণায়াম ধ্যানধারণাদি করেন। তজ্জন্য সকলে তাঁহাকে বেশ ভালবাসেন ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন।

এই সামান্যক্ষণ সৎসঙ্গে ও সদালাপে কাটাইয়া আমার চিত্তের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনার ও ভাগবতভাবের বেশ একটা ছাপ পড়িয়া গেল ; এই মহাপুরুষ ও সাধুদিগকে ভাল লাগিতে লাগিল, যেন তাঁহারা আমার কত আপনার ! সেইদিনই মনে মনে স্থির করিলাম যে সৌভাগ্যক্রমে যখন এমন মহাপুরুষের দর্শন পাইলাম এবং তাঁহার কৃপায় এমন নিগূঢ় ভাগবততত্ত্ব ও অধ্যাত্মচেতনার সন্ধান পাইলাম এখন হইতে সর্ব্বাগ্রে এই তত্ত্বই শিক্ষালাভ করিতে হইবে, জীবনের মধ্যে মূর্ত্ত করিতে হইবে, তজ্জন্য এই মহাপুরুষের নিকটেই দীক্ষা লইব, শান্তিদাকে আমার অন্তরের কথা জানাইয়া ব্রহ্মচারীবাবাকে ইহা বলিতে এবং কৃপাপূর্ব্বক আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে বলিলাম। শান্তিদা আমার অল্প বয়স দেখিয়া দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে প্রথম একটু যেন নিরুৎসাহভাবে বলিলেন যে, আমার বাবার অনুমতি দরকার। তখন আমি বলিলাম আমার বাবা খুব ভাল লোক, আমাকে খুব ভালবাসেন এবং সৎকার্য্যে সর্ব্বদা উৎসাহিত করেন, মহাপুরুষের কাছে দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিলে তিনি আনন্দিতই হইবেন। শান্তিদা আমার খুব আগ্রহ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন যে, ব্রহ্মচারীবাবাকে আজই বলিবেন। পরদিন মহাবিষুব সংক্রান্তি, হিন্দুর বাড়ী, সৌভাগ্যক্রমে এমন মহাপুরুষ বাড়ীতে উপস্থিত—সুশীলদা খুব সকালেই পূজার্চ্চনা সম্পন্ন করিলেন,

প্রাতঃকালীন ভোগ দেওয়া হইল এবং প্রসাদ পাইবার জন্য আমাকে ডাকিলেন। কিন্তু আমি বলিলাম যে, ব্রহ্মচারীবাবার নিকট আজ দীক্ষা গ্রহণ করিব, তাই উপবাসী থাকিব, দীক্ষার পর প্রসাদ পাইব। সুশীলদা ইহা শুনিলেন না, বলিলেন ব্রহ্মচারীবাবার কাছে প্রসাদ পাইয়াও দীক্ষা লওয়া যায়, ইহাতে কোন দোষ হয় না—এখানে ঐরূপ কোন বিধিনিষেধ নাই। সুশীলদার কথা শুনিয়া আমার বড় ভাল লাগিল। আমি প্রাতে প্রসাদ পাইলাম। সকাল হইতেই আমার অত্যন্ত ভাল লাগিতেছিল ইঁহাদের সঙ্গ এবং ইঁহাদের কথাবার্ত্তা।

গতকল্য হইতে ভাবিতেছি শ্রীশ্রীগুরুদেবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিতে কতকিছু লাগে শুনিয়াছি,—গুরুদেবকে বস্ত্রদান, গুরুপূজা ও গুরুদক্ষিণা ইত্যাদি। কিন্তু আমার কাছে তো একপয়সাও নাই এবং আমি যে দীক্ষা লইব তাহা ভাবিয়াও আসি নাই। সুশীলদাকে বলিলাম, আমি যে আজ দীক্ষা গ্রহণ করিব বলিতেছি কিন্তু আমার কাছে তো টাকা পয়সা কিছুই নাই। সুশীলদা অতি সহজভাবে বলিলেন যে, ব্রহ্মচারীবাবার কাছে দীক্ষা লইতে কিছুই লাগে না। একথা শুনিয়া আমার আরও ভাল লাগিল। আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হইলাম। সুশীলদা নামে ও স্বভাবে বাস্তবিক সুশীল—যেমন সরল প্রকৃতি তেমনি মিষ্টভাষী। লোককে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়া অতি সহজে আপনার করিয়া লইতে সুশীলদার মত দ্বিতীয় কেহ ছিল না। তাঁহার সুমিষ্ট গলার ভক্তিপ্লুত গান ও সুর হৃদয়ের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিত। অতিসহজেই তাঁহার অন্তরের পরিচয় পাইয়াছিলাম। ব্রহ্মচারীবাবার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে সুশীলানন্দ ছিলেন একজন।

মহাবিষুব সংক্রান্তি দিন—মধ্যাহ্নে স্নানাদি সারিয়া সুশীলদার ঠাকুরঘরে ব্রহ্মচারীবাবা প্রবেশ করিলেন এবং খানিকক্ষণ পরে আমাকে ডাকাইলেন দীক্ষা গ্রহণের জন্য। আমি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর-বিগ্রহাদির সম্মুখে ব্রহ্মচারীবাবার পাশেই একখানি কুশাসনে আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি বসিলাম এবং আমাকে যথাবিহিত আচমনাদি করাইয়া একটু স্থির হইতে বলিলেন। তখন আমার মনপ্রাণ কি এক অজানা দিব্য প্রভাবে স্বভাবতঃই শান্ত ও শ্রদ্ধা-বনত ছিল। আমি নিবিষ্টভাবে পরম শ্রদ্ধালু চিত্তে বসিয়া রহিলাম। একটু পরে ব্রহ্মচারীবাবা আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া আমার বাম কর্ণের মধ্যে ব্রহ্মগায়ত্রী ও মূলমন্ত্র তিনবার করিয়া বলিলেন; প্রত্যেকবারই খুব জোরে জোরে শ্বাস টানিতেছিলেন—যেন কুম্ভক করিয়া সিদ্ধগায়ত্রী ও সিদ্ধবীজমন্ত্রগুলি, খুব শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক, আমার কর্ণের মধ্যে উচ্চারণ করিতেছিলেন। মন্ত্র দেওয়া হইলে পরে, ব্রহ্মচারীবাবা ফুলের সাজি হইতে কয়েকটি ফুল লইয়া আমার হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "এই ফুল কয়টি আমার হাতে দিয়া প্রণাম কর।" আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহাই করিলাম। ঋষিতুল্য মহাপুরুষ হয়ত জানিতেন যে, আমার হাতে কিছুই নাই। শ্রীগুরুদেবকে দক্ষিণাদি দিতে হয়, ইহা যদিও বাহ্যিক বিষয় এবং তাঁহার কাছে ইহার কোনই মূল্য ছিল না, তথাপি তিনি নিজেই আমার হাতে ফুল তুলিয়া দিয়া, আবার তাহাই গ্রহণ করি-লেন। এইভাবে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিতুল্য মহাশান্ত ও করুণাময়, প্রেমময় ব্রহ্মচারীবাবা দীক্ষাদানে আমাকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিলেন। মুগ্ধের মত তাঁহার শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করিলাম; মুখে কোন কথা আসিল না, আপনা হইতেই সব কিছু হইয়া গেল। সেবার ছুটির তিন দিন মাত্র তাঁহার দিব্য সঙ্গে রহিলাম। এই প্রথম গুরুসঙ্গ, কি অপূর্ব্ব শান্তি ও আনন্দে কাটিল, কি যে অনুভব করিলাম এবং কিসের যে সন্ধান পাইলাম তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে পারিব না। পরবর্ত্তী-কালে পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যোগদানের পর ইহা বুঝিতে পারি-য়াছি এবং ভাষাও পাইয়াছি; শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার ভাষায় ইহাকেই

বলে "A change of consciousness" অর্থাৎ চেতনার পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর। ইহাই প্রকৃত দীক্ষার অর্থ। যদিও পণ্ডিচেরী আশ্রমে বাহ্যিক দীক্ষাদি কিছুই নাই কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার আধ্যাত্মিক প্রভাবে এমনই একটি দিব্য আবহাওয়া ও দিব্যশক্তির চাপ আছে যে, এ-আশ্রমে তাঁহাদের দিব্য সংস্পর্শে আসিলে ধীরে ধীরে পুরাতন চেতনার ও পুরাতন জীবনের পরিবর্ত্তন আপনা হইতেই কি ভাবে হইতে থাকে তাহা বেশ অনুভব করা যায়। আমি ইহা খুবই অনুভব করিয়াছি। দীক্ষাকালে ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে যে তিনদিন ছিলাম, তাহা আমার চেতনার ও জীবনের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল তাহারই টানে আজ পর্য্যন্ত উজান বহিয়া চলিয়াছি।

এই যে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল, ইহা শুধু আমার অন্তরে নয়—ব্রহ্মচারীবাবার কাছে দীক্ষা গ্রহণের পর মাসখানেকের মধ্যেই আমাদের পরিবারে, সংসারে ভীষণ পরিবর্ত্তন আসিল—সব ওলট্‌পালট্ হইয়া গেল। আমার সাংসারিক বন্ধনচয় আপনা হইতেই খসিয়া পড়িতে লাগিল। প্রকৃত মহাপুরুষের স্পর্শের প্রভাবে কিরূপ অঘটন সব ঘটে যদি ঠিক ঠিক ভাবে তাহা জীবনের মধ্যে গ্রহণ করা যায়!

দীক্ষাগ্রহণের দিনই ব্রহ্মচারীবাবা শান্তিদাকে বলিয়া দিলেন আমাকে আসন, নাড়ীশুদ্ধি ও প্রাণায়াম এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ শিখাইয়া দিতে এবং ব্রহ্মগায়ত্রী ও মূলমন্ত্র একটি কাগজে লিখিয়া দিতে। বিকালেই শান্তিদা আমাকে বিশেষ কয়েকটি আসন, মুদ্রা ও নাড়ীশুদ্ধি এবং প্রাণায়ামের কৌশল শিখাইয়া দিলেন এবং কি ভাবে জপ করিতে হইবে তাহাও আঙ্গুলে জপ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। আমি অতিশয় আগ্রহসহকারে সব ক্রিয়াকলাপ শিখিয়া লইলাম। আরও একটি দিন, অর্থাৎ ১লা বৈশাখ নূতন বৎসর, ১৩২৫ সন সেখানে রহিয়া নতন সাধনা ও নূতন জীবন আরম্ভ করিয়া সেবারের মত নিজ আবাসে

ফিরিয়া গেলাম। ফিরিয়া খুব আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত যথারীতি সাধনার ক্রিয়াকলাপ করিতে লাগিলাম। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের পড়াশুনাও চলিল। দুই তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেলে একদিন বাড়ী হইতে বাবার চিঠি পাইলাম যে ঠাকুরমা অত্যন্ত পীড়িতা, মরণাপন্ন অবস্থা, হয়ত এবার আর বাঁচিবেন না, আমাকে দেখিতে চান। পরদিনই প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে বাবার চিঠি দেখাইয়া ছুটি লইয়া বাড়ীতে রওনা হইলাম। ঠাকুরমাকে জীবিতই পাইলাম, যেন আমাকে দেখিবার জন্যই বাঁচিয়া ছিলেন। আমাকে দেখিয়া পরদিনই তিনি মারা গেলেন। খুব বৃদ্ধা হইয়াছিলেন। শৈশব কালেই আমরা মা হারাইয়াছিলাম এবং এই ঠাকুরমাই আমাদের মানুষ করিয়াছিলেন। বাবা ঠাকুরমার একমাত্র ছেলে এবং শ্রাদ্ধের অধিকারী। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠাকুরমা মারা যাইবার চতুর্থ দিনেই বাবার জ্বর হইল হবিষ্যান্নের মধ্যেই। জ্বর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একাদশ দিনে বাবা ঠাকুরমার সম্পূর্ণ শ্রাদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না। অন্য ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি দ্বারা শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। ঠাকুরমা মারা যাইবার উনিশদিন পর বাবাও মারা গেলেন। ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণের মাস দেড়েকের মধ্যেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটিল। আমার দীক্ষা গ্রহণের কথা বাড়ীতে আসিয়াই বাবাকে বলিয়াছিলাম এবং বাবা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "খুব ভাল করিয়াছ।" আমার বেশ মনে আছে যে বাবা মারা গেলে আমি তখন বলিতাম, "আমার বাবা মারা গিয়াছেন সত্য কিন্তু আমি অন্য এক 'বাবা' পাইয়াছি।" দীক্ষাকালে ব্রহ্মচারীবাবার সেই তিনটি দিনের প্রভাব আমার উপর নানারূপে বিস্তর কাজ করিয়াছিল।

আমরা পাঁচ ভাই, আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। মায়ের অভাবে ঠাকুরমাই আমাদের মানুষ করিয়াছিলেন। তাই ঠাকরমা ও বাবা পর পর মারা যাওয়াতে আমাদের আর কোন অভিভাবক রহিল না। আমার বয়স

তখন উনিশ বা কুড়ি হইবে। আমার উপরেই পড়িল সংসারের সকল দায়িত্ব, অথচ আমি সংসার সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ। বাবা সামান্য কিছু জমি জমা রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে কোন প্রকারে অন্নের ব্যবস্থা হইতে পারিত। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জানা গেল যে তাঁহার প্রায় দুই হাজার টাকা কর্জ আছে। এ বিষয়ে আমি কিছুই জানিতাম না। বাবা ঠাকুরমার শ্রাদ্ধ ঋণ করিয়াই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। প্রথমে ঠাকুরমার মৃত্যু ও তাঁহার শ্রাদ্ধ, তারপর বাবার অসুখ; তাঁহার মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ। অতিকষ্টে বাবার অসুখের সময় শুশ্রূষার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সঙ্গতি নাই, চিকিৎসা হইল না। শ্রাদ্ধ যাহা হইল, তাহা কোন প্রকারে অশৌচমুক্ত হওয়া মাত্র। অর্থাভাবে ভীষণ কষ্টে পড়িলাম। সে-বৎসর আমাদের প্রচুর ধান হইয়াছিল। টাকায় এক মণ ধান বিক্রী করিতাম। আত্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসীদের উপদেশে মুসলমান গৃহস্থদের কাছে সুদের পরিবর্ত্তে জমি বন্ধক দিয়া ঋণের সুদ বন্ধ করিলাম। এইভাবে হিন্দুমহাজনদের হাত হইতে উপস্থিত রক্ষা পাইলাম। এই দলিলপত্র সম্পাদন করিতে আমাকে কি যে বেগ পাইতে হইয়াছে! ভাইদের মধ্যে আমিই একমাত্র সাবালক, ছোট ভাইয়েরা সকলেই নাবালক। নাবালকের সম্পত্তির ব্যবস্থা করা বড়ই ঝঞ্ঝাট। তখন হইতেই এই স্বার্থসর্ব্বস্ব ও অসত্যপূর্ণ সংসারের স্বরূপ বুঝিতে আরম্ভ করিলাম। হৃদয়ে বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। ব্রহ্মচারীবাবার সেই দীক্ষা ও মাত্র তিনটি দিনের পুণ্য-সঙ্গ আমার এই ঘোর বিপর্য্যয়ের দিনে ধ্রুব তারার মত সর্ব্বদা স্মৃতিপটে উজ্জ্বল ছিল। তাঁহাকে আমার এইসব বিপদাপদের সংবাদ দিবারও সুযোগ পাই নাই—তাই মানিয়া লইয়াছিলাম যে, তাঁহারই ইচ্ছায় সব কিছু ঘটিতেছে। পৈতৃক ঋণের আপাততঃ একটা ব্যবস্থা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইল। আমি বিপ্লবী-

দলভুক্ত, আমার বিরুদ্ধে নানা গুরুতর অভিযোগ। আমাদের সংসারের এই ভীষণ বিপদের সময় একদিন শেষ রাত্রিতে পুলিস বাড়ী ঘেরাও করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাশ করিল; কিছু পাইল না বটে, কিন্তু অভিভাবকশূন্য নিরাশ্রয়, নাবালক ভাইদের নিকট হইতে আমাকে ছাড়াইয়া লইয়া গেল। আমি গ্রেপ্তার হইয়া ময়মনসিংহ জেলে আবদ্ধ রহিলাম। ১৯১৯ সনের জানুয়ারী মাস হইবে। মাসাধিককাল আমাকে ময়মনসিংহ জেলে রাখিয়া পরে আমাকে পশ্চিম বঙ্গের কোন স্থানে বিনা বিচারে আটক রাখে। আমার লেখাপড়া এইখানেই শেষ হইল।

দীক্ষা গ্রহণের অল্পদিন পরেই ঠাকুরমা ও বাবার পরপর মৃত্যু, অর্থাভাব, ঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদি করিতে খুব ব্যস্ত ছিলাম। যোগাভ্যাস—আসন, প্রাণায়াম, ধ্যানধারণা, ভগবদুপাসনা, প্রার্থনাদি রোজই কিছু কিছু করিতাম, কিন্তু যেভাবে করা প্রয়োজন তাহা হইয়া উঠিত না। ময়মনসিংহ জেলের সেলে ঢুকিয়াই যেন একটা স্বস্তি বোধ করিলাম। মনে হইল যেন আমি সর্ব্বদায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছি, সাংসারিক দায়িত্ব, গুপ্তসমিতির দায়িত্ব সব কিছু হইতে।

আমি রাজবন্দী, জেলে স্নানাহার নিদ্রা ব্যতীত আমার কোন কাজ ছিল না। সাধনা করিবার যথেষ্ট সময় পাইয়াছিলাম। প্রাতে ও সন্ধ্যায় কতকগুলি আসন অভ্যাস করিতাম। নিয়মিত তিন চার বার নাড়ীশুদ্ধি, প্রাণায়াম ও ধ্যান করিতাম এবং অধিকাংশ সময় জপ ও প্রার্থনায় কাটাইতাম। শ্রীগুরুমূর্ত্তিই আমার ধ্যেয় ছিল। এইরূপে দিন কয়েক বাদেই একদিন ভোর রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম যে শ্রীগুরুদেব আমাকে তাঁহার বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আমার সঙ্গে শুইয়া আছেন আর আমার সমস্ত সত্তায় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্রোত বহিয়া যাইতেছে। এই আনন্দাবেগে আমি জাগিয়া উঠিলাম; দেখিলাম

প্রভাত হইয়া গিয়াছে। তারপরও সারা প্রভাতটি ব্রহ্মচারীবাবার প্রেমালিঙ্গনের আনন্দধারাটি আমার অন্তরের মধ্যে প্রবাহিত ছিল।

বিছানা হইতে উঠিয়া যথারীতি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়াছি। মন, প্রাণ প্রশান্ত ও প্রফুল্ল। এমন সময় জনৈক আই, বি, অফিসার আসিয়া আমাকে সেলের বাহিরে জেলের মধ্যে কোন অফিস রুমে নিয়া গেলেন। সেখানে আরও কয়েকজন অফিসার ছিলেন। আমাকে একটি চেয়ারে বসিতে বলিলেন এবং আমি বসিলাম। তাহারা চার পাঁচ জন আমাকে ঘিরিয়া বসিলেন এবং গুপ্ত সমিতির নানা প্রকার তথ্য জানিবার জন্য আমাকে তাহারা উপর্য্যুপরি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমার নিকট হইতে কোন স্বীকারোক্তি না পাইয়া ঘন্টা দুই পরে আমাকে আবার সেলে পাঠাইয়া দিলেন। পর সপ্তাহেও একদিন ভোর রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থায় ব্রহ্মচারীবাবা আমাকে প্রেমালিঙ্গনে বুকে জড়াইয়া আমার সঙ্গে শুইয়া আছেন, সে যে কি আনন্দানুভব—ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, আর যেন পূর্ণ জাগ্রত ও জীবন্ত অনুভব! সেই আনন্দাবেগে জাগিয়া উঠিলে মনে হয় উহা স্বপ্নানুভূতি। ঠিক সেই দিনও তেমনিভাবে প্রাতে জনৈক আই, বি, অফিসার আসিয়া সেল হইতে আমাকে তাহাদের অফিসে নিয়া গিয়াছিলেন এবং নানারূপ প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পরে আমাকে সেলে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পরে লক্ষ্য করিয়াছি যে, যেদিনই ব্রহ্মচারীবাবাকে স্বপ্নে এই প্রকার দর্শন ও অনুভব করিতাম সেই দিনই উক্ত আই, বি, অফিসারগণ আমাকে ডাকাইতেন ও স্বীকারোক্তির জন্য নানা প্রশ্নাদি ও জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন, আবার আমাকে সেলে পাঠাইয়া দিতেন। মাসাধিক কাল ময়মনসিংহ জেলে ছিলাম, এইরূপ ঘটনা চার পাঁচ দিন ঘটিয়াছিল। প্রথমদিন একজন আই, বি, অফিসার জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাহার মনোমত উত্তর না পাওয়াতে চেয়ার হইতে উঠিয়া আমাকে একটা

পদাঘাত করে ; ইহার পরে আর কোনদিন, কোন অফিসার আমাকে কোন প্রকার শারীরিক অত্যাচার বা কোন প্রকার ভয় প্রদর্শন করে নাই। ইহাতেই আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলাম যে প্রেমময় শ্রীগুরুদেবের কৃপা ও শক্তি সর্ব্বদা আমাকে সংরক্ষণ করিতেছে।

ময়মনসিংহ হইতে আমাকে কলিকাতা আলিপুর জেলে পাঠান হইল। কিন্তু আলিপুর জেলের প্রকাণ্ড গেটটি পর্য্যন্তই আমার দর্শন ঘটিল ; পরদিনই আমাকে ২৪পরগণার অন্তর্গত কোন থানায় আটকে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু এই অন্তরীণ অবস্থায় আমাকে বেশীদিন থাকিতে হয় নাই, কারণ যুদ্ধের শেষভাগে আমি গ্রেপ্তার হই Defence of India Act অনুসারে এবং ১৯২০ সনের জানুয়ারীতেই মুক্তিলাভ করি।

প্রায় এক বৎসর বন্দী ছিলাম। অন্তরীণের নির্জনবাসে আমি সাধনায় খুব নিবিষ্ট হইয়াছিলাম। এই সময় একটি অপূর্ব্ব স্বপ্নদর্শন হইয়াছিল। দেখিলাম একটি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল গোলাকার জ্যোতি, যেন পূর্ণিমার চন্দ্র—ইহার এক কোণে রাহু সামান্য গ্রাস করিয়াছে—ইহার নীচে জ্যোতির্ম্ময় বাংলা অক্ষরে লিখা "পূর্ণ ব্রহ্ম"। এই দৃশ্যটির ইঙ্গিত বা গূঢ়ার্থ কি, তখন কিছুই বুঝি নাই। এই সময়ের সাধনার ফলে আমার শরীর, মন ও প্রাণের বিশেষতঃ জীবনের লক্ষ্যের একটা পরিবর্ত্তন বোধ করিলাম। একথা নিজে নিজেই বুঝিলাম যে, ভারত-বর্ষের অভ্যুত্থান রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব আন্দোলনের হয়ত প্রয়োজন ছিল কিন্তু তাহার কাজ শেষ হইয়াছে। বিপ্লবপন্থায় ও বিপ্লব সাহায্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে না। ভাগবত ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য হয়ত অন্যরূপ। ভাগবতী শক্তি ও যোগশক্তি সহায় না হইলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অভ্যুত্থান সুদূরপরাহত। সরকার বিপ্লবপন্থীদের এমনভাবে নির্য্যাতন ও নিষ্পেষণ করিয়াছে,

এমনভাবে তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়াছে যে, আর তাহারা সহজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না।

১৯২০ সনের জানুয়ারী মাসে আমাদিগকে কলিকাতা হইতে বিনা-সর্ত্তে মুক্ত করিয়া দিল। মুক্ত হইয়াই আমি স্থির সঙ্কল্প করিলাম যে, ব্রহ্ম-চারীবাবার সঙ্গে দেখা করিব এবং দেশের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা ও আমার ব্যক্তিগত জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁহার কি উপদেশ তাহা জিজ্ঞাসা করিব। তাঁহাকে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করিয়া আর কিছুই করিব না, অন্ধের মত বেতালাছন্দে আর চলিব না। জীবনকে আর বৃথা বিপন্ন করিব না। তিনি তো সত্যদ্রষ্টা, ত্রিকালজ্ঞ ঋষি-তুল্য এবং ভগবানের প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত মহাপুরুষ। যেদিন মুক্ত হইলাম, সেই রাত্রেই আমি কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহ রওনা হইলাম। প্রায় বৎসরাধিককাল ব্রহ্মচারীবাবার সহিত সাক্ষাৎ নাই। জানিনা তিনি এখন কোথায় আছেন, তবে বৈরাটি—গৌরীআশ্রমেই প্রথমে উপস্থিত হইব।

আমার দীক্ষা গ্রহণের পরে এবং গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে বোধহয় দুই একবার ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। আমাদের গুপ্তসমিতির কথা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহাকে কখনও কিছু বলি নাই। যুগান্তর ও অনুশীলন দুই সমিতির ছেলেরাই তাঁহার শিষ্য ছিল। ব্রহ্মচারী-বাবাকে, তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাবের জন্য সকলেই মহাপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি কোন দলেরই ছিলেন না। তবুও আলি-পুরে তখনকার পুলিস কমিশনার কিড্ সাহেব আমাকে আটকের আদেশ দিবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, "though nothing was found, you are strongly suspected ; and almost all the disciples of Bharat Brahmachari are anarchists." অর্থাৎ তোমার কাছে যদিও কিছু পাওয়া যায় নাই, তথাপি তুমি খুবই

সন্দেহের পাত্র ; ভারত ব্রহ্মচারীর শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই বিপ্লবী।" অবশ্য একথা সত্য যে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কান্দীউড়া স্কুলের আমাদের সহকর্মী উপেন্দ্র সরকার, নগেন্দ্র ধর—নওপাড়া, স্বর্গীয় শচীন্দ্র রায়—খালিয়াজুরী, সুরেশ সরকার—হাসানপুর, যোগেশ চৌধুরী—খারুয়া, লাখু ঘোষ—খারুয়া, প্রভৃতি রাজনৈতিক কারণে অন্তরীণ ছিল এবং কেহ কেহ সন্দেহের পাত্রও ছিল। ব্রহ্মচারীবাবাকে বিপ্লবী যুবকগণ খুব ভালবাসিত এবং তিনিও উহাদিগকে খুব ভালবাসিতেন। এই ভালবাসা এবং তাঁহার সত্যদৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের বলে তিনি এই যুবকদের চেতনার মোড় ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাদের অনেকেই সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষা পাইয়া সাধনা এবং অধ্যাত্ম-জীবন গ্রহণ করিয়াছে।

পরদিন বৈরাটি গৌরীআশ্রমে উপস্থিত হইয়া জানিলাম ব্রহ্মচারী-বাবা আশ্রমেই আছেন। আমার খুবই সৌভাগ্য—যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঠিক হইল। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে আমাকে মোটেই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিতে হইল না। সাধারণতঃ তাঁহাকে পাওয়া সহজ নয়, তিনি কখন কোথায় থাকেন তাহা একান্তই অনিশ্চিত। তাঁহার উপদেশ এবং আদেশই সর্ব্বাগ্রে এখন আমার প্রয়োজন—আমার মনে আর অন্য কোন চিন্তা নাই। ব্রহ্মচারীবাবা ঠাকুরঘরের বারান্দায় বসিয়া আগন্তুক কয়েকটি ভক্তের সঙ্গে কি আলাপ করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিলাম। তিনি আমাকে হঠাৎ উপস্থিত হইতে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আশ্রমের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল যে আমি মুক্তি পাইয়া অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অনেকেই আমাকে দেখিতে আসিল। আমি ব্রহ্মচারী-বাবার সামনে বসিয়াছিলাম। একবৎসর পশ্চিমবঙ্গে অন্তরীণ অবস্থায় বাস করায় আমি পরিষ্কার কলিকাতার ভাষায় কথা বলিতে

অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম। পূর্ব্ববঙ্গের পাড়াগাঁয়ে আমার নূতন অভ্যস্ত কলিকাতার ভাষা শুনিয়া সকলেই হাসিত। আবার আমাদের গ্রাম্যভাষায় কথা বলিতে অভ্যস্ত হইতে আমার বেশ কিছুদিন লাগিল। আগন্তুক ব্যক্তি কে কে ছিলেন এখন মনে নাই। সামান্য দু'চার কথা হইবার পরেই আমি ব্রহ্মচারীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, আপনি শ্রীশ্রীজগন্মাতার সঙ্গে কথা বলেন, তাঁহার দর্শন ও আদেশ পান। আমার গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে আপনাকে আমার মনের কথা খুলিয়া কিছুই বলি নাই, বলার বাধা ছিল। আপনি অন্তর্য্যামী, সবই অবগত আছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল—কিন্তু আমাদের দ্বারা তাহা সফল হইল না। বিপ্লবীদল ও তাহাদের নেতাদিগকে গভর্ণমেন্ট এমনভাবে নিগ্রহ করিয়াছে যে আগামী পনর কুড়ি বৎসরের মধ্যে উহারা মাথা তুলিতে পারিবে না। আমাদের অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। এ-সম্বন্ধে শ্রীমা কি বলেন? আমি আপনার শরণাগত ও আশ্রিত। আমাকে উপদেশ ও আদেশ দিন।"

একটু পরে ব্রহ্মচারীবাবা ঠাকুরঘরের বারান্দা হইতে উঠিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমের ভোগের ঘরের পিছনে কুল গাছের নীচে যে ছোট কুটিরটি ছিল সেখানে গিয়া তাঁহার স্বাভাবিক আসনে বসিলেন। সাধারণতঃ তিনি বীর আসনে বসিতেন। সেখানে আর কেহই ছিল না। বসিয়াই তিনি হাতে ছোট তিনটি তালি দিলেন এবং আমার দিকে চাহিয়া খুব আনন্দের সহিত বলিলেন, "আরে বেটা এই তত্ত্বই ত আমি জানিয়াছি—আমার সিদ্ধিলাভের পর মা আমাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সমস্ত দেবশক্তিসহ পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইয়াছেন, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য। তোমরা কি বল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, সে ত হবেই—আর এই যে

বিপ্লবপন্থীদের কার্য্যকলাপ এও মায়েরই কাজ, মায়ের শক্তিতেই তোমরা এসব করিয়াছ। আমি জানি মা এখন সে-শক্তি উঠাইয়া লইয়াছেন। আমার ইচ্ছা ও উপদেশ যে এখন তোমরা মাকে জান, মায়ের ইচ্ছায় কাজ কর।"

ঋষিতুল্য সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মচারীবাবার মুখে এই অশ্রুতপূর্ব্ব দিব্য বাণী শুনিয়া আমি একেবারে বিস্মিত হইয়া যাই। যে উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের জীবনপণ করিয়া এতকষ্ট করিয়াছি, তজ্জন্য স্বয়ং আদ্যা-শক্তি জগন্মাতা এই মর্ত্ত্যধামে—পৃথিবীতে, আমাদের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছেন—আসিয়াছেন, তিনি স্বয়ং সে কাজ আগে হইতেই আরম্ভ করিয়াছেন—এ তো সম্পূর্ণ আশ্চর্য্যজনক ও নূতন কথা। আর কেহই পূর্ব্বে আমাকে এ-কথা বলে নাই, এ-কথা কখনও শুনি নাই। অতএব শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে বসিয়াই মনে মনে স্থির করিলাম যে, তাঁহার উপদেশ মত মাকে জানিব এবং মায়ের ইচ্ছায় কাজ করিব। আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী হইব, আর সংসারে যাইব না। ব্রহ্মচারীবাবাকে আমার এই সঙ্কল্পের কথা বলিয়া দিলাম। শুনিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না, এবং আমিও তাঁহার কোন উত্তরের অপেক্ষা করিলাম না। সরলভাবে ব্রহ্মচারীবাবার নিকট সব খুলিয়া বলিতে পারিয়া এবং তাঁহার দিব্য বাণী শুনিতে পাইয়া এমন একটা স্বস্তি অনুভব করিলাম যাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। কি এক নূতন জীবন, নূতন চেতনা, ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী পাইলাম, এক নব আশার সঞ্চার হইল। এইভাবে গুরুদেবের আশ্রমে আমার অধ্যাত্ম-জীবন আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রায় বৎসরাধিক কাল অন্তরীণ থাকিয়া বাহির হইয়াছি, বাড়ীতে ছোটভাইদের বিশেষ সংবাদ রাখি না। ব্রহ্মচারীবাবাকে বলিয়া বাড়ীতে গেলাম ভাইদের দেখিতে ও আমার সঙ্কল্পের কথা তাহাদিগকে বলিয়া

আসিতে, তাহারা যেন আমার নিকট আর কোন আশা না করে। মনে মনে বুঝিলাম ইহাই আমার ভবিতব্য। শ্রীভগবান অতিসহজেই আমার সংসার-বন্ধন কাটিয়া দিয়াছেন; শ্রীগুরুদেবের দ্বারা সত্যপথ দেখাইয়া মানবজীবনের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য, ভগবান লাভ—সেই পথে চালাইয়াছেন। বৈরাগ্যও এমন কিছু বুঝিলাম না, সংসার ত্যাগ করিতেও কোন কষ্ট হইল না। যে-সব বাধা ছিল তাহা ভগবান আগেই সরাইয়া নিয়াছেন।

বাড়ীতে গেলে পরে আমাকে দেখিয়া সকলেই খুব খুসী হইল এবং বলাবলি করিতে লাগিল যে আমি সাধু হইয়া গিয়াছি। যদিও আমি তখন পর্য্যন্ত গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া সাধু হই নাই—তবুও আমাকে কি জানি কেন সকলেই সাধু বলিয়া ডাকিতে লাগিল। গ্রেপ্তার হইবার পরে আর মাথার চুল কামাই নাই, তাহাতে একবৎসরে চুল বড় হইয়া গিয়াছিল, এবং পূর্ব্ব হইতেই নিরামিষ আহার আরম্ভ করিয়াছিলাম। আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান রীতিমত করিতেছি—এই অবস্থায় সাদা কাপড়ে থাকিলেও লোকে আমার ব্রহ্মচারীর মত সাত্ত্বিক ভাব দেখিয়া আমাকে সাধু বলিয়া ডাকিত। আমার ভিতরে ও বাহিরে যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিয়া গ্রামের লোক খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং বলিতে লাগিল,"এমন বিপ্লবী কেমন করিয়া সাধু হইয়া গেল।" আমি যে আমার বিপ্লবী জীবনেই মহাপুরুষকে গুরু-রূপে পাইয়াছিলাম এবং দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা তাঁহারা জানিতেন না। বাড়ীতে আসিবার দিন কয়েক পরেই আমার সংসার ত্যাগের সঙ্কল্পের কথা সকলকে বলিলাম। ইহা শুনিয়া তাঁহারা যুগপৎ আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলেন। ছোটকালেই মা মারা যাওয়াতে এবং দীক্ষা গ্রহণের অব্যবহিত পরেই ঠাকুরমা ও বাবা পর পর মারা যাওয়াতে আমার সংসার ত্যাগের পথ আপনা আপনিই

পরিষ্কার হইয়াছিল। ছোট ভাইগণ ছাড়া সংসারে আমার আর কোনই স্নেহ বা আকর্ষণের বস্তু ছিল না। ভগবান তাহাদের নিকট হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া এই এক বৎসর তাহাদের ও আমার মনকে গড়িয়া লইয়াছিলেন; সুতরাং সংসার ত্যাগ করিতে আমার বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই। বাড়ীতে দশ বারো দিন থাকিয়া ভাইদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীগুরুদেবের আশ্রমে চলিয়া আসিলাম, ১৯২০, ফেব্রুয়ারী।

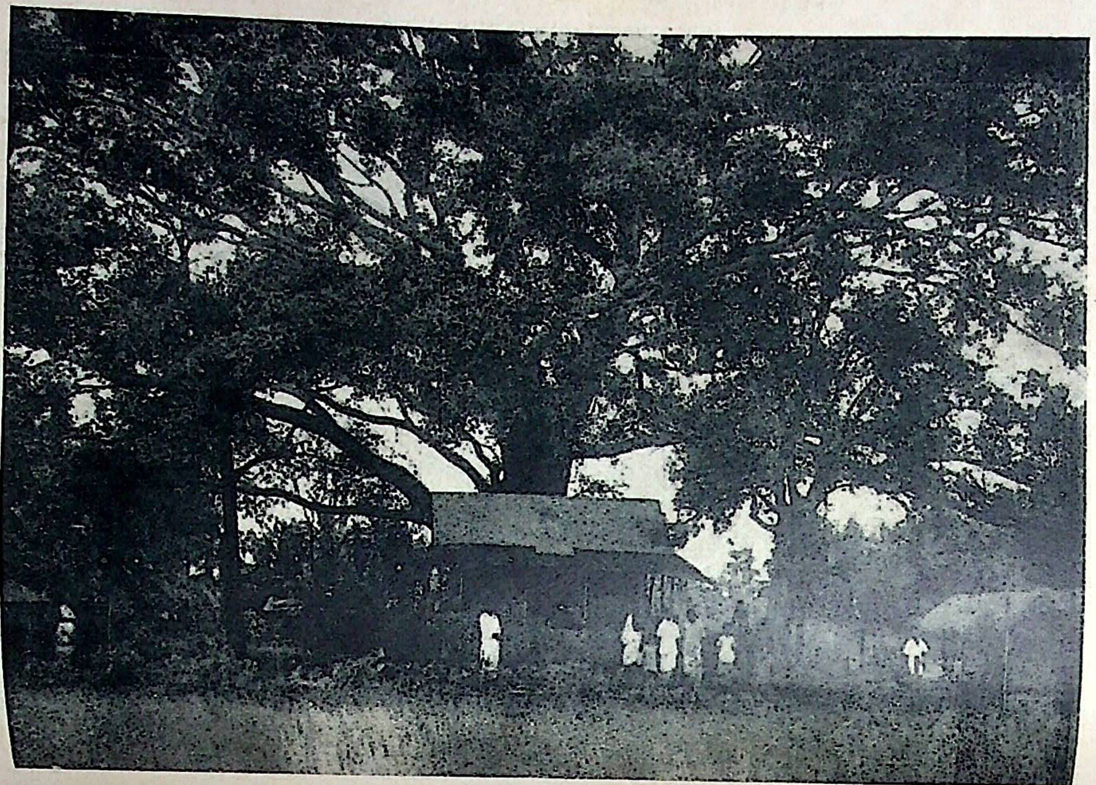
লক্ষ্মীয়া—সিদ্ধাশ্রম ও সাধনা

ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে সর্ব্বদা বহু শিষ্য ভক্ত থাকিতেন এবং তাহারা তাঁহাকে নিজ নিজ গ্রামে ও বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। তাঁহার সঙ্গে এইভাবে পর্য্যটনে থাকিলে একনিষ্ঠভাবে সাধনা ও উপাসনা হয় না। নিত্য নূতন নূতন গ্রামে যাওয়া এবং নূতন নূতন পরিবেশে নূতন লোক সমাগমে আলাপ আলোচনায় এবং বাহ্যিক আনন্দে দিন কাটিয়া যায় কিন্তু একনিষ্ঠ সাধনা হয় না। আমরা তরুণ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ আবার বেশী ধ্যান ধারণা ও সাধনার পক্ষপাতী। তাই আমাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী, আমাদের সাধনার সুবিধার জন্য ব্রহ্মচারীবাবা আমাদিগকে লক্ষ্মীয়া সিদ্ধাশ্রমে রাখিলেন। এখানে আশ্রমে একটি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় ছিল। প্রায় কুড়ি পচিশটি বালক সেখানে থাকিত। তাহাদের শিক্ষা ও পরিচালনার ভার আমাদের উপরই দিলেন। সাধনা ও কর্ম্ম দুইটিই সমভাবে চলিবে। ব্রহ্মচারীবাবা কোন কোন অতিবিবেকী সাধকের জন্য সাময়িকভাবে কর্ম্মহীন একান্ত সাধনা অনুমোদন করিলেও সাধারণতঃ কর্ম্ম ও সাধনা এক সঙ্গে রাখিতেই উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "জগৎ ও কর্ম্ম মায়া এবং মিথ্যা নয়, মায়েরই বিকাশ—জগৎ ব্রহ্ম, কর্ম্ম ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

সিদ্ধাশ্রম স্থানটি প্রাকৃতিক হিসাবে সর্ব্বথা সাধনার উপযোগী। ব্রহ্মপুত্র নদের খাঁড়ির উপর, নীচে মহাশ্মশান তারই উপরে এক অতি প্রকাণ্ড প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ, চারিদিকে জঙ্গল, নির্জন একান্ত ও নীরব। অশ্বত্থবৃক্ষটি পাগলনাথ মহাদেবরূপে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত। গ্রামের দাস পরিবারদের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত বহুপুরাতন এব



চিত্রধাম আশ্রম, মালনী—নেত্রকোণা
(১) শ্রীশ্রীলক্ষ্মীকৃষ্ণ, (২) শ্রীশ্রীদশভূজাদুর্গা (৩) ব্রহ্মচারীবাবার মহাসমাধি



গৌরী আশ্রম—বৈরাটী

১৮১ পৃঃ



শ্রীশ্রীপাগলনাথ দেবালয় : লক্ষ্মীয়া—সিদ্ধাশ্রম

১৬০ পৃঃ



জন্মভূমি ও যোগভূমি—খগদল

দেবালয়। লোকালয় কিছু দূরে। এই প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ ও জঙ্গল-পূর্ণ দেবালয়টিকে ব্রহ্মচারীবাবা পরিষ্কার করাইয়া অতিসুন্দর মনোরম তপোবনে, তপস্যা ও সাধনার উপযোগী স্থানে পরিণত করিয়াছিলেন। কয়েকটি ছোট ছোট কুটির ছিল মাত্র, পাকা ঘর বাড়ী ছিল না। আশ্রমের খাবার ব্যবস্থা দৈনন্দিন ভিক্ষা। কোন মাসিক চাঁদা বা ঐরূপ কোন নিয়মিত আর্থিক সাহায্য কিছুই ছিল না। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ছেলেদের জন্য একটি লম্বা চালাঘর ছিল; তাহাতে থাকিবার ও বিদ্যাভ্যাসের দুই কাজই চলিত,—তখন এখানে শান্তিদানন্দ, মোক্ষদানন্দ, ধীরানন্দ, অবলানন্দ, সরলানন্দ, রামানন্দ, সত্যেন্দ্র রায় (খামারগাঁও) ও আমি (যোগানন্দ) স্থায়ীভাবে থাকিতাম এবং কেদার সরকার, ইন্দুভূষণ মাঝে মাঝে যাতায়াত করিতেন।

ময়মনসিংহ জিলায় কোথায়ও ইহার পূর্ব্বে কোন আশ্রম বা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানই ছিল না। শ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারীবাবাই সর্ব্বপ্রথম এতদঞ্চলে বৈদিক আর্য্যঋষিদের আদর্শে এই সিদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বয়ং অবস্থানপূর্ব্বক শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইদানিং তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাব এতদঞ্চলে চারিদিকে বিশেষ বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে এবং তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ করিয়া এতদঞ্চলে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার কিরূপ প্রভাব ছিল—তাহা সমসাময়িক সিদ্ধ মহাপুরুষ, সাধুসন্ত ও সাধক সাধিকাদের বিদ্যমানতায়ই অনুমান করা যায়; আমরা দেখিতে পাই, ঢাকা বারদীর মহাযোগী শিবতুল্য প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীমৎ লোকনাথ ব্রহ্মচারীবাবা, ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমের পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়, দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, মহাযোগী শ্রীমদ্ গম্ভীরনাথ বাবার শিষ্য সিদ্ধযোগী শ্রীমৎ ময়ূরমুকুটবাবা প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কয়েকটি মহাশক্তিধর মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক প্রভাব ভগবদিচ্ছায়ই

পূর্ব্ববঙ্গের অধ্যাত্ম ও জাতীয়জীবন-সংগঠনে ক্রিয়মাণ ছিল। ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনার কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপরোক্ত মহা-শক্তিশালী মহাপুরুষগণের আধ্যাত্মিকতায় আকৃষ্ট ও প্রভাবান্বিত হইয়া-ছিলেন। স্বদেশ-আত্মার প্রতীক পণ্ডিচেরীর মহাযোগেশ্বর শ্রীঅর-বিন্দের যোগসাধনা ও আধ্যাত্মিক প্রভাব চন্দননগর হইতে প্রচারিত "প্রবর্ত্তক" পত্রিকা দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গের বিপ্লবী যুবক সমাজে সনাতন ধর্ম্ম ও জাতীয়তার তীব্র প্রেরণা দিতেছিল। বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকা-নন্দের নবজাগ্রত বেদান্তের বাণী, কর্ম্মযোগ ও সেবার আদর্শ, জাতীয়-জীবন-গঠনে শিক্ষিত যুবকসমাজ গ্রহণ করিতেছিলেন। এক সময় কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনার পূর্ব্বাঞ্চলে শ্রীহট্ট জিলার প্রসিদ্ধ বিথঙ্গল আখড়ার সিদ্ধযোগী শ্রীমৎ রামকৃষ্ণঠাকুরের আধ্যাত্মিক প্রভাব খুব বিস্তার লাভ করিয়াছিল—তাহার প্রমাণ বহু মঠ, মন্দির ও আখড়া এখনও বিদ্যমান। আমাদের সময়ে সিলচরের অরুণাচল আশ্রম হইতে ঠাকুর দয়ানন্দ এতদঞ্চলে সদলবলে মাঝে মাঝে আসিতেন। তাঁহাদের প্রাণমাতান "প্রাণ গৌরনিত্যানন্দ..." নামকীর্ত্তনে ও উদ্দাম নৃত্যে শিক্ষিত জনসমাজে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এক বিশেষ সাড়া পড়িয়াছিল। জগৎজোড়া শান্তি ও বিশ্বমানব মহামিলনের অগ্রদূত তাঁহাদের "World Peace" ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকা এক নব চেতনা, নব জীবনের হাওয়া প্রবাহিত করিয়াছিল। আসাম—কোকিলামুখ আশ্রম হইতে শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীর যোগ সাধনা ও তপস্যা এবং অধ্যাত্ম ও যোগশাস্ত্রগ্রন্থের বাংলাভাষায় বহুল প্রকাশ ও প্রচার দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিত যুবকসমাজে ব্রহ্মচর্য্যপালন ও যোগাভ্যাসের এক নূতন প্রেরণা প্রবর্ত্তিত হয়। বরিশালের পরম শ্রদ্ধাস্পদ ঋষিতুল্য শ্রীমৎ অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের ভক্তিযোগ গ্রন্থ ও তাঁহার আদর্শ-জীবন শিক্ষিত যুব-সমাজের বিশেষতঃ বিপ্লবপন্থী যুবকদের অত্যন্ত প্রাণের বস্তু

ছিল। ভারতমাতার নবজাগরণে ঐ জিলার শ্রীমৎ মুকুন্দ দাস তাঁহার যাত্রাগানে বাংলার সর্ব্বসাধারণকে অভিনবভাবে দেশাত্মবোধে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধুর তপস্যা ও সাধনা-প্রভাব পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বৃন্দাবনের কঠোরতপা ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ শ্রীমৎ কাঠিয়াবাবার অন্যতম শিষ্য নেত্রকোনাবাসী শ্রীমৎ দ্বারিকতপস্বী তাঁহার গুরুদেব কাঠিয়াবাবার কোন দিব্যবাণী অথবা ইঙ্গিতে পূর্ব্ববঙ্গের তখনকার প্রকট মহাপুরুষগণের মধ্যে কে অবতার ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিতেন। আমাদের গুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবার কাছেও শ্রীমৎ দ্বারিক তপস্বী কয়েকবার আসিয়াছিলেন। হরিদ্বার হইতে শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ মাঝে মাঝে এতদঞ্চলে আসিতেন। তাঁহার তপস্যা-প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক সাধনাপরায়ণ হইয়াছেন। কিন্তু এতদঞ্চলে কোথাও কোন মহাপুরুষ আশ্রমাদিস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং তথায় অবস্থান করিয়া স্বীয় আধ্যাত্মিক প্রভাবে শিক্ষা ও সাধনার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। মনে হয় শ্রীশ্রজগন্মাতার বিশেষ ইচ্ছায়ই শক্তিশালী আধ্যাত্মিক প্রভাব সকল কাজ করা সত্ত্বেও এই দুর্ভাগা জাতির মজ্জাগত গতানুগতিক ধারায় চলার অভ্যাসে, মহাপুরুষগণের প্রভাব কাহারো কাহারো ব্যক্তিগত জীবন সাধনায় উন্নত ও অগ্রসর করাইলেও পূর্ব্ববঙ্গে সনাতন ধর্ম্ম এবং জাতীয়তা প্রতিষ্ঠায় আপাতত বিশেষ কোন কার্য্যকরী হয় নাই।

ব্রহ্মচারীবাবার তপস্যা-প্রভাবে ও সিদ্ধিশক্তিতে জঙ্গলপূর্ণ পাগলনাথ দেবালয় মনোরম 'সিদ্ধাশ্রম' তপোবনে রূপান্তরিত হইল। নানা রংয়ের পাতাবাহার ও ফুলের গাছে ঘেরা ছোট ছোট কুটিরগুলি খুব সুন্দর দেখাইত। যৌবনের প্রারম্ভে, ঋষিতুল্য ব্রহ্মচারীবাবার সান্নিধ্যে, পবিত্র ভিক্ষান্নদ্বারা শরীরধারণ, সদ্‌গ্রন্থপাঠ ও বহুল শাস্ত্রালোচনা, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণা ও তপস্যায় আমাদের সাধন-জীবন বড় সুন্দর

কাটিয়াছিল এবং ইহা হইতেই আমাদের অধ্যাত্ম-জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আমরা যখন এখানে যোগ সাধনায় তন্ময় তখন বাহির জগতে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন খুব প্রবল বেগে চলিয়াছিল। সহর হইতে ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূরে গ্রামাঞ্চলেও এই আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। আমার অনেক পুরাতন বন্ধু এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। আমি গা ঢাকা দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা আমার খোঁজ লইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে বলিলেন, "এখন কি চুপ থাকার সময়?" আমি উত্তর দিলাম "এখন আর আমার ঐসব ব্যাপারে উৎসাহ নাই; সত্যদ্রষ্টা শ্রীগুরুদেবের কাছে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সব বলিয়াছি, এবং এ-সম্বন্ধে তিনি আমাকে যে ভগবদ্‌বাণী শুনাইয়াছেন তাহাতে আমি নিজেকে তাঁহার কাছে সমর্পণ করিয়াছি; তাঁহার আদেশ ও উপদেশ ছাড়া এখন আর আমি কিছুই করিতে পারি না; আপনাদের কথা শ্রীগুরুদেবকে বলিব এবং তিনি কি বলেন পরে জানাইব।" পরে ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে দেখা করিয়া আমার বন্ধুদের অনুরোধ জানাইলাম যে তাহারা আমাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীবাবা বলিলেন, "মা যখন আমাকে আদেশ দিবেন তখন আমরা কাজে নামিব"। বুঝিলাম যে ব্রহ্মচারীবাবা এ অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে মায়ের কোন আদেশ পান নাই, সুতরাং আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

গৌরী-আশ্রম ও তাঁতবয়ন-শিক্ষাদান

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বৈরাটি গৌরী-আশ্রমে ব্রহ্মচারী-বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দেখিলাম যে, গৌরী-আশ্রম একটি স্বদেশী খাদি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বৈরাটি গ্রামে অনেক বস্ত্রশিল্পীর বাস। ময়মনসিংহ জিলা কংগ্রেস কমিটির কর্ত্তৃপক্ষ প্রথম জনকতক যুবক স্বেচ্ছাসেবককে তাঁতের কাজ শিক্ষা করিতে সহর হইতে পচিশ ত্রিশ মাইল দূরে এই গ্রামে পাঠান। এই সব তরুণ কর্ম্মীদের গ্রামে কোথাও খাওয়া থাকার ব্যবস্থা না হওয়ায়, তাহারা স্থানীয় আশ্রমে ব্রহ্মচারীবাবার নিকট আসিয়া তাহাদের অসুবিধার কথা জানাইলে তিনি তাহাদিগকে আশ্রমে প্রসাদ পাইতে ও থাকিতে অনুমতি দিলেন, যদি তাহাদের আশ্রমোচিত যথালব্ধ আহারে কষ্ট না হয়। এই উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবকগণ আশ্রমের কষ্ট স্বীকার করিয়াই নির্ভাবনায় তাঁতের কাজ শিখিতে লাগিলেন। তারপর এই জিলার নানাস্থান হইতে বহু ছেলে এখানে তাঁতের কাজ শিক্ষা করিতে আসিতে আরম্ভ করিল। দেশের যুবক ছেলেদের উৎসাহ ও কষ্ট স্বীকার করিবার ক্ষমতা দেখিয়া ব্রহ্মচারীবাবা তাহাদিগকে তাঁত শিক্ষার জন্য আশ্রমের ব্রহ্মচারী ভিক্ষুকগণ দ্বারা ভিক্ষা করাইয়া বহু তাঁত ও চরকা তৈরী করাইয়াছিলেন। এইভাবে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে করিতে আশ্রমেই একটি বয়ন বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিল। শত শত ছেলে এখানে বিনা খরচে তাঁত-বয়ন শিক্ষা করিতেছিল। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মধ্যে সহস্রাধিক চরকা তৈরী করিয়া বিতরণ করা হইয়াছিল। এবং তাহাদিগকে বিনামূল্যে তুলা দিয়া সূতা কাটাইয়া আনার ব্যবস্থাও

করা হইয়াছিল। সূতার জন্য মজুরী দেওয়া হইত। এইরূপে উৎপন্ন সূতায় ত্রিশচল্লিশটি নানারকমের তাঁতে প্রাথমিক শিক্ষা হইতে ভাল ধুতি সাড়ী বোনার কাজের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল। ব্রহ্মচারীবাবা অসীম ধৈর্য্যের সহিত, শান্তভাবে এই যুবকদিগের শিক্ষা-কার্য্যে সহায়তা করিতেন। আশ্রমবাসী ও গ্রামবাসী শিষ্যভক্তগণকে তিনি এই বয়ন-শিক্ষার কার্য্যে বিশেষ উৎসাহিত করেন। হেমচন্দ্র ব্রহ্মচারী, রাজেন্দ্র, হরিবল-দা প্রভৃতি ব্রহ্মচারীবাবার আদেশে এই বিরাট কার্য্যের জন্য অনেক ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ভিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন রকমে বৃহৎভাবে অর্থ সাহায্য এতদঞ্চলে কোন আশ্রমাদি কার্য্যে কখনও পাওয়া যায় নাই। সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন বৈরাটি গ্রামবাসী শিষ্যভক্তবৃন্দ। তাঁহারা শারীরিক শ্রমের দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য আপন ঘর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তখন গড়ে প্রায় একশত যুবক শিক্ষার্থী সর্ব্বদা থাকিত। একদল শিক্ষালাভ করিয়া চলিয়া যাইত; ইতোমধ্যে নূতন শিক্ষার্থী আসিয়া ভর্ত্তি হইত। ইহাদের থাকার খাওয়ার ব্যবস্থা ও বয়নকার্য্য শিক্ষাদানে, বিস্তর খরচ হইত, উপরন্তু বয়ন শিখাইতে প্রথম প্রথম খুব সূতা নষ্ট হয়—এ-সমস্তই ব্রহ্মচারীবাবা পরিচালনা করিতেন ও অম্লানবদনে ক্ষতিস্বীকার করিতেন—ছেলেরা ইহা বুঝিত; তাই খুব উৎসাহের সহিত তাড়াতাড়ি শিক্ষা করিত। ১৯২১ সন হইতে ১৯২৩ সন পর্য্যন্ত প্রায় দুই বৎসর কি ততোধিক সময় বৈরাটি গৌরী-আশ্রম এবং বৈরাটিগ্রাম একটি বিরাট খাদি প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রহ্মচারীবাবার মুখেই শুনিয়াছি যে, যদি কোন ধনী-ব্যক্তি এই বিরাট বয়ন-শিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করিয়া অর্থ সাহায্য দ্বারা পরিচালনা করিতেন, তবে ইহা একটি খাদি উৎপাদনের বিরাট কেন্দ্র হইয়া উঠিত। কারণ প্রাথমিক শিক্ষাকার্য্যে যে ব্যয় ও

ক্ষতি হইয়াছিল তাহা তো ব্রহ্মচারীবাবা আশ্রমবাসী ভিক্ষুকগণ দ্বারা মুষ্টিভিক্ষা করাইয়া পূরণ করিয়াছিলেন। মোট প্রায় আট হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। এই দুই বৎসর ধরিয়া অসীম ধৈর্য্যের সহিত বহুকষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার এবং বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিয়া এতদঞ্চলের প্রায় চারিশত যুবক তাঁতের কাজ শিক্ষা করিয়াছিল, এবং প্রায় এক হাজার চরকায় সূতা কাটা হইত। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের এইসব শিল্পব্যবসায়ে তখন তেমন লক্ষ্য না থাকায় এমন প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হইয়াও ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া গেল।

সিদ্ধাশ্রম হইতে আমরা মাঝে মাঝে গৌরী-আশ্রমে ব্রহ্মচারীবাবার সহিত দেখা করিতে যাইতাম। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি আমাদিগকে একদিনও বলেন নাই যে আমরা এই তাঁত-বয়ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থে কোন কাজ করি। মহাপুরুষগণ কি নির্লিপ্তভাবে কাজ করিতে পারেন তাহা দেখিয়াছি ব্রহ্মচারীবাবার মধ্যে। অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের যুবকদের উৎসাহ কমিয়া গেল এবং আশ্রমের তাঁত চরকার কাজ এবং বয়ন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সব উঠিয়া গেল। ব্রহ্মচারীবাবা উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। এ তো তাঁহার যথার্থ কাজ নয়। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "কতকগুলি ছেলে মহাত্মার আদেশে বা উপদেশে বা বস্ত্র-সমস্যা দূরীকরণার্থে খুব উৎসাহিত হইয়াছে এবং কেহ কেহ আমার নিকট আসিয়াছিল। তাহাদের কথায় আমি ইহা সঙ্গত মনে করিয়া হস্তক্ষেপ করিলাম, স্বরাজ-টরাজ বুঝিতে ইচ্ছাও করিলাম না।"

(ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ৯৭।৯৮ পৃঃ)

তীর্থ-পর্য্যটনে

সিদ্ধাশ্রমে আমরা কয়েকজন একনিষ্ঠ সাধনাতে রত রহিয়াছি—মোক্ষদানন্দ, রামানন্দ, ধীরানন্দ, যোগদানন্দ এবং আরও জন দুই। এমন সময় একদিন প্রাতে ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে তিনখানি চিঠি লইয়া অকস্মাৎ অবলানন্দ আসিলেন। মোক্ষদানন্দ, ধীরানন্দ ও আমার নামে তিনখানি স্বতন্ত্র চিঠি। পরে তীর্থপর্য্যটনে আমার এই চিঠিখানি হারাইয়া ফেলি। চিঠিগুলিতে ব্রহ্মচারীবাবা আদেশ করিয়াছেন—এই চিঠি হস্তগত হইবামাত্র আমরা যে যে-অবস্থায় আছি, সেই অবস্থাতে তৎক্ষণাৎ আশ্রম হইতে তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়া যাইব, কিন্তু সকলেই একা একা, কেহ কারো সঙ্গে নয়। পর্য্যটনকালে গৃহীর বাড়ীতে একরাত্রি, আশ্রমাদিতে তিন রাত্রি, কিছু না পাইলে বৃক্ষতলে বা শ্মশানে বাস করিব; যদি কোন ভগবদ্-উপলব্ধিসম্পন্ন, ভগবদ্-আদেশপ্রাপ্ত ও ভগবদ্-ইচ্ছায় পরিচালিত মহাপুরুষের আশ্রয় পাই তাহা হইলে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারি। যদি দৈবাৎ এইরূপ পর্য্যটক দুইজন একত্র মিলিত হইয়া পড়ি, তাহা হইলে একরাত্রি একসঙ্গে থাকার পরই একে অন্যকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইব ইত্যাদি। ব্রহ্মচারীবাবা এইভাবে আদেশ দিয়া গৌরী-আশ্রম হইতে শান্তিদানন্দ ও সরলানন্দকেও পর্য্যটনে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তৎপর শঙ্করানন্দ ও সর্ব্বশেষে বিরজানন্দ এইভাবে পর্য্যটনে বাহির হইলেন। পর্য্যটনে থাকাকালে বিরজানন্দ কাশ্মীর—উধমপুরে মারা যান।

পত্রবাহক অবলানন্দ যখন সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন আমি গ্রামে কোন কাজে গিয়াছিলাম, আসিয়া এই কথা শুনিলাম।

মোক্ষদানন্দ গামছা কমণ্ডলু হাতে যখন স্নান করিতে যাইতেছিলেন সেই সময়ে অবলানন্দ আসিয়া তাঁহার পত্র তাঁহার হাতে দিলেন; মোক্ষদানন্দ পত্রখানি পড়িয়া তদবস্থাতেই সিদ্ধাশ্রম হইতে বাহির হইয়া গৌরী-আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হন এবং ব্রহ্মচারীবাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবিলম্বে তীর্থপর্য্যটনে চলিয়া যান। প্রায় চার পাচ বৎসর পরে মোক্ষদানন্দ কাশ্মীর হইতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পরে তাঁহার নিকট শুনিয়াছি তিনি গৌরী-আশ্রম হইতে বাহির হইয়া কলিকাতা, পুরী, দক্ষিণভারতের রামেশ্বর ও কুমারিকা হইয়া পশ্চিম ভারতে নর্ম্মদা, নাসিক, বোম্বাই, দ্বারকা হইয়া সিন্ধু, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, বদরিকাশ্রম ঘুরিয়া আবার কাশ্মীরে যান এবং তথা হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আমার ও ধীরানন্দের প্রতি চিঠি দুইখানি একমত লিখা। মর্ম্ম এই যে, আমি ও ধীরানন্দ সংসার আশ্রমে ফিরিয়া গিয়া যথার্থ সংসারীর মত সংসার আশ্রম করিব; আমার চিঠিতে এরূপও লিখা ছিল যে, যদি একান্তই আমি সংসার না করিতে চাই তবে আমার সংসারের ভার ছোট ভাইদের উপর দিয়া, লিখিত সর্ত্ত অনুসারে পর্য্যটনে যাইতে। ধীরানন্দ সেদিন দৈনিক ভিক্ষায় গিয়াছিলেন— ভিক্ষা হইতে ফিরিলেই পত্রবাহক অবলানন্দ তাঁহার হাতে চিঠিখানি দিলেন। ধীরানন্দ চিঠিখানি পড়িয়া এবং মোক্ষদানন্দ আগেই বাহির হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া তখনই আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং আশ্রমের নিকটবর্ত্তী গ্রামে তাঁহার বাড়ীতে আপন গর্ভ-ধারিণী মার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। আমি গ্রাম হইতে আশ্রমে আসিতেই অবলানন্দ আমার পত্রখানি আমাকে দিলেন। আমি তাহা পড়িলাম। আশ্রমে মোক্ষদানন্দ ধীরানন্দকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাঁহারাও এইরূপ এক একখানি পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ আশ্রম হইতে বাহির হইয়া আগেই চলিয়া গিয়াছেন। আমিও

তদবস্থায় বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ একত্র একসঙ্গে আছি, একত্র আহার-বিহার, ধ্যান-ধারণা ও শাস্ত্রালোচনাদি করিয়াছি, এখন ব্রহ্মচারীবাবার কঠোর আদেশ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। কেহ কাহারো সঙ্গে পরামর্শ করিবার বা একত্র হইবার সুযোগ রহিল না এবং প্রত্যেকে আদেশ পাইয়া নিজ নিজ বুদ্ধি-বিবেক অনুযায়ী বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ীর উদ্দেশ্যে পথ চলিতে চলিতে মনে মনে ব্রহ্মচারীবাবার উপর আমার রাগ ও অভিমান হইল। আমি বিবাহ করিব না, সংসারে থাকিব না, সন্ন্যাসী হইব, এ তো আগেই তাঁহাকে বলিয়াছি। অবশ্য ইহা ছিল আমার নিজের সঙ্কল্প। ইহাতে তাঁহার অনুমোদন ছিল কি না, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। অবশ্য তিনি নিরুত্তরই ছিলেন। তবে কি আমাকে আবার সংসারী হইতেই হইবে, যথার্থ গার্হস্থ্যাশ্রমের রীতিনীতি প্রতিপালন করিতে হইবে? বিবাহ তো গার্হস্থ্যাশ্রমের রীতি; তবে কি আমাকে বিবাহও করিতে হইবে? মনে প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল, কিন্তু আমি মীমাংসা কিছুই করিতে পারিলাম না। বাড়ীতে পৌঁছিয়া মধ্যম ভ্রাতাকে বলিয়া ভারতের তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া পড়িলাম। ভাইরা ত আমার আশা আগেই ত্যাগ করিয়াছিল! পরদিন গৌরী-আশ্রমে ব্রহ্মচারী-বাবার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমার প্রতি এই দ্বিবিধ আদেশ কেন? বলিলাম যে আমি সন্ন্যাসীর মত পর্য্যটনেই যাইব স্থির করিয়াছি কিন্তু আমার মনের মধ্যে তখনও প্রবল দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। তাঁহার আদেশের ঠিক ঠিক মর্ম্ম আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। ব্রহ্মচারীবাবা নিরুত্তরই রহিলেন। শুনিলাম আমার আসার পূর্ব্বেই শান্তিদানন্দ, সরলানন্দ, মোক্ষদানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতি এক একজন ব্রহ্মচারীবাবার সহিত দেখা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কে কোন্ দিকে গিয়াছেন কাহারো জানা

নাই। মন ও বিবেক অনুসরণ পূর্ব্বক প্রত্যেকে আপন পথ ধরিয়াছেন।

কিন্তু আমার হঠাৎ সন্ন্যাসীর মত পর্য্যটনে যাওয়ার অসুবিধা ছিল। অপর সকলে গেরুয়াবস্ত্র পরিতেন এবং ভিক্ষাও করিতেন যদিও তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র শান্তিদানন্দ ছাড়া কাহারো রীতিমত সন্ন্যাস-সংস্কার হয় নাই। আমি সন্ন্যাস-সংস্কার না লইয়া লাল কাপড় পরিব না তাই আশ্রমে ব্রহ্মচারীর মত সাদা কাপড়েই থাকিতাম এবং ভিক্ষায় আমাকে যাইতে হইত না। আশ্রমের ঠাকুরপূজা, ভোগের কাজের সাহায্য ইত্যাদি করিতাম। কিন্তু এখন আমি মহাবিপদে পড়িলাম। গেরুয়া কাপড় ছাড়া পর্য্যটনে বাহির হইতে বা ভিক্ষা করিতে সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু পর্য্যটনে ত আমাকে যাইতেই হইবে! কপর্দ্দক-হীন অবস্থায় আমাকে ভিক্ষাও করিতে হইবে! ব্রহ্মচারীবাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বুঝিলাম যে তিনি আর সে প্রেমময় শ্রীগুরুদেব নাই। যদিও তাঁহার মুখের ভাব শান্ত তথাপি বড় গম্ভীর। আশ্রমের আব-হাওয়াতেও যেন একটা শোক ও বিষাদের ছায়া। ভিতরে কোন কিছু ঘটিয়াছে কি না, তাহা আমি জানি না। আর আমার মন এত বৈরাগ্য-পূর্ণ ও উদাসীন যে জানিতে ইচ্ছাও করিতেছে না। ব্রহ্মচারীবাবাকে প্রণাম করিলাম। পঁয়ত্রিশ মাইল দূর বাড়ী হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছি, অনাহার, তিনি বসিতে বা বিশ্রাম করিতেও বলিলেন না। তাঁহাকে বলিলাম যে, আপনি আমাকে সন্ন্যাস-সংস্কার দিন অথবা লাল কাপড় পরিবার অনুমতি দিন। গেরুয়াবস্ত্র না হইলে পর্য্যটনে ভীষণ অসুবিধা হইবে এবং ভিক্ষা করিতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইবে। তিনি বলিলেন যে, পর্য্যটন হইতে ফিরিয়া আসিলে সন্ন্যাস-সংস্কার দিব; একথা জানিও যে, লাল কাপড় ছাড়াও সন্ন্যাসী বা সাধু হওয়া যায়। তুমি যদি সাদা কাপড়ে সঙ্কোচ বোধ কর তবে কাপড় রং করিয়া লইতে পার।

ব্রহ্মচারীবাবাকে আবার প্রণাম করিয়া রওনা হইব এমন সময় তিনি বলিলেন—"দাঁড়াও, শুন, তোমরা এখন এই পুণ্যভূমি ভারতের কত পবিত্র তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া কত সাধু মহাপুরুষের দর্শন করিবে। আচ্ছা, আমি যে তত্ত্ব জানিয়াছি, যদি তেমন কোন মহাপুরুষ পাও ত জিজ্ঞাসা করিও তিনিও এই তত্ত্ব অবগত আছেন কি না ? তত্ত্বটি এই যে, মা ও বাবা তাঁহাদের সমস্ত দেবশক্তিসহ পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন করিতে এবং দেবতা মানবে অপূর্ব্ব লীলা করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের মহাপ্রকাশ সত্বরই হইবে।"

আমি—মহাপুরুষ চিনিব কেমন করিয়া ?

ব্রহ্মচারীবাবা—কেন, তেমন মহাপুরুষ দেখিলে জিজ্ঞাসা করিবে যে, আপনি কি ভগবদ্দর্শন করিয়াছেন ? শ্রীভগবানের আদেশ পান ? আমি যেমন তোমাদিগকে বলিয়া থাকি, হাঁ, আমি ভগবানকে দেখিয়াছি। তিনিও যদি দেখিয়া থাকেন, তবে বলিবেন।

আমি—এই যে সাধু সন্ন্যাসী-সমাজে আজকাল গুরুপ্রণালী ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবার প্রথা আছে, লোকে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে তোমরা কোন্ ঘর অর্থাৎ সম্প্রদায় ইত্যাদি, তাহাদিগকে কি বলিয়া পরিচয় দিব ?

ব্রহ্মচারীবাবা—আমার তিন গুরুর মধ্যে শ্রীমদ্ অভয়াচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় বারদীর বাবা শ্রীশ্রীমৎ লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। অতএব তোমরা বারদীর ব্রহ্মচারীবাবার সম্প্রদায় বলিয়াই পরিচয় দিবে। তবে যিনি ভগবদ্দর্শন করিয়াছেন ও ভগবদ্-আদেশে পরিচালিত তিনি আমাকেও চিনিতে পারিবেন। কোন ভয় পাইও না, মা তোমাদের পিছনে পিছনে আছেন। আর তোমাদের শরীর নষ্ট হইয়া গেলেও তোমাদের হাড় হইতে আমি তোমাদিগকে আবার তৈরী করিতে পারিব।

ব্রহ্মচারীবাবার মুখে এই আশ্বাসপূর্ণ অভয়বাণী শুনিয়া এবং তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আবার চলিলাম আমাদের লক্ষ্মীয়া সিদ্ধাশ্রমে। তথায় কাপড় গেরুয়া রং করিয়া লইয়া পরে বাহির হইব। তখন আমাদের দেহ-প্রাণ-মন যেন তপস্যা ও সাধনাতে সতেজ হইয়া আছে। এ-পৃথিবীর ধূলি আমাদের স্পর্শ করিতে পারে না, যেন এক সম্পূর্ণ পৃথক জীব আমরা। কপর্দ্দকহীন আমরা প্রত্যেকেই, কাল কোথায় থাকিব বা খাইব তাহার স্থিরতা বা নিশ্চয়তা নাই, ভাবনাও নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে ভাবিতেছিলাম এমন করুণার মূর্ত্তি ব্রহ্মচারীবাবা এত কঠোর ও নির্ম্মম হইলেন কি করিয়া! এতদূর হইতে হাঁটিয়া আসিলাম, উপবাসী, নিঃসম্বল, খাওয়ার কথা দূরে থাক, একটু বসিতেও বলিলেন না। অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলাম কি এক অজানা শক্তি, কেবল সম্মুখের দিক ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে—কোথায় তা জানি না।

পরদিন প্রাতে লক্ষ্মীয়া সিদ্ধাশ্রমে পৌঁছিলাম। রামানন্দজীর কাছ হইতে এক টুকরা গিরিমাটি লইয়া যৎসামান্য কাপড় যাহা ছিল রং করিলাম। বেলা অপরাহ্ণ দেড়টা কি দুইটা হইবে তখনও আশ্রমের ভোগ লাগে নাই। ভোগের জন্য অপেক্ষা করিতেও ইচ্ছা হইল না। অভুক্ত অবস্থাতেই রওনা হইয়া পড়িলাম। কোথায় খাইব, থাকিব, জানিনা; অর্থ নাই, ভাবনা-চিন্তাও নাই, কেবল সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেই শান্তি ও আনন্দ। কোথায় যাইব, কোনদিকে যাইব, কিছুরই ঠিক নাই, চক্ষু ও বিবেক যে দিকে লইয়া চলে। শরীর মন প্রাণ যেন কোন এক অজানা সুদূরে চলিয়া গিয়াছে। সিদ্ধাশ্রম হইতে বাহির হইয়া সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইতেই হইবে—সেইদিকেই চলিলাম। ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইলাম। খেয়া-ওয়ালা পয়সা চাহিল না, হয়ত বুঝিল ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। আর চাহিলেই বা দিব কোথা হইতে? তের চৌদ্দ মাইল যাওয়ার পর সন্ধ্যা হইল। গ্রামের

মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া নিকটেই একটি গৃহী সাধুর বাড়ীতে অতিথি হইলাম। জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম অচেনা গৃহে অতিথি হইয়া ভিক্ষা গ্রহণ। তাঁহারা কিন্তু খুব যত্ন করিলেন। রাত্রিকাল সেখানেই কাটাইলাম। জীবনে এক নূতন অভিজ্ঞতা আরম্ভ হইল। সাধুটি তান্ত্রিক, ভৌতিক শক্তিবলে রোগ-চিকিৎসা করেন বলিয়া মনে হইল। পরদিন খুব ভোরে উঠিয়া আবার রওনা হইলাম ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল লাইন ধরিয়া। এইভাবে রোজ কুড়ি পঁচিশ মাইল হাঁটিয়া দুই তিন দিনে ঢাকা হইয়া নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিলাম। মধ্যাহ্নে কোনদিনই আহার জুটাইতে পারি নাই। দ্বিতীয় রাত্রি ঢাকা জয়দেবপুরের নিকটবর্ত্তী গজারীগড়ের মধ্যে কোন আদিবাসী গৃহস্থের বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। লাল কাপড়ের গুণে সেই গভীর জঙ্গলের মধ্যেও যথেষ্ট আদর যত্ন পাইলাম। তৃতীয় দিন অপরাহ্নে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে উপনীত হইয়া অতিথি হওয়ায় তাঁহারা অসময়ে সারাদিনের বুভুক্ষু অতিথিকে কিছু চিড়াগুড় দিয়া অতিথি-সৎকার করিলেন। আমি অনাহারে পথশ্রমে একান্ত অবসন্ন। রাত্রে মিশনে বিশ্রাম করিতে চাহিলে তাঁহারা আমাকে আমার সম্প্রদায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন; আমি বারদীর শ্রীশ্রীমৎ-লোকনাথ ব্রহ্মচারীবাবার শিষ্যানুশিষ্য জানিয়া বলিলেন যে 'এখানে ঢাকায় ব্রহ্মচারীবাবার বহু শিষ্যভক্ত আছেন; শক্তি ঔষধালয়ের স্বর্গীয় মথুর চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও শ্রীমৎ রজনী ব্রহ্মচারীর নাম করিলেন। স্বামীজীরা বলিলেন যে, প্রেসিডেন্টের অনুমতি ছাড়া রাত্রে মিশনে আগন্তুকদের থাকিবার উপায় নাই; তাই তাঁহারা আমাকে অন্যত্র যাইতে বলিলেন। অগত্যা আমি শ্রীমৎ রজনী ব্রহ্মচারীর বাসার খোঁজ করিয়া সন্ধ্যায় সেখানে উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকে পরিচয় দিলে, তিনি বারান্দায় বসিতে বলিলেন এবং রাত্রে খাবার দিলেন, কিন্তু থাকার জন্য কোন ঘর বা বিছানা কিছুরই ব্যবস্থা করিলেন না। ছেলেবেলায় ঢাকার

ভীষণ মশার কথা শুনিতাম, দুর্ভাগ্যক্রমে আজ তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইল। পাঁচ মিনিট বসিবার জো নাই—মশার এমন উপদ্রব। শেষ-রাত্রে রাস্তা ধরিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। রাত্রি ভোর হইলে নারায়ণগঞ্জের সড়ক ধরিয়া সকালেই নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিলাম। গত রাত্রে ঢাকায় ভীষণ মশকের অত্যাচারে এবং অনিদ্রায়, ক্রমাগত তিনচার দিন পথশ্রমে একেবারে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখানে আজ বিশ্রাম করিব এই ভাবিয়া স্নানাদি সারিয়া মধ্যাহ্নে দুই এক গৃহস্থবাড়ীতে ভিক্ষা চাহিলে প্রত্যেকে বলিলেন, নারায়ণগঞ্জ সহরে চার পাঁচটি দেবমন্দির আছে—যেখানে নিত্য সেবা পূজা ভোগরাগ হয়—তথায় যাইতে। এই চার পাঁচটি দেবালয়ের প্রত্যেকটিতে গিয়া জানিলাম পুরোহিত প্রসাদ বিক্রী করেন। সামান্য দুই চার আনা দিতে পারিলেই প্রসাদ পাওয়া যায় কিন্তু আমি তো কপর্দ্দকশূন্য ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী। হয়ত এইসব দেবালয়ে পরিচিত অতিথির জন্য ব্যবস্থা আছে। আমি একেবারে অপরিচিত। একটি দেবালয়ের পুরোহিত কি বলিলেন ঠিক না বুঝিতে পারিয়া প্রায় আড়াইটা পর্য্যন্ত সেখানে প্রসাদ পাইবার আশায় বসিয়া রহিলাম কিন্তু পরে বুঝিলাম যে আমার বুঝিবার ভুলই হইয়াছিল। নারায়ণগঞ্জ সহরে সারাদিন অভুক্ত থাকিয়া বিকালে কমলা ঘাটের খেয়া পার হইয়া বিক্রমপুরের পথে হাঁটিতে লাগিলাম। দুই তিন মাইল হাঁটিতেই সন্ধ্যা হইল। গ্রামের মধ্যে রাস্তার ধারেই একটি গরীব গৃহস্থবাড়ীতে রাত্রি যাপন করিতে চাহিলে সৌভাগ্যবশতঃ গৃহস্বামী স্বীকৃত হইলেন এবং বাড়ীর মধ্যে বৃদ্ধামাতাকে ডাকিয়া বলিলেন—ব্রহ্মচারী অতিথির পাকের ব্যবস্থা করিয়া দাও। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রামের জনৈক শিক্ষিত যুবক তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাকে বোধ হয় ছদ্মবেশী সি, আই, ডি মনে করিয়া নানা বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাবে রাত্রি প্রায় দশটা হইল। আমি

যুবকের অমূলক সন্দেহ দূর করিতে কিছুতেই পারিতেছিলাম না। তখন বাড়ীর সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধামাতা উঠানের একটি কোণে তুলসীতলার পাশে একটি চুল্লি তৈরী করিয়া আমার নিরামিষ পাকের সব আয়োজন করিয়া পাহারা দিতেছিলেন, আমি আসিয়া পাক করিব ও আহার করিব, বৃদ্ধা অতিথি-সৎকার করিয়া সর্ব্বশেষে খাইবেন। হঠাৎ আমার মনে হইল যে, আমার ক্ষুদ্র ঝুলিতে একখানি নিত্য ডায়েরী আছে, এবং গত চারদিনের ডায়েরী তাতে লিখা রহিয়াছে ; সেই ডায়েরীখানা ঝুলি হইতে বাহির করিয়া যুবককে দেখাইলে তিনি আমাকে রেহাই দিলেন। পদব্রজে এইরূপ পর্য্যটনে যে কত সব বিপদ ও কর্ম্মভোগ তাহা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলাম। রাত্রি অনেক হইয়াছে। খাইতেই হইবে। সুতরাং পাকও করিতেই হইবে। বাংলায় নিরামিষাশী সাধুর ভিক্ষা গ্রহণে এই ভীষণ অসুবিধা। তবে অবশ্য ক্বচিৎ কখনও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যঘরের নিরামিষাশী বিধবাগণের আতিথ্য গ্রহণের সুযোগ মিলিত বটে। পূর্ব্ববঙ্গে রাজা জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের অতিথিশালার ব্যবস্থা থাকিলেও, সর্ব্বসাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ বা ভিক্ষা পাওয়া কঠিন ছিল। অনেক রাত্রে কায়ক্লেশে ডালভাত পাক করিয়া ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইলাম ; এবং রাত্রিতে ঘুমাইতেও পাইলাম। পরদিন, পঞ্চমদিনে, তারাপাশা হইতে হাঁটিয়া সারা বিক্রমপুরের ভিতর দিয়া কত গ্রাম ও মাঠ অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ণের দিকে পদ্মাতীরে লৌহজং বাজারে উপনীত হইলাম। পূর্ব্বরাত্রির তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বিক্রম-পুরের কোন গ্রামে মধ্যাহ্নে আহারের চেষ্টাই করিলাম না। লৌহজং বাজারে উপস্থিত হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের একটি পাঠাগার আছে তথায় গেলাম। তাঁহারা আমাকে ব্রহ্মচারী দেখিয়া সাদরে স্থান দিলেন, কিন্তু আমার খাইবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। আমিও গ্রামের

মধ্যে ভিক্ষান্বেষণে আর গেলাম না। পনর বিশ মাইল অনুমান এই চৈত্রমাসের রৌদ্রে অভুক্ত অবস্থায় হাঁটিয়া পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত। মিশনের পাঠাগারের ছেলেরা আমাকে একটি ফুটি ও কিছু চিনি দিল। এই জলীয় ফলটি মাত্র খাইয়া পঞ্চম দিন অতিবাহিত করিলাম। তরুণ ছাত্রমণ্ডলীকে বলিলাম যে তাহারা আমার খাবার চেষ্টা বেশী না করিয়া যদি লৌহজং ঘাট হইতে পদ্মার পরপারে টেপাখোলা ঘাটের একটি ষ্টীমার টিকেট কিনিয়া দিতে পারে তাহা হইলে আমার খুব উপকার হয়। পরদিন প্রাতে গোয়ালন্দ ষ্টীমারে উঠিলাম। ছেলেরা তের আনা সংগ্রহ করিয়া আমাকে একটি টিকেট কিনিয়া দিয়াছিল। পদব্রজে যাইবার আর উপায় নাই, পদ্মানদী পার হইতেই হইবে।

টেপাখোলা ঘাটে ষ্টীমার হইতে নামিয়া ফরিদপুর সহরে প্রভু জগদ্বন্ধুর আশ্রমে উপনীত হইলাম। ভাবিলাম ইহা মহাপুরুষের আশ্রম, এখানে দুই তিন দিন বিশ্রাম করিব। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিসাবে আশ্রমবাসী ভক্তগণ এত গোঁড়া যে ইঁহাদের সঙ্গে শুধু তর্কবিতর্কই হইল সারা রাত্রি ধরিয়া। প্রভু জগদ্বন্ধুকে দর্শন করিলাম। তিনি তখন বাতরোগে একেবারে পঙ্গু হইয়া গিয়াছিলেন। আশ্রমবাসী ভক্তগণ তাঁহাকে খুবই সেবাযত্ন করিতেন। বিকালে তাঁহারা নিজেরাই প্রভুকে একটি রিক্সাতে তুলিয়া খানিকটা পথ বেড়াইয়া আনিতেন। আমিও সেদিন প্রভুর রিক্সা কিছুক্ষণ টানিয়াছিলাম। যদিও ইঁহারা অতিথি হিসাবে আমাকে খুবই যত্ন করিলেন তথাপি ইঁহাদের সঙ্কীর্ণ মতবাদ ও সাধনা ইত্যাদির পদ্ধতি জোর করিয়া অন্যের উপর চাপানোর এবং আপন প্রভুর শ্রেষ্ঠতা ও অবতারত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা আমার আদৌ ভাল লাগিল না। পরদিন ভোরেই গোয়ালন্দ অভিমুখে রওনা হইলাম। ক্রমশঃ গোয়ালন্দ হইতে রাণাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কালনা, কাটোয়া এবং বীরভূম জিলার কতকাংশ ভ্রমণ করিয়া বর্দ্ধমান রাজবাড়ীতে

উপস্থিত হইলাম। এখানে এই বিস্তৃত ভ্রমণ কাহিনী বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। প্রায় মাসাধিক কাল লাগিল এই স্থানগুলি অতিক্রম করিতে। প্রায় চারিশত মাইল পদব্রজে হাঁটিলাম। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া নদীয়া ও বৰ্দ্ধমান অঞ্চলে ভ্রমণকালে প্রত্যহ এবং প্রত্যেক স্থানে অতিথি হিসাবে খুব আদর যত্ন লাভ করিয়াছিলাম। ভিক্ষা ও আহারের জন্য এ অঞ্চলে পূর্ব্ববঙ্গের মত কষ্ট একেবারেই হয় নাই। বৰ্দ্ধমান রাজবাড়ীতে তো অতিথি অভ্যাগত এবং সাধু-সন্ন্যাসীর জন্য ধৰ্ম্মশালা রহিয়াছে; তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন দেবালয়ে ভোগ প্রসাদ বিতরণ এবং সাধু সন্ন্যাসীর থাকিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দুই তিন দিন বৰ্দ্ধমানে বিশ্রাম করিলাম এবং গয়া, কাশী, বৃন্দাবনের দিকে যাইব মনে মনে স্থির করিলাম। বিশেষ বিশেষ তীর্থে মহাপুরুষের সন্ধান করাই আমার বিশেষ লক্ষ্য। এ পর্য্যন্ত হাঁটিয়াই ভ্রমণ করিয়াছি। রেলগাড়ীতে উঠি নাই। এখন স্থির করিলাম গয়া পর্য্যন্ত রেল গাড়ীতেই যাইব। বৰ্দ্ধমান ষ্টেশনে গিয়া ষ্টেশনমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কি আমাকে গয়ার গাড়ীতে বিনাটিকেটে উঠাইয়া দিতে পারেন? এ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হাঁটিয়াই আসিয়াছি—আর হাঁটিতে পারি না, কষ্ট হয়। তিনি আমাকে বলিলেন যে, রাত্রের গাড়ীতে উঠাইয়া দিবেন, সে গাড়ী কিউল জংসন হইয়া গয়া যাইবে। এইরূপে মাষ্টারের সাহায্যে এই প্রথম রেলগাড়ীতে চড়িলাম। পরদিন সকালে নিরাপদে গয়া পৌঁছিলাম। সাধু দেখিয়া, বোধ হয়, কেহই টিকেট চাহিল না। গয়াতে বিষ্ণুপাদ, বুদ্ধগয়া ইত্যাদি দর্শন করিতে দুই তিন দিন লাগিল। গয়াতে বুদ্ধদেবকে স্বপ্নে দর্শন করিলাম। কি করুণাময় জীবন্ত মূৰ্ত্তি। গয়াতে দুই একদিন থাকিয়া কোন মহাপুরুষের সন্ধান মিলিল না। যেদিন গয়া হইতে কাশী রওনা হইব, রাত্রে গয়া ষ্টেশনে ঘুমাইতেছিলাম—শেষ রাত্রিতে ট্রেন। রাত্রে স্বপ্নে দেখি—এখানে

কোন গুহাতে ভগবান বুদ্ধদেব এবং তাঁহার দুই পার্শ্বে অপর দুইজন মহাপুরুষ। করুণার মূর্ত্তি ভগবান বুদ্ধদেবকেই চিনিলাম অপর দুইজন মহাপুরুষকে চিনিতে পারিলাম না। স্বপ্ন ভাঙ্গিতেই মনে হইল ঠিকই তো গয়ার অতি সন্নিকটেই বুদ্ধগয়া। তাহা তো দর্শন হয় নাই, ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। কৃপাপূর্ব্বক ভগবান বুদ্ধদেব দর্শন দিলেন—হয়ত এখানে কোন মহাপুরুষেরও সাক্ষাৎ হইতে পারে। তখন ভোর হইয়াছিল, কাশীগামী ট্রেনও প্ল্যাটফরমে, কিন্তু কাশী রওনা হইলাম না, তখনই বুদ্ধগয়ার দিকে রওনা হইলাম। পথ মাত্র ৮ মাইল। প্রশস্ত রাস্তা চারিদিকে পাহাড় ও নির্জনতা। খুব সকালেই বুদ্ধগয়াতে পৌঁছিলাম। সেই প্রাচীন মন্দির এবং মন্দিরের পিছনেই সেই বোধিসত্ত্ববৃক্ষ। বৃক্ষটি খুব প্রাচীন নয়, বোধ হয় পরে রোপণ করা হইয়াছে। স্থানটি খুবই নীরব ও নির্জন। বোধিসত্ত্ব বেদিমূলে কিছু সময় শ্রদ্ধাবনত শিরে বসিয়া রহিলাম। পরম কারুণিক বুদ্ধদেবের মহাতপস্যা- ও সিদ্ধিভূমি। কত সহস্র বৎসর ও যুগযুগান্তর ধরিয়া তাঁহার তপস্যা ও সাধনার আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করিয়া এখনও তেমনই বিদ্যমান।

পরে উঠিয়া মন্দিরটি বাহির হইতে চারিদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। মন্দিরের জনৈক সেবক আমাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন এবং আমাকে প্রচুর প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ পাইয়া মন্দিরের ভিতর দর্শন করিয়া বাহির হইলাম। নিকটেই দশনামী সন্ন্যাসীদের একটি খুব বড় আশ্রম ও একটি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় আছে। আশ্রমে যাইয়া দুই একজন সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করিলাম এবং কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম এতদঞ্চলে কোন সিদ্ধমহাপুরুষ আছেন কি না? কিন্তু তেমন মহাপুরুষের সন্ধান পাওয়া গেল না। মধ্যাহ্নে এই আশ্রমেই ভিক্ষা নিলাম ও বিশ্রাম করিলাম। সন্ধ্যায় গয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। স্বপ্নে ভগবান বুদ্ধদেব ও দুইজন মহাপুরুষের দর্শন এবং

পরে বুদ্ধগয়াতে যাইয়া বৌদ্ধমন্দির ও বোধিসত্ত্ব দর্শন করিলাম কিন্তু মনের মধ্যে যে প্রবল দ্বন্দ্ব তাহা সমান ভাবেই চলিতে লাগিল। কোথাও দুই একদিনের বেশী টিকিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে যে প্রবল দ্বন্দ্ব ও সমস্যা, তাহার কোন সমাধান হইল না। তবে কি ব্রহ্মচারী-বাবা আমাকে গৃহী হইতেই আদেশ দিলেন? আমি যে সন্ন্যাসী হইতেই চাহিয়াছিলাম। এখন আমি কি তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া চলিয়াছি? আমাকে এই দ্বিবিধ নির্দ্দেশব্যঞ্জক চিঠি লিখিলেন কেন? স্পষ্ট করিয়া লিখিলেই তো পারিতেন যে আমাকে সংসারীই হইতে হইবে। সংসারী হওয়াই তবে কি আমার অদৃষ্ট? সন্ন্যাসী হইব বলিয়া যে মনকে গড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা কি ভুল? স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও উপদেশানুযায়ী তো ভুল করি নাই! তবে কি আমার জন্য সে আদর্শ নয়? এই সব প্রবল সংশয়ের মীমাংসা করিতে না পারায় ভ্রমণে কোথাও স্থির হইতে পারিতেছিলাম না।

গয়া হইতে কাশীতে গেলাম। এখন হইতে রেল গাড়ীতেই ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ষ্টেশনমাষ্টার বা গার্ডকে বলিয়া গাড়ীতে উঠিতাম। ব্রহ্মচারীবাবার এই উপদেশ ছিল। এবং সর্ব্বত্র দেখিয়াছি, বিশেষতঃ উত্তর ভারতে—সাধুসন্ন্যাসীর নিকট টিকেট বড় একটা চাহিত না। এমন কি কখন কখন দেখিয়াছি ষ্টেশনে টিকেটবাবু আপনা হইতেই রাস্তা ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুই এক বৎসর পর হইতেই প্রত্যেক রেলওয়ে কোম্পানী এ-বিষয়ে ভীষণ কড়াকড়ি নিয়ম করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধরিয়া বহুলোক এইরূপ বিনা টিকেটে যাওয়া আসা করিত।

কাশী বিরাট নগরী, ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষ এখানে থাকেন এইরূপ শুনিয়াছিলাম। আমি নিজে কখনও ইতঃপূর্ব্বে আসি নাই, কিছুই জানি না, সম্পূর্ণ অপরিচিত।

মনে মনে ভাবিলাম এখানে কিছুদিন থাকিব এবং কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাই কিনা দেখিব। বেলা অনুমান একটা হইবে। রাজঘাট ষ্টেশনে নামিয়া সোজা গঙ্গাতীরের দিকে রওনা হইলাম। দশাশ্বমেধ ঘাটে উপস্থিত হইয়া স্নানাদি সারিয়া শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দর্শন করিলাম। এই অসময়ে ভিক্ষায় কোথায় যাইব, আর, আজ একাদশীর উপবাস, ফলমূলই বা কোথায় পাইব? দশাশ্বমেধ ঘাটে ফিরিয়া গেলাম এবং গঙ্গাতীর দিয়া ধীরে ধীরে ডানদিকে হাঁটিয়া চলিলাম। কোন একটি ঘাটে, পরে জানিয়াছিলাম ইহা অহল্যাঘাট, একটি প্রৌঢ় সাধু বসিয়া আছেন। তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আসিয়াছ?" আমি বলিলাম, "গয়া হইতে আজই আসিয়াছি। এখানে আমি সম্পূর্ণ নূতন, কিছুই জানি না, কোথাও কি ভিক্ষার সুবিধা আছে? থাকিতেই বা কোথায় পাওয়া যায়?" সাধুটি আমাকে অল্পবয়সের ব্রহ্মচারী দেখিয়া খুব স্নেহভরে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমি একাদশীর উপবাসী, এখনও খাওয়া হয় নাই জানিয়া বলিলেন যে তিনিও একাদশী পালন করেন। এই সবে মাত্র তিনি ভিক্ষা হইতে আসিয়া ফলাহার সম্পন্ন করিয়া বসিয়াছেন—আর আমিও উপস্থিত হইয়াছি। তিনি বলিলেন, "আজ একাদশী বলিয়া পরিচিত স্থান হইতে ভিক্ষা করিয়া বার আনা পাইয়াছিলাম, তদ্দ্বারা নানা ফল মূল ইত্যাদি কিনিয়া আনিয়াছিলাম; অর্দ্ধেক আমি খাইয়াছি বাকী অর্দ্ধেক রাত্রির জন্য রহিয়াছে" এই বলিয়া সবটুকু আমাকে খাইতে দিলেন, রাত্রির জন্য কিছুই রাখিলেন না। কাশীতে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম এই সাধুটির সঙ্গেই দেখা ও আলাপ। তাঁহার সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইলাম এবং তাহা বাবা বিশ্বেশ্বরেরই কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিলাম। পরে সাধুটি বলিলেন, তিনি বহু বৎসর কাশীতে আছেন এবং এখানের সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া আমাকে

সাবধানে থাকিতে বলিলেন। আমিও অহল্যাঘাটেই সেদিন রহিলাম। সাধুর কথামত অন্নপূর্ণার ছত্রে পরদিন ভিক্ষায় গেলাম। ভিক্ষা করিয়া অহল্যাঘাটে ফিরিয়া আসিলেই হইত। তাহা করিলাম না। অন্নপূর্ণার ছত্রে আহারের সময় একটি লোক আসিয়া আপনা হইতেই আমার সঙ্গে বড় ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিল। খাওয়া শেষ হইলে সে বলিল, "মণিকর্ণিকার ঘাট দেখিতে চল।" মণিকর্ণিকা ঘাটের নাম শুনিয়া—ইহা কাশীর প্রসিদ্ধ শ্মশানঘাট একটি দ্রষ্টব্য স্থান—তাহার সঙ্গে চলিলাম। ঘাট দেখাইয়া সে আমাকে পরে কোথা হইতে কোথায় লইয়া চলিল, খানিক পরে দেখিলাম গঙ্গাতীরেই কোন জনবিরল স্থানে লইয়া আসিয়াছে। আমার কাছে সে আমার নূতন কমণ্ডলুটি একবার চাহিয়াছিল পায়খানায় যাইতে তা আমি দেই নাই। আমার সম্বলমাত্র এই একটি নূতন কমণ্ডলু—কালনায় সংগৃহীত এবং একটি নূতন কম্বল আর কৌপীন বহির্ব্বাস। বিকালে অল্প বেলা থাকিতে লোকটি আমাকে বলিল যে, নিকটেই কোন ছত্রে বিকালে সাধুদের খাবার বিতরণ করে। তাহার সঙ্গে গিয়া দেখিলাম সামান্য চানা বিতরণ করিতেছে। লোকটি কিছু চানা লইল। তারপর তাহার সঙ্গে চলিতে চলিতে আমি বলিলাম যে আমি অহল্যাঘাটে যাইতে চাই, সেই পথ ধরিয়া চল। কোথায় অলিগলি দিয়া সে আমাকে লইয়া চলিল। হঠাৎ এক বিকট চীৎকার শুনিয়া আমি চমকিত হইলাম, দেখিলাম লোকটি আর আমার সামনে নাই; অপর একটি গরীব ভদ্রলোক সেখানে হতাশ হইয়া কাঁদিতেছেন, আর আমাকে বলিতেছেন যে, এই লোকটি আজ তিন চার দিন হইল তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিয়া নিয়া গিয়াছে। গরীব বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমাকে নিজে নিজেই তাঁহার দুঃখের কথা বলিতে লাগিলেন—রাজসাহী বিভাগে কোথাও তাঁহার বাড়ী। সংসারে আর কেহই নাই। শেষজীবন কাশীবাস করিবেন মনে করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রী করিয়া

চারিশত টাকা আন্দাজ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, কাশীতে কোন দেবালয়ে পুরোহিত বা পাণ্ডাকে এই টাকাটি দিয়া সারাজীবন খাইতে পাইবেন। যেদিন তিনি পৌঁছিয়াছিলেন, সেইদিনই অন্নপূর্ণার ছত্রে খাইবার সময়, সেই দুষ্ট লোকটি তাঁহাকেও মণিকর্ণিকার ঘাটের কথা বলিয়া ভুলাইয়া আনিয়াছিল। ঘাটে একটি ছোট পুকুর বা গর্ত্তের মত স্থানে স্নান করিলে বিশেষ পুণ্য-সঞ্চয়ের লোভ দেখাইয়া লোকটি সেইখানে তাঁহাকে স্নান করিতে বলিল; ভদ্রলোক কাপড়চোপড় ইত্যাদি সমস্ত ঐ লোকটির জিম্মা করিয়া দিয়া জলে নামিলেন। তাহার মধ্যে চারিশত টাকাও ছিল। সুবিধা দেখিয়া ঐ জুয়াচোর লোকটি সব লইয়া সরিয়া পড়িল। ভদ্রলোক উঠিয়া সঙ্গীটিকে এবং জিনিসগুলিও দেখিতে পাইলেন না। পুলিশে খবর দিয়া আজ তিনচার দিন যাবৎ পাগলের মত হইয়া নানা-স্থানে অলিগলিতে চোরকে খুঁজিতেছিলেন। এখন আমার সামনেই বিকট চীৎকার করিয়া চক্ষের নিমেষে সে কোথায় উধাও হইয়া গেল। মনে পড়িল অহল্যাঘাটের সাধুটি গতকাল আসিবামাত্র আমাকে কাশীর চোর গুণ্ডা ও ষাঁড় ইত্যাদি সম্বন্ধে সাবধান করিয়াছিলেন। কাশীর চোর গুণ্ডাগণ নূতন লোক দেখিলে সহজেই চিনিতে পারে এবং তাহা-দিগের যথাসর্ব্বস্ব কিরূপে হস্তগত করা যায় তাহার সব কৌশল বেশ জানে। আমার কাছে এক কমণ্ডলু ও কম্বল ছাড়া কিছু ছিল না বটে, তথাপি আমাকে লোকটা মণিকর্ণিকায় লইয়া গিয়া স্নান ও পুণ্যের কথা কত বলিয়াছিল; সৌভাগ্যক্রমে আমি নীচে নামিয়া শুধু একটু জল স্পর্শ করিয়াছিলাম। নহিলে কম্বল কমণ্ডলু হারাইতাম। সর্ব্বস্বান্ত বৃদ্ধের নিকট হইতে অহল্যাঘাটের দিকে রওনা হইলাম। চোর আমাকে বিপরীত দিকে অনেকখানি দূরে লইয়া গিয়াছিল। অহল্যাঘাটে আসিয়া সাধুটির কাছে এই ঘটনার কথা বলিলাম। আমি

অন্নপূর্ণার ছত্রে ভিক্ষা করিয়া ফিরিব বলিয়া তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিরূপে মণিকর্ণিকা দেখিবার লোভে আমি চোর লোকটার সঙ্গে না জানিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম তাহা সাধু মহারাজকে বলিলাম। কাশীতে দ্বিতীয় দিনও অহল্যাঘাটে ছিলাম। তৃতীয় দিন দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরেই শ্রীযুক্ত মথুর চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে গিয়াছিলাম এবং বারদীর ব্রহ্মচারীবাবার পরিচয় দিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার বাড়ীতে দিন কয়েক থাকিতে পারি কি না ? মথুরবাবু বেশী সহানুভূতি দেখাইলেন না। অগত্যা তৃতীয় দিনেও অহল্যাঘাটেই রহিলাম। সাধুটি একটি অতি ক্ষুদ্র কুটিরে থাকিতেন। আমি ঘাটের সর্ব্বোপরি সিঁড়ির উপর একটি বেদীতে ঘুমাইতাম। তৃতীয় দিন শেষ রাত্রিতে স্বপ্নে একটি বিকট শব্দ শুনিলাম—"এখনই এখান থেকে চলে যা" ধমকের মত বাণীটি শুনিবামাত্রই জাগিয়া উঠিলাম। বুঝিলাম এখান হইতে আমার চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। সুতরাং কাশীতে মহাপুরুষ খুঁজিবার চিন্তা পরিত্যাগ করিলাম এবং পরদিন প্রাতেই রওনা হইলাম অযোধ্যার দিকে। এইভাবে অযোধ্যা, কানপুর, হরিদ্বার ইত্যাদি হইয়া হৃষীকেশে উপনীত হইলাম। হৃষীকেশ স্থানটি হিমালয়ের পাদদেশে ; এখানেই গঙ্গানদী হিমালয় ভেদ করিয়া সমতল ভূমিতে পতিত হইয়াছে। হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গাতীরে অবস্থিত হরিদ্বার ও হৃষীকেশ দুইটি স্থান আমার সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের তো তুলনাই নাই, সাধু সন্তের জন্যই নির্ম্মিত এই দুইটি ছোট্ট সহর। শুধু সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম ও বাসস্থান, নীরব নির্জন ও শান্ত আবহাওয়া, যা সত্যান্বেষী ও অধ্যাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানকারীদের একান্ত প্রয়োজন।

হরিদ্বারে গঙ্গার ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট হিন্দু ভারতবাসীর এক মহামিলনের স্থান। এখানে অর্দ্ধঘন্টা দাঁড়াইলে ভারতের সমস্ত প্রদেশের ও জাতির

নরনারীকে দেখা যায়—বাঙ্গালী, বিহারী, গুজরাতী, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, কাশ্মিরী, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রী—নানা জাতীয় লোককে—বিশেষ করিয়া মহিলাগণকে, কাপড় পরার ধরণ দেখিয়া, তাঁহাদের ভাষা না জানিলেও বেশ চেনা যায়। হরিদ্বার ও হৃষীকেশে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীর খাওয়ার ও বাসস্থানের সুবিধা আছে। তাই এখানে বহু সাধু সন্ন্যাসী আসেন, তন্মধ্যে দশনামী শঙ্কর-পন্থী ও উদাসী—নানকপন্থীই বেশী। সাধুসন্তদিগের সেবার বিরাট বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরান্তর হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভ মেলা বসে, সনাতন কাল হইতে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের সাধুসন্তদের মহামিলন—একটি বিশিষ্ট দেখিবার জিনিষ।

হৃষীকেশে উপস্থিত হইয়া বিরাট পাঞ্জাবীছত্রের সন্নিকটে একটি ছোট ধর্ম্মশালায় একটি কক্ষে স্থান পাইয়াছি। কলিকাতা মহানির্ব্বাণ মঠের জনৈক স্বামী তাঁহার দুই তিনটি শিষ্য লইয়া উক্ত ধর্ম্মশালায় দুই তিনটি কামরায় আছেন। এবং হিন্দুস্থানী দু'চারজন সাধুও অন্যান্য ঘরে রহিয়াছেন। হৃষীকেশে কয়েকদিন থাকার পরই ক্রমাগত রুটি খাওয়ার দরুণ বা অন্য কোন কারণে আমার জ্বর ও আমাশয় হইল। তিনচার দিনের মধ্যেই প্রায় উত্থান-শক্তি-রহিত হইলাম। এখানে কাহাকেও চিনি না, জানি না। এক গণ্ডূষ জল আনিয়া দিবার মত কেহ নাই। হৃষীকেশে কোন হাসপাতালও ছিল না। এক হরি-দ্বারে রামকৃষ্ণমিশন হাসপাতাল আছে, তাহা প্রায় ১৬ মাইল দূরে। ইতোমধ্যে দুই তিনটি কামরার ব্যবধানে একটি কামরাতে একজন সাধু মারা গিয়াছেন। বোধ হয় রাত্রিবেলায় মরিয়া পড়িয়াছিলেন, পরদিন কয়েকজন সাধু তাঁহারই কম্বলে তাঁহাকে বাঁধিয়া গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া-ছিলেন। ইহাই ওখানের সাধারণ রীতি। এই অবস্থায় আমার একটু ভয় হইল। সেদিন রাত্রেই স্বপ্নে ব্রহ্মচারীবাবাকে দেখিয়া

তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমার পৃষ্ঠে হস্ত স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ব্রহ্মচারীবাবার হস্ত-স্পর্শ এত ঠাণ্ডা লাগিতেছিল যে, ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলাম এবং অনুভব করিলাম আমার শরীরে আর জ্বর নাই। শরীরে বেশ একটু শক্তিও পাইলাম। পরদিন নিকটস্থ পাঞ্জাবী ছত্র হইতে ভিক্ষা—ডালরুটি আনিয়া খাইলাম। ব্রহ্মচারীবাবার স্পর্শাশীর্ব্বাদে এইরূপ ভাবে জ্বর ও আমাশয় আশ্চর্য্যরূপে চলিয়া গেল। তাঁহার কৃপা ও করুণা উপলব্ধি করিলাম, বিদায় লওয়ার সময় যে আশ্বাস ও অভয়বাণী দিয়াছিলেন তাহা আবার অনুভব করিলাম।

হৃষীকেশে অবস্থান কালে আমি কয়েকবার স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম যে আমি যেখানেই যাই—একটি শিশুবালক আমার কোলে থাকে, ইহাতে আমার মানসিক দ্বন্দ্ব আরও বৃদ্ধি পায়; তবে কি আমাকে বিবাহ করিতেই হইবে?

আজ তিন মাসের উপর হইল বাংলাদেশের আশ্রম হইতে পর্য্যটনে বাহির হইয়াছি; কোথাও বেশীদিন বিশ্রাম করি নাই বলিয়া ব্রহ্মচারী-বাবাকে চিঠিপত্রাদি লিখিতে পারি নাই। তাঁহার উপর অভিমানও ছিল। মনে প্রবল দ্বন্দ্ব—সংসারী হইব না, সন্ন্যাসী হইব। অকস্মাৎ আমার জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে কেন? পর্য্যটনে, পথশ্রমে ও ভাবনা চিন্তাতে শারীরিক ও মানসিক খুব ক্লান্ত হইয়াছি। এখন স্থির করিলাম আশ্রমে ব্রহ্মচারীবাবাকে একখানি চিঠি লিখিয়া এই সব স্বপ্ন বৃত্তান্ত, স্বপ্নাদেশ ও বাণী যাহা পাইয়াছি তাহা জানাইব। তিনি যখন শ্রীগুরুদেব ও সত্যদ্রষ্টা, তখন তাঁহার উপরই নির্ভর করিব। তিনি যাহা বলেন তাহাই করিব। যদি বলেন আমাকে সংসারী হইতে হইবে, বিবাহ করিতে হইবে, তবে তাহাই করিব। অতএব হৃষীকেশ হইতে বৈরাটি গৌরী আশ্রমে ব্রহ্মচারীবাবার নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়া একটি চিঠি লিখিলাম। প্রকৃত সত্যদ্রষ্টা গুরুর কাছে

সরলভাবে মনের কথা খুলিয়া বলিলে তাঁহার কৃপায় ও উপদেশে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। চিঠিখানি লিখিতে পারিয়াই যেন আমি অনেকটা স্বস্তিবোধ করিলাম এবং চিঠির উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

হৃষীকেশে প্রায় দুইমাস ছিলাম। এই সময় চেষ্টা করিয়াছিলাম বদরিকাশ্রমে যাইতে। যখন হৃষীকেশে পোঁছিয়াছিলাম তখনই যদি সোজা চলিয়া যাইতাম তাহা হইলে সে বৎসর বদরিকা আশ্রম আমার যাওয়া হইত। কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া যখন পরবর্ত্তী দলের সঙ্গে যাইতে চেষ্টা করিলাম, তখন বদরিকাশ্রমের রাস্তায় পাহাড় অঞ্চলে কলেরার প্রকোপ হওয়াতে গভর্ণমেন্ট সে বৎসর আর কোন যাত্রীদলকে যাইতে দিতেছিলেন না। তাই আমার আর বদরিকাশ্রম যাওয়া হইল না।

ইতোমধ্যে আশ্রমে ব্রহ্মচারীবাবার নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রোত্তর পাইলাম:—

কল্যাণবরেষু,

যোগদা, গতকল্য তোমার চিঠিখানা পাইয়াছি। এখনও আমাকে এখানেই থাকিতে হইতেছে। দেশের নেতৃবর্গ প্রায় ১৩।১৪ জন স্কুলের ছাত্রকে বয়ন কার্য্য শিক্ষার জন্য মতিরাম নাথের নিকট পাঠাইয়াছেন। অন্য জায়গায় সুবিধা না থাকায় তাহারা আশ্রমেই প্রসাদ পাইতেছে। তজ্জন্যই আমাকে এখানে থাকিতে হইতেছে। সিদ্ধাশ্রমে কেদার ও সুশীলকে রাখিয়াছি। শ্রীমান্ যোগেন্দ্র ও সুরেন্দ্র তথায় লেখাপড়া করিতেছে।

তুমি ৺কাশীধামে যে আদেশ পাইয়াছ, ইহা ৺শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বররূপে বাবারই আদেশ। আর স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছ, তাহাও ঠিক। আমি

জানি পূর্ব্ব হইতেই তোমার কাজ ভালই চলিতেছে। সেমতে লিখি, তোমার এই বুঝিতে হইবে—গন্তব্য স্থলে যাওয়ার সোজা পথই পাইয়াছ, কেন তুমি হতাশ হইয়া পথহারা লোকের মত অশান্তি ভোগ করিতেছ? ইহাই আদেশের অর্থ।

আর হৃষীকেশের স্বপ্নাদেশের অর্থ এই—জ্ঞানরূপ ছেলে তোমার কোলে। তাকে নিয়া যেখানে যাও, তাহার সুখ শান্তি হইবেই, দুঃখ কেবল তোমারই। তাই জানাইয়াছেন যে, জ্ঞানরূপ বালক হইয়া অর্থাৎ কর্ত্তা না সাজিয়া (বালক কোলে না লইয়া) মায়ের কোলে বসিয়া তাঁর ভালবাসা পাইবার জন্য পুনঃপুনঃ আবদার কর। মা হয়ত তোমার আবেগ-মাখান ডাক শুনিতে ভালবাসিয়া আরও ডাকিবার জন্য নীরব থাকিতে পারেন। এ জন্য অস্থির হইয়া মায়ের কোল হইতে নামিয়া ছুটাছুটি করিয়া দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ কেন? যে বিবেক লইয়া হতাশ হইতেছ, ইহাই বালক, অর্থাৎ যখন বুঝিবে মায়ের কোলে তুমি, তখনই তুমি বালক বা জ্ঞানস্বরূপ; তবেই তোমার দুঃখ নাই। যদিও দুঃখ তাপ আসে, ইহা তাপসের তাপ, বড়ই মিষ্ট।

আর তুমি মায়ের কোলে আছ কিনা, এমন ভ্রম হইলে বুঝিতে হইবে—যে নির্গুণ পরতত্ত্বে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড লয় পাইতেছে এবং যাহা হইতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইতেছে, ইনিই ব্রহ্মযোনি—আমাদের মা। শুধু আমাদের কেন, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডেরই মা। আচ্ছা, এখন বুঝিলে ত যে তুমি মায়ের কোলে।

তাই আমার ইচ্ছা সাধারণভাবে মাকে জানিয়া মায়ের কোলে বসিয়া উপাসনারূপ আবদার করিতে করিতে হ্লাদিনীস্বরূপা শক্তি প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণলীলার অধিকারী হও।

যদি বুঝিতে ভ্রম হয়, তবে স্থানে স্থানে সৎস্বরূপ ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের নিকট জানিয়া লইলেও ভাল। যদি একান্তই আসিতে বিলম্ব কর,

তবে চিঠি দিও। আর বিবাহের মত কর্ম্মপাশ আমিই ছেদন করিতে পারি। ইতি

গৌরীআশ্রম আশীর্ব্বাদক
১৩২৮।২১।২ তোমাদের একটা পাষাণে গড়া লোক"

উপরোক্ত পত্রোত্তর পাইয়া আমার মনের অশান্তি ও অস্বস্তি দূর হইল, এবং চিঠির ভাবে বুঝিলাম আমার আশ্রমে ফিরিয়া যাওয়াই উচিত। স্থির করিলাম যে আর পর্য্যটন না করিয়া শ্রীগুরুদেবের কাছে চলিয়া যাইব এবং তাঁহার উপরই সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ছাড়িয়া দিব, তিনি যাহা বলেন তাহাই করিব। হৃষীকেশেই আমার পর্য্যটন শেষ করিয়া বাংলা অভিমুখে রওনা হইলাম। পথে দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে দুই একদিন মাত্র থাকিয়া কলিকাতা পৌঁছিলাম। হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিবার সময় আমার ঝুলিটি লইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেজন্য এই সময়ের পর্য্যটনের ডায়েরী ও চিঠিখানা হারাইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় আমাদের আত্মীয় শ্রীমান্ কৈলাস অধিকারীর বাসায় দুইতিন দিন ছিলাম। কৈলাসই গাড়ীভাড়া দিয়াছিল—কলিকাতা হইতে সোজা শ্রীগুরুদেবের কাছে বৈরাটি—গৌরী-আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় দেখিলাম তখনও তাঁত-চরকা ও বয়নবিদ্যালয় ইত্যাদি সমানভাবেই চলিতেছে। ব্রহ্মচারীবাবা এইসব কার্য্যপরিচালনায় খুবই ব্যস্ত। তাঁহার সঙ্গে পর্য্যটন বিষয়ে অনেক আলাপ হইল। তাঁহাকে বলিলাম যে, পর্য্যটনে আমার শারীরিক কষ্ট অপেক্ষা মানসিক কষ্টই বেশী হইয়াছে, এবং তাঁহার দ্বিবিধ ভাবের চিঠিই আমার কষ্টের বিশেষ কারণ—পরে বুঝিয়াছিলাম যে আমারই বুঝিবার ভুল হইয়াছিল। কেন না আমি প্রথমেই ত তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে আমি সন্ন্যাসী হইব, বিবাহ করিব না ইত্যাদি—তিনি আমার কথা

শুনিয়া নীরব ছিলেন, তখন কোনই উত্তর দেন নাই। এখানেই আমার ভুল হইয়াছিল—নীরবতা বা চুপ করিয়া থাকা তো ঠিক উত্তর নয়—নিজের অদৃষ্ট ও ভবিতব্য না জানিয়া নিজে নিজে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে যাওয়া! অবশ্য আমার নিজের সিদ্ধান্ত করা সম্বন্ধে আমি তখন এত স্থিরসঙ্কল্প ছিলাম যে, ইহার যে আরও একটা বিশেষ দিক আছে অর্থাৎ—আমার জীবনের মধ্যে ভগবদিচ্ছা যে কি থাকিতে পারে—তাহা আমার অহঙ্কারের পুরু আবরণের জন্য চিন্তা করার ও অপেক্ষা করার অবসরই ছিলনা। এখন ঠেকিয়া ভুগিয়া শিক্ষা পাইয়াছি। আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপরই নির্ভর করিতেছি, আমাকে তাঁহার শ্রীচরণতলে বিলাইয়া দিয়াছি। তিনি যদি বলেন সংসারী হইতে, বিবাহ করিতে—তাহাই করিব। আর যদি আশ্রমে থাকিতে হয় তবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিব কারণ এখন আমি তো তাঁহার নির্দ্দেশ মত পর্য্যটন হইতে ফিরিয়াছি। ইহা শুনিয়া ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছিলেন— "এইভাবে গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শিখতে হয়। তোর কথা মার কাছে জিজ্ঞাসা করব, মা যা আদেশ করেন তাই করবি।"

তারপর তাঁহাকে বলিলাম নানা তীর্থস্থানে মহাপুরুষ খোঁজার কথা—প্রসিদ্ধ সব তীর্থে, তাঁহার কথিত ভগবদ্দর্শী ও ভগবদাদেশপ্রাপ্ত কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের সন্ধানই পাই নাই। একথাও বলিলাম যে, হৃষীকেশ হইতে হিমালয়ের দুর্গম তীর্থে বদরিকাশ্রমে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু তাহা পারি নাই। আমার বদরীনারায়ণ দর্শনের খুবই সাধ ছিল, এবং হিমালয়ের গভীর প্রদেশে বহু তীর্থস্থান আছে, বিশেষতঃ, শুনিয়াছি উত্তরকাশী অঞ্চলে চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও সিদ্ধমহাপুরুষ, যোগী সন্ন্যাসীদের সন্ধান পাওয়া যাইত। বদরিকাশ্রমে না যাওয়াতে আমার সাধ পূর্ণ হইল না। আমার কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারীবাবা বলিলেন যে, এতদঞ্চলে তেমন মহাপুরুষ আমার চক্ষেও পড়ে না। তবে তোমার

বদরিকাশ্রমে না যাওয়া ঠিকই হইয়াছে। বদরিকাশ্রমের বিষ্ণুশক্তি এখন মহাত্মা গান্ধীর উপর আবির্ভূত, তাই দেশব্যাপী এই বিরাট আন্দোলন। তবে মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা আসিবে না, শেষ কার্য্যের জন্য অপর একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে। এই সঙ্গে আরও বলিলেন যে, কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি মার আদেশ পাইয়াছিলেন বদরিকাশ্রমে যাইয়া বিষ্ণুশক্তির আবির্ভাব করাইবার জন্য। কিন্তু তখন তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার জন্য বদরিকাশ্রমে যাইতে অসমর্থ হন। পরে মায়ের পুনরাদেশে, এখান হইতেই প্রার্থনা করিয়া বিষ্ণুশক্তির আবির্ভাব করাইয়াছিলেন। ১৯২২ সনে ব্রহ্মচারীবাবা আবার বলিয়াছিলেন যে, বিষ্ণুশক্তি মহাত্মা গান্ধী হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

পর্য্যটন হইতে ফিরিয়া ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গেই গৌরী-আশ্রমে থাকিতেছি এবং শান্তভাবে অপেক্ষা করিতেছি। ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন যে, আমার সন্ন্যাস সংস্কার সম্বন্ধে মার কাছে জিজ্ঞাসা করিবেন। কয়েকদিন পরই একদিন সকালে উঠিয়া ব্রহ্মচারীবাবা আমাকে ডাকিলেন এবং খুব আনন্দের সহিত বলিলেন, "মা বলিয়াছেন যে তুই সন্ন্যাসীই, তোকে সন্ন্যাস সংস্কার দিব।" তারপর নিজেই একদিন পঞ্জিকা দেখিয়া দিন ধার্য্য করিলেন; এবং আমাকে গৌরী-আশ্রমে শ্রীশ্রীভারতেশ্বরী—সিংহবাহিনী উমা মূর্ত্তির সম্মুখে খুব আনন্দের সহিত সন্ন্যাস সংস্কার দিলেন। সামবেদীয় মহাবাক্যে আমার নূতন নাম যোগদানন্দ রাখিলেন। ইহা ১৩২৮ সন শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী পূর্ণিমা। সেদিন পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ছিল। ব্রহ্মচারীবাবার দেহরক্ষার পর যখন পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যোগদান করি শ্রীঅরবিন্দ আবার আমার নূতন নাম রাখিলেন—যোগানন্দ।

তপস্যা ও সাধনা

আমার সন্ন্যাস সংস্কারের পর আমি সিদ্ধাশ্রমে যাইয়া একনিষ্ঠভাবে সাধনা ও তপস্যায় নিবিষ্ট রহিলাম। মাঝে মাঝে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে ব্রহ্মচারীবাবার কাছে যাইয়া তাহা জানিয়া লইতাম এবং দিনকতক তাঁহার দিব্য সঙ্গ লাভ করিয়া আবার সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া সাধনায় নিবিষ্ট হইতাম। পর্য্যটন হইতে আমিই সর্ব্বপ্রথম ফিরিয়াছিলাম। পরে শান্তিদানন্দ, হৃষীকেশেই খুবই অসুস্থ হইয়া, বহুকষ্টে সিদ্ধাশ্রমে ফিরিয়া আসেন। আমি তখন মৌন ছিলাম। শান্তিদাকে সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য আমি মৌনব্রত ভাঙ্গিলাম। ক্রমে তিনি সুস্থ হইলেন। পরে ধীরানন্দ, দক্ষিণ ও উত্তর পশ্চিম ভারত পর্য্যটন করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। ইতোমধ্যে কেদার আশ্রমে যোগদান করিয়াছেন। আমরা পর্য্যটনে চলিয়া গেলে কেদার ব্রহ্মচারীবাবার উপদেশ মতো ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ছাত্র ও শিশুদের পড়াশুনার ভার গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন সিদ্ধাশ্রমে থাকিয়া পরে ছেলেদিগকে নিয়া নেত্রকোনা সহরে চলিয়া যান।

শান্তিদা সুস্থ হইলে পর, শান্তিদা, ধীরানন্দ ও আমি, আমরা তিনজনে ধ্যান ধারণা তপস্যায় একান্ত মনোনিবেশ করিলাম। উত্তরাখণ্ডে শঙ্কর মায়াবাদের প্রভাব খুবই বেশী। পর্য্যটনে— হরিদ্বার হৃষীকেশের বৈদান্তিক মায়াবাদের প্রভাব আমাদের উপরও খুব পড়িয়াছিল। ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম যে ব্রহ্মচারীবাবার ভগবদ্দর্শন, ভগবদাদেশ ও ভগবদুপাসনা ইত্যাদি দ্বৈতবাদমূলক। উপনিষদ্ ও বেদান্তমূলক অদ্বৈতবাদই সত্য। তখন আমরা আশ্রমের

শ্রীবিগ্রহাদির সেবাপূজা ভোগ-আরতি ইত্যাদি তেমন মনোযোগ ও ভক্তির সহিত আর করিতে পারিতাম না। আমাদের ধ্যানেও লক্ষ্য ছিল নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভে প্রত্যগাত্মাতে, সাক্ষীচৈতন্যে স্থিতিলাভ করা। নির্ব্বাণষটক তখন খুব আবৃত্তি করিতাম এবং ঐ লক্ষ্যে সর্ব্বদা মনকে কেন্দ্রীভূত করিতাম।

আমরা আশ্রমে অতি প্রত্যুষেই প্রায় ৪টা, ৪-৩০-এর মধ্যে উঠিয়া শৌচাদি সমাপন করিয়া আসন নাড়ীশুদ্ধি প্রাণায়াম ইত্যাদি সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ করিতাম এবং স্নানাদি সারিয়া অতি সংক্ষেপে পূজার্চ্চনা করিতাম এবং যৎসামান্য কিছু আহার করিয়া ধ্যানে বসিতাম। ধ্যানে আমাদের মন সহজেই স্থির ও শান্ত থাকিত। এখন আমরা তিনজনেই মনে খুব প্রবল সঙ্কল্প নিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভের জন্য অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম। তখন আমার সাধনার ও মনের কি অবস্থা হইয়াছিল, এখানে আমার সেইসব অভিজ্ঞতার কথাই লিখিতেছি। আগেই বলিয়াছি ধ্যানে অতি সহজেই আমার মন স্থির ও শান্ত সমাহিত হইত। মন এত স্থির ও শান্ত হইত যে কোন বৃত্তিরই ক্রিয়া আর থাকিত না। আমি যেন পিছনে বা কোথায় আছি সঙ্কল্প বিকল্প বা চিন্তা-স্রোত কিছুই উঠিতেছে না, শুধু অতিসূক্ষ্ম ও ক্ষীণ শ্বাস প্রশ্বাসটুকুর বোধ রহিয়াছে। তখন সেই ক্ষীণ শ্বাস প্রশ্বাসকে অবলম্বন করিয়াই ভিতর বাহির হইতে লাগিলাম। শ্বাস প্রশ্বাস সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া গেল। মনে হয় শ্বাসটির সঙ্গে ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকি বা উপরে উঠিয়া যাই, আবার নিশ্বাসটির সঙ্গে এইভাবে বাহিরে আসি বা নীচে নামিয়া যাই। এই অবস্থার সময় প্রায়ই খুব উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন হইত, যেন শুভ্র দীপ্ত গ্যাসের আলো ; সেই আলোতে দিনের আলোও নিষ্প্রভ মনে হইত এবং এই সময় প্রায়ই নানারকম সুমিষ্ট বাজনা শুনিতাম, মনে হইত যেন কোন সুদূর হইতে সুরতানের লহরী ভাসিয়া আসিতেছে।

এই অবস্থায় হঠাৎ এক এক সময়ে আর শ্বাস-প্রশ্বাসও থাকিত না, আমিও আর থাকিতাম না ; মন ও শ্বাস প্রশ্বাসের বিলয়ে যে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িতাম প্রথম প্রথম তাহা দশ পনর মিনিট, আধঘণ্টা থাকিত, তারপর জাগিতাম ; ক্রমে এই অসাড় অবস্থা এক ঘন্টা, দুই ঘন্টা, এমন কি তিন চার ঘন্টা পর্য্যন্ত থাকিত। জাগিয়া উঠিয়া প্রথম নিজের মাথাটিকে অনুভব করিয়াছি, তার পর শরীরের অন্যান্য অংশ। যে পদ্মাসনে ধ্যানে বসিতাম তাহাও অসাড় জড় হইয়া যাইত। পদ্মাসন ভাঙ্গিলে খানিক পরে ক্রমে স্পর্শবোধ, চলৎ-শক্তি ফিরিয়া আসিত। চক্ষুতারা পলক-বিহীন হইয়া থাকিত। কোনদিন হয়ত ধ্যান হইতে উঠিয়া ভিক্ষায় যাইব, একমাইল দুইমাইল দূর গ্রামে। হাঁটিবার সময় লক্ষ্য করিয়াছি চক্ষু পলকহীন, মন শান্ত ও স্থির, কোন বৃত্তির স্ফুরণ নাই। এই সময়ে আর এক প্রকার আশ্চর্য্য উপলব্ধি হইত। মন যখনই শান্ত হইয়াছে, দেখিয়াছি আমার শরীরটি পদ্মাসনে বসিয়া আজ্ঞাচক্রে ধ্যান করিতেছে। দুই তিন দিন এমন হইয়াছে। এক দিন যেই মনে করিয়াছি, এই তো আমার শরীর ধ্যানস্থ রহিয়াছে—আমি শরীরের বাহির হইয়া শরীর ধ্যানস্থ দেখিতে পাইতেছি—এই ভাবে ব্রহ্মচারী বাবাকে দেখা যায় কি না দেখি, অমনই বৃত্তির উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার শরীরে জাগ্রত হইয়া বুঝিলাম যে আমি ধ্যান করিতেছি। ধ্যানের ও মনের একাগ্রতার প্রভাবে আমার সূক্ষ্ম শরীর বাহির হইয়া স্থূল শরীরকে ধ্যানস্থ দেখিল কিন্তু এও অনুভব করিলাম যে স্থূল ইন্দ্রিয় না থাকিলেও জড়ের মত সবই দেখা যায় যেমন স্বপ্নে দেখা যায়। আমি আমার শরীর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই সময় এইভাবে কয়েকমাসের একনিষ্ঠ ধ্যান ও একাগ্রতার ফলে অজ্ঞান সমাধি হইত। ভাবিতাম মনকে লয় করা পর্য্যন্ত আমার চেষ্টা, মন বিলয় হইলে আর আমি থাকি না—এক অজ্ঞানে পড়িতাম, সেই অজ্ঞান হইতেই শরীর ও প্রাণে মনে

আবার জাগ্রত হইতাম। আর ভাবিতাম, জ্ঞান তো স্বয়ংপ্রকাশ কখন আমি জ্ঞানে বা চৈতন্যে ব্যুত্থিত হইব?—যখন স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান বা চৈতন্যসত্তা কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বরণ করিবেন। এই সময় মাত্র একদিন মুহূর্ত্তের জন্য কি এক বিরাট ভূমা চৈতন্য বা জ্যোতির্ম্ময় সত্তাতে পড়িয়াই তৎক্ষণাৎ শরীর-চেতনায় ব্যুত্থিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। মুহূর্ত্তমাত্র কি এক ভূমা ও বিরাট জ্যোতির্ম্ময় আনন্দময় সত্তার অনুভূতি পাইয়াছিলাম তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে পারিব না যদিও তাহা মুহূর্ত্তমাত্র।

ব্রহ্মচারীবাবার নিকট যাইয়া এই সময়ের এই সব অভিজ্ঞতার কথা বলিলে তিনি বলিলেন, "তোমরা বড় খামচাইয়া খামচাইয়া যাইতেছ।" তাঁহার বাম হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করত দেখাইয়া বলিলেন, "তোমাদের সিদ্ধি আমার হাতে।" আমি মনে করিয়াছিলাম আমাদিগের সাধনায় খুব উন্নতি হইয়াছে; তিনি খুব ভাল বলিবেন। কিন্তু তিনি এইভাবে সাধনা করাকে খুবই নিরুৎসাহ করিলেন এবং স্পষ্টই মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দেখাইলেন ও বলিলেন যে আমাদের সিদ্ধিকাঠি তাঁহারই হাতে, আর বৃথা চেষ্টা করিয়া কি হইবে? তবে আমি ইহা বুঝিয়াছি মানুষী ক্ষুদ্র চেষ্টায় বা সাধনায় মনকে যতটুকু শান্ত স্থির ও সমাহিত করা যায়—আমরা রাজযোগ অবলম্বনে তাহা মাত্র কয়েক মাসের চেষ্টায় কতটুকু ফল লাভ করিয়াছিলাম। অবশ্য আমাদের শরীর প্রাণ ও মন তৈরী হইয়াছিল ইহার আগের দুই তিন বৎসরের সাধনা ও তপস্যা, বিশেষতঃ সৎগুরুর জীবন্ত ও সাক্ষাৎ প্রভাবে। তপস্যা ও ধ্যানের যে কি ফল তাহা হাতে হাতে পাইয়াছিলাম। আমার মন ধ্যানে অতিসহজেই শান্ত সমাহিত হইত আগেই বলিয়াছি। কামভাব তখন যেন শরীর ও প্রাণ হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মচারীবাবার কাছে বলার পরই যখন তিনি এইভাবে সমাধিসাধন সম্বন্ধে নিরুৎসাহ করিলেন তখন আমাদেরও আর উৎসাহ

রহিল না এইভাবে সাধনায়। বাহির হইতে বাধাও আসিতে লাগিল। আশ্রমের কার্য্যে, প্রচারের কার্য্যে বেশী সময় দিতে হইত। বুঝিলাম আমাদের নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভে আত্মজ্ঞান লাভ হয়ত তাঁহার উদ্দিষ্ট নয়, হয়ত তিনি আমাদের মধ্যে অন্য কোন প্রকার আধ্যাত্মিক সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিয়াছেন, অর্থাৎ আমাদের ভাগবত চেতনা ও ভাগবত জীবনলাভে দিব্যরূপান্তর হইবে এই প্রত্যাশা করেন।

শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে

ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে যখনই দেখা করিতাম, তাঁহাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতাম—বাবা, আপনি যে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন শ্রীশ্রীজগন্মাতার আবির্ভাব হইয়াছে, মা ভারতবর্ষে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, শীঘ্রই মার মহাপ্রকাশ হইবে। কোথায় মার আবির্ভাব হইয়াছে? মা কোন্ শরীর গ্রহণ করিয়াছেন? কি ভাবে মার মহাপ্রকাশ হইবে? তিনি সর্ব্বদাই প্রায় একই উত্তর দিতেন যে মা এখনও আমাকে সে কথা বলিতেছেন না। তবে মার মহাপ্রকাশ হইলে আমি জানিতে পারিব এবং এবার অনেকেই মাকে জানিতে পারিবে। আর তোমাদের মত তো আমার মন নয়, তোমরা আমাকে যেমন সর্ব্বদা প্রশ্ন কর তেমন ভাবে আমি মাকে ত প্রশ্ন করিতে পারি না। মা আমাকে সাধন ভজন করাইয়াছেন, সিদ্ধিলাভ করাইয়াছেন অর্থাৎ আমাকে সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব জানাইয়াছেন এবং আমাকে বাণী দিয়াছেন যে তিনি জগৎকল্যাণের জন্য তাঁহার সমস্ত দেবশক্তি সহ পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইয়াছেন—অচিরেই তাঁহার মহাপ্রকাশ হইবে। তবে এই সমস্ত সময়ের হিসাব মানুষী ধারাতে হয় না—"ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত নরের ষাট হাজার বৎসর।" কিন্তু মা যখন বলিয়াছেন এবং আমাকে সে জ্ঞান দিয়াছেন, তখন তাহা হইবেই হইবে, এই আমার সিদ্ধিলাভ। আমি সেই প্রতীক্ষাতেই আছি। আমি জানি বিগত যুদ্ধে মা ইউরোপের অপক্ষাত্র শক্তি হ্রাস করিয়া এবং ম্লেচ্ছশক্তিকে......খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ভারতে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।"

(১৯২০-১৯২৪)

ব্রহ্মচারীবাবা যখন বলিয়াছেন যে মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা ভারতের স্বাধীনতার শেষসিদ্ধি আসিবে না তজ্জন্য আর একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন, তখন আমি ভাবিতাম তিনিই হইবেন শ্রীঅরবিন্দ। কারণ আমার দশ বার বৎসর বয়সেই স্বদেশীযুগে শ্রীঅরবিন্দের অগ্নিময়ী বাণী শুনিয়াছিলাম, তাহা আমার অস্থি-মজ্জায় শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছিল; ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, ইহা অপেক্ষা উচচ আকাঙক্ষা আমার তখন ছিল না। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাইয়া শ্রীঅরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরীতে গিয়া তপস্যা যোগসাধনায় মগ্ন হইলেন তখন আমাদের নিশ্চিত ধারণা হইল যে তিনিই ভারতের স্বাধীনতার নিমিত্তই এই তপস্যা ও সাধনা করিতেছেন। ব্রহ্মচারীবাবাকে একদিন পরিষ্কার ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলাম যে তবে কি শ্রীঅরবিন্দই সেই মহাপুরুষ যিনি ভারতবর্ষ স্বাধীন করিবেন। সমস্ত বাঙ্গালী জাতির এই বদ্ধমূল ধারণা যে শ্রীঅরবিন্দ একদিন পণ্ডিচেরী হইতে বাহির হইয়া আসিবেন দেশের কাজের জন্য, কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবার কাছে যে উত্তর পাইলাম তাহাতে আমি হতাশই হইলাম। তিনি বলিলেন, "আমি শ্রীঅরবিন্দকে যে ঊর্দ্ধ্বলোকে পাই সেখানে গেলে মহাপুরুষগণ আর ফিরেন না। তোমরা কি করিয়া ভাব যে শ্রীঅরবিন্দ আবার দেশের কাজ করিতে নামিয়া আসিবেন।"

অন্য একদিন ব্রহ্মচারীবাবা শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "হিমালয়ের নিম্নে শ্রীঅরবিন্দের মত এত বড় যোগী আর নাই।"

বাংলাদেশে, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে, এবার অবতার আসিয়াছেন এইরূপ জনশ্রুতি। এই সময়ে ঐ প্রদেশে পাঁচ ছয়জন মহাপুরুষ আছেন এবং প্রত্যেক মহাপুরুষের শিষ্যগণ নিজেদের গুরুদেবকেই অবতার বলিতেছেন। বৃন্দাবনের কঠোরতপা ব্রহ্মজ্ঞ যোগী শ্রীমৎ কাঠিয়াবাবার অন্যতম শিষ্য শ্রীমৎ দ্বারিক তপস্বী তাঁহার গুরুদেবের মুখে উপরোক্ত জনশ্রুতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন ইঙ্গিত পান। এবং সেই আভাস

অনুযায়ী দ্বারিক তপস্বী পূর্ব্ববঙ্গের ঠাকুর দয়ানন্দ, ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধু এবং আমাদের গুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারীবাবার নিকট কয়েকবার যাওয়া আসা করিয়াছিলেন এবং এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তাপস দ্বারিক খুব উচচশ্রেণীর একজন সাধক ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের প্রকট মহাপুরুষগণের মধ্যে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া তাঁহার গুরুদেব কথিত বাণীর সত্যতা অনুসন্ধান করিতেন মনে হয়। কঠোরতপা যোগী কাঠিয়াবাবার বাণী এবং তাপস দ্বারিকের নিবিড় অনুসন্ধানের ফলেই এই জনশ্রুতি পূর্ব্ববঙ্গে খুব প্রচারিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধুর শিষ্যগণের সে-দাবি তাঁহাদের প্রভুর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী। প্রভুর দেহরক্ষা হইলে সে-দেহ তাঁহারা আজও খুব যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, সে-দেহের সংকার হয় নাই। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রভু যথাকালে এই রক্ষিত দেহে আবার আবির্ভূত হইবেন। এই রক্ষিত দেহের সম্মুখে অহোরাত্র প্রভুর নামকীর্ত্তন হইতেছে। প্রভু জগদ্বন্ধু শেষ জীবনে বাতব্যাধিরোগে একেবারে অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। এতদঞ্চলের জনৈক প্রভুভক্ত সম্প্রতি ফরিদপুর গিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। প্রভুর উক্ত ভক্তটি ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে প্রভুর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। শিষ্যের মুখে এই সব কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারীবাবার খুব দুঃখ হইল। অবতারকল্প মহাপুরুষের এই অবস্থা! সেদিন ব্রহ্মচারীবাবা কাঁঠালতলী স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর দত্তরায় মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন; আমিও উপস্থিত ছিলাম। ভক্তটি ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গ করিয়া চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারীবাবা যাইয়া শুইলেন। মার কাছে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে বা আদেশ লইতে হইলে তিনি এইভাবে কোন নির্জন স্থানে যাইয়া শুইতেন। ঘন্টা দুই পরে ব্রহ্মচারীবাবা বাহিরে আসিয়া আমাদের কাছে বলিলেন, "তোমরা যে বল পূর্ব্ববঙ্গে এত সব অবতার, মার খাতায়

তো কারো নাম নাই। মার খাতায় একটিমাত্র নাম দেখিলাম তিনি হইতেছেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।"

ধীরানন্দ পাঠ্যাবস্থায় বিপ্লবপন্থী দলভুক্ত ছিলেন। "শ্রীঅরবিন্দের পত্র" পুস্তকখানা গোপনে রাখিতেন। ১৩২৫ সনে লক্ষ্মীয়ার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ধর মহাশয়ের বাড়ীতে একদিন ব্রহ্মচারীবাবাকে নিরালা পাইয়া উক্ত বইখানি তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীঅরবিন্দের ফটো দেখিয়া ব্রহ্মচারীবাবা ধীরানন্দকে বলিয়াছিলেন, "ইনি (শ্রীঅরবিন্দ) স্বামী বিবেকানন্দের জ্যেঠা। তোরা যদি শ্রীঅরবিন্দকে দেখিস তবে আমাকে আর ভালবাসিবি না।"

পরবর্ত্তীকালে ব্রহ্মচারীবাবার এই উক্তিটি শ্রীঅরবিন্দকে লিখিয়া জানাইলে তিনি নিম্নলিখিত উত্তর দেন—

No, certainly, no physical relation. What he (Gurudev) must have meant was a superior in knowledge or power or generally greater than Vivekananda.

8-7-1937. Sri Aurobindo

অনুবাদ :—না, বাস্তব কোন সম্বন্ধের কথাই নয়। তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন, বিবেকানন্দ অপেক্ষা জ্ঞানে বা শক্তিতে শ্রেষ্ঠ, অথবা সাধারণতঃ মহত্তর।

শ্রীযুক্ত সুরেশ সরকার, হাসামপুর, একদিন প্রার্থনা করিতে করিতে একটি বাণী পাইয়াছিলেন—"অরবিন্দের নেতৃত্বে"। এই বাণীটি শ্রীঅরবিন্দকে লিখিয়া জানাইলে তদুত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন—

It is too general a phrase for any particular sense beyond this that it is under Aurobindo's

leadership or guidance that the work will be done that has to be done.

24-7-1937 Sri Aurobindo

অনুবাদ :--বাক্যটি এরূপ সাধারণভাবের যে ইহাকে কোন বিশিষ্ট অর্থে ব্যাখ্যা করা যায় না, তবে এইটুকু অর্থ থাকিতে পারে যে অরবিন্দের নেতৃত্বে বা চালনাতে করণীয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও কৌতূহলপূর্ণ হইল ব্রহ্মচারীবাবা শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আমার কাছে যাহা বলিয়াছেন। তিনি তখন বৈরাটি গৌরী-আশ্রমে ছিলেন। ১৯২৪ সন হইবে। আমিও তখন গৌরী-আশ্রমে উপস্থিত আছি। ব্রহ্মচারীবাবা মায়ের ঘরেই (ঠাকুর-ঘরে) শয়ন করিতেন। একদিন খুব ভোরে সেই ঘর হইতে আমাকে ডাকিলেন—"যোগদা, যোগদা ,(যোগদানন্দ আমার সন্ন্যাসের নাম, তিনি আমাকে যোগদা বলিয়া ডাকিতেন) শুন্ এসে।" আশ্রম প্রাঙ্গণের বড় ঘরটিতে আমি ছিলাম, ব্রহ্মচারীবাবার ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কি বাবা ? হাতমুখ ধুইয়া ব্রহ্মচারীবাবা মায়ের ঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন যে, কাল রাত্রে মা বলিয়াছেন, "সমুদ্রতীরে যাইয়া একজন বড়লোকের সঙ্গে তোর দেখা করিতে হইবে।"

তারপর তিনি নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন, "একজনের কাছে যাওয়া মানে তাঁকে স্বীকার করা, মা তো আমার কোন আধ্যাত্মিক অভাব রাখেন নাই যে তজ্জন্য কারো কাছে যেতে হবে তবে তাঁর নিজের কাজের জন্য যাঁর কাছে বলবেন তাঁর কাছেই যাব। তবে একজন দেখি যাঁর কাছে যাওয়া যায়, তিনি হচ্ছেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।"

মার আদেশটি তিনি নিজেই এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া নিস্তব্ধ রহিলেন। আমিও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। তখন আমার জানা ছিল না

যে শ্রীঅরবিন্দ যে পণ্ডিচেরীতে আছেন তাহা সমুদ্রতীরে। আমাদের কল্পনা মত ভাবিয়াছিলাম যে কোন প্রাচীন মহাপুরুষ হয়ত বৈদিক ও ঔপনিষদিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ধনুর্ব্বেদ ইত্যাদি লইয়া চট্টগ্রামের পাহাড় অঞ্চলে সমুদ্রতীরে অথবা বঙ্গোপসাগরের তীরে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে বসিয়া আছেন সময়ের প্রতীক্ষায়। আমার পণ্ডিচেরী আসার প্রায় দুইতিন বৎসর পরে ব্রহ্মচারীবাবার এই উপরোক্ত আদেশটি এবং আরও দুই একটি আদেশ শ্রীঅরবিন্দকে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম এবং তিনি উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই—

The utterances of your Guru when put together seem to be clear enough. They were a number of half-veiled indications as to where he had to go to meet the Mother.

12-1-1935 Sri Aurobindo

বঙ্গানুবাদ :—তোমার গুরুর বাণীগুলি একসঙ্গে পড়িলে তাহার অর্থ বেশ পরিকারই মনে হয়। শ্রীমায়ের সাক্ষাৎকারের জন্য কোথায় যাইতে হইবে, সেই বিষয়ে এগুলি অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন নির্দ্দেশ।

১২।১।৩৫ শ্রীঅরবিন্দ

As for the Adesh, people speak of the Adesh without making the necessary distinctions, but these distinctions have to be made. The Divine speaks to us in many ways and it is not always the imperative Adesh that comes. When it does, it is clear and irresistible; the mind has to obey and there is no question possible, even if what comes is contrary to the preconceived ideas

of the mental intelligence. It was such an Adesh I had when I came away to Pondicherry. But more often what is said is an intimation, even less, a mere indication, which the mind may not follow because it is not impressed with its imperative necessity. It is something offered but not imposed perhaps something not even offered but only suggested from the Truth above. *The indication about going to the seaside and meeting a great person was very evidently such a lesser thing. It was not precise and its form is not imperative. If it had been followed in the body, it might have changed many things, but that was not in the destiny of your Guru—he came here only in the subtle existence. He himself said that it was his work to prepare the ways for the Mother and that, spiritually, he had done.*

5-1-1936 Sri Aurobindo

অনুবাদ :— লোকে আদেশ সম্বন্ধে কথা বলে প্রয়োজন অনুযায়ী ভেদাভেদ না করিয়া, কিন্তু এই ভেদাভেদ করিতেই হইবে। ভগবান্ আমাদের সাথে নানা ভাবে কথা কহেন। তাঁহার বাণী যে অবশ্যপালনীয় আদেশরূপেই সর্ব্বদা আসে, তাহা নহে। যখন ঐ মূর্ত্তিতে আসে, তখন উহা সুস্পষ্ট ও অনিবার্য্য ; মনকে তাহা পালন করিতেই হয়, ইতস্ততঃ করিবার কোন উপায়ই নাই, সে আদেশ মানুষের মনোবুদ্ধির পূর্ব্বসংস্কারের বিরোধী হইলেও নাই। আমি যখন পণ্ডিচেরী চলিয়া আসি তখন এই প্রকার আদেশই পাইয়াছিলাম। কিন্তু বেশীরভাগ সময়ে

যে-বাণী আসে তাহা অভিপ্রায়জ্ঞাপন মাত্র, হয়ত তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র কিছু, শুধু নির্দ্দেশ,—যাহা মন না মানিতেও পারে, এই কারণে যে উহার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মনের প্রতীতি হয় নাই। উহা এমন বস্তু যাহাকে উর্দ্ধ্বলোকের সত্য আমাদের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছে কিন্তু আমাদের স্কন্ধে আরোপিত করে নাই,—হয়ত "আনিয়া ধরিয়াছে" ও বলা যায় না, বরং সূচিত হইয়াছে। সমুদ্র তীরে গমন ও মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে যে নির্দ্দেশ, তাহা এইরূপ একটা ক্ষুদ্রতর ব্যাপার বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। কেননা তাহার অর্থ খুব স্পষ্ট ছিল না, এবং তাহার ভাষার গঠনও অমোঘ অনুজ্ঞার সূচনা করে না। যদি উহা এই দেহে পালিত হইত, তাহা হইলে অনেক কিছুর পরিবর্ত্তন হইত, কিন্তু তাহা তোমার গুরুর অদৃষ্টে ছিল না—তিনি শুধু সূক্ষ্ম সত্তাতে এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি নিজেই ত বলিয়াছিলেন যে তাঁহার কাজ শ্রীমায়ের আবির্ভাবের পথ পরিষ্কার করা—এবং তাহা তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে করিয়াছিলেন।

৫।১।৩৬ শ্রীঅরবিন্দ

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, আমরা সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ সকলে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিলে সন্ন্যাসী অধ্যুষিত-উত্তরাখণ্ডের শাঙ্কর মায়াবাদ আমাদের সবার উপরই খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমাদের গুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবার যে শিক্ষাদীক্ষা, সাধনা ও উপদেশকে আমরা পূর্ব্বে সহজ সরলভাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম—তাহা এখন সংশয় ও বিচারের চক্ষে দেখিতে লাগিলাম। ব্রহ্মচারীবাবার ভগবদ্দর্শন, ভগবদাদেশ প্রাপ্তি ও সাধনা প্রণালীকে দ্বৈতবাদ বলিয়া আমরা স্থির করিলাম। তিনিও আমাদের এই অমূলক সন্দেহকে খুব সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া তাঁহার সত্যোপলব্ধি ও সত্যদৃষ্টি দ্বারা আমাদের সংশয় সমস্যাদি আমাদের বুদ্ধি ও ধারণার কাছে

পরিষ্কার করিয়া দিতে অশেষ প্রযত্ন করিলেন। আমাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা "ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার সন্দেহ সংশয় ব্রহ্মচারীবাবার সহজ সরল কথা শুনিয়া ও তাঁহার পত্রাবলী পড়িয়া মিটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু শান্তিদানন্দ ও মোক্ষদানন্দ দুইজনেই সূক্ষ্ম বিচারশীল ব্যক্তি। তাঁহাদের তাহাতে পূর্ণ মীমাংসা হইল না। মোক্ষদানন্দ ব্রহ্মচারীবাবাকে অনুভূতিসম্পন্ন, সত্যদ্রষ্টা এবং তত্ত্ববিদ্ বলিয়া স্বীকার করিতেন বটে কিন্তু তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায় তিনি শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ নন্—এইরূপ বলিতেন। ব্রহ্মচারীবাবা বেদবেদান্তমূলক অদ্বৈততত্ত্বকে স্বীকার করা সত্বেও শান্তিদানন্দ তাঁহাকে দ্বৈতবাদী বলিয়া ধরিয়া লইতেন এবং বলিতেন যে তাঁহার ভগবদুপলব্ধি ও ভগবদুপাসনা দ্বৈতবাদমূলক। ব্রহ্মচারীবাবা শান্তিদানন্দের এইসব মতবাদ বা খণ্ডন-বিখণ্ডন সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেন যে শান্তিদা কোন কারণে জিদ্ করিয়া এই সব করিতেছে, ভিতরের ব্যাপার অন্যরূপ। এ সম্বন্ধে তিনি আমাদের নিকট কখনও খুলিয়া কিছু বলেন নাই। ব্রহ্মচারীবাবা চিরকালই শান্তিদাকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন ও ক্ষমা করিতেন। শান্তিদার অন্যায় আবদার ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেন। পরে যখন এই দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ সম্বন্ধে, বাদানুবাদ শিকড় গজাইয়া বিস্তার করিয়া বসিল তখন শান্তিদা একদিন ব্রহ্মচারীবাবাকে প্রকাশ্যেই বলিলেন যে তিনি তাঁহাকে খণ্ডন করিবেন এবং ব্রহ্মচারীবাবাও উত্তর দিলেন, "আমি খণ্ডে খণ্ডেই থাকিব।" এইভাবে শান্তিদা আশ্রম হইতে বাহির হইয়া স্বতন্ত্রভাবে রহিলেন। আমরা কয়েকজন ব্রহ্মচারীবাবার কৃপায় অতিসহজেই শান্তিদার প্রভাব হইতে মুক্ত হইলাম।

এই সময় ব্রহ্মচারীবাবা আমাদিগকে বলিলেন, "এতদ্দেশে একাধারে শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ (ব্রহ্মজ্ঞান ও ভাগবদুপলব্ধি এবং বেদজ্ঞান বা

শাস্ত্রজ্ঞান একাধারে থাকা চাই) আমার চক্ষে পড়ে না। যাহা হউক আমার অনুভূতি ও উপলব্ধি দ্বারা আমি যে তত্ত্ব জানিয়াছি তাহা তোমরা অন্যান্য তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া নিতে পার, আমার চক্ষে পড়ে একমাত্র শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ যাঁহার কাছে তোমরা তোমাদের সংশয় ও সমস্যার প্রকৃত সমাধান পাইতে পার।"

আমরা তিনচার জন, কুমুদানন্দ (কেদার), ধীরানন্দ ও আমি, ব্রহ্মচারীবাবার সাহায্যে আমাদের জিজ্ঞাস্য এক পত্রে লিখিয়া তাহা কুমুদানন্দের নামে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের নিকট পাঠাই এবং বারীনদা শ্রীঅরবিন্দের বাচনিক যে পত্রোত্তর দেন তাহাতে আমাদের সমস্যার সমাধান হয় এবং ব্রহ্মচারী বাবাও খুব সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হন। ব্রহ্মচারী-বাবা সে পত্র পড়িয়া বলিয়াছিলেন—"এই একটি ব্যক্তির মাথা ঠাণ্ডা আছে।" এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে শ্রীঅরবিন্দের বাংলা চিঠিখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩৩১ সন, পৌষ। (পৃঃ ১২২)

শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী মায়ের আবির্ভাব

(ভারতের রাজলক্ষ্মী ও স্বাধীনতা)

ব্রহ্মচারীবাবার সাধনকালে ১৩১৩ সনে (ইংরাজী ১৯০৬) একটি আদেশ আসিয়াছিল যে বৃন্দাবন বেলবনে যাইয়া শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী মাকে আনিতে হইবে। ১৩৩১ সনে প্রায় আঠার উনিশ বৎসর পরে আবার মায়ের আদেশ আসিল যে জগতের মহামঙ্গলের জন্য বেলবনে যাইয়া শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী মায়ের আবির্ভাব করাইতে হইবে। তজ্জন্য ব্রহ্মচারী-বাবা ১৩৩১ সনের শ্রাবণমাসে বৃন্দাবন বেলবনে যাইয়া সেখানে মহালক্ষ্মী-মায়ের মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রায় তিন সপ্তাহ অনাবৃত জায়গায় বৃষ্টি ও রৌদ্রের মধ্যে হত্যায় (সর্ব্বাঙ্গ দণ্ডবৎ) থাকিয়া শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী মায়ের আবির্ভাব করান। তথায় শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া আনিয়া পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চিত্রধাম আশ্রমে তাহা স্থাপন করিয়াছিলেন। "ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী" পুস্তকে তাহা লিখিত হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন যে যখন দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে শ্রীরাধার সঙ্গে লীলা করিয়াছিলেন তখন হইতেই শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী মা বেলবনে লুক্কায়িতা ছিলেন। তদবধিই ভারত-বর্ষের রাজনৈতিক পরাধীনতার সূচনা হইয়াছিল। এখন প্রায় সহস্র বৎসর যাবত ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাধীন রহিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী মার আবির্ভাব হওয়াতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথে আর কোন বাধা নাই। শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মীই ভার-তের রাজলক্ষ্মী। এমন কি বেলবনেই ব্রহ্মচারীবাবা মহালক্ষ্মী মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মা তুমি যখন অহেতুকী কৃপাপরবশ

হইয়া আবির্ভূতা হইয়াছ তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই, জগতে শান্তি-স্থাপন হইবেই, আমার কাজ কি শেষ হইয়াছে? আমি এখন শরীর ছাড়িতে পারি কি?" তখন শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী মা ব্রহ্মচারী বাবাকে বলিয়াছিলেন, "এই শরীর দ্বারা আরও কাজ আছে।" এইভাবে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবেই ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় এবং অমোঘ ভগবদ্বিধান—এই ১৫ই আগষ্ট হইতেছে ভারত-আত্মার ও স্বাধীনতার মূর্ত্ত প্রতীক এবং মহাযোগীশ্বর, পৃথিবীতে অতিমানস ভাগবত তত্ত্বের ও মানব সভ্যতায় দিব্য জীবনের প্রতিষ্ঠাতা ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবস। অতএব এই মহাপুণ্যদিবসটি বিশেষ আধ্যাত্মিক গূঢ়ার্থসূচক।

ব্রহ্মচারীবাবা বলিয়াছেন যে মহালক্ষ্মী মা আবির্ভূতা হইয়া অনেক সর্ত্ত করিয়াছেন। সে-সব সর্ত্ত প্রতিপালিত না হইলে যে কোন সময় তিনি অন্তর্হিতা হইয়া যাইবেন। মোটামুটি সে-সব সর্ত্তগুলি এইরূপ :—

১। কুমারী মেয়েদের দ্বারা মহালক্ষ্মীমায়ের পূজার্চ্চনা ও ভোগরাগ সেবা ইত্যাদি করাইতে হইবে।

২। ভোগেরও আবার নানারকম উপদেশ। একমাত্র নিরামিষ ভোগ দিতে হইবে—নানারকম উপাদান ও উপাদেয় দ্রব্যসম্ভারে।

৩। বিশেষরূপে নিষিদ্ধ ছিল আশ্রমে কেহই তামাক খাইতে পারিবে না।

৪। ব্রহ্মচারীবাবার শরীর কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ব্রহ্মচারীবাবা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে মাদকদ্রব্য সেবনকারী ও মিথ্যাবাদী তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তাঁহার শরীরের উপর দিয়া ঝড় বহিয়া যাইবে। এই সব সর্ত্তসমূহের কোনটিই বেশী দিন রক্ষিত হয় নাই। সর্ব্বপ্রথম, ব্রহ্মচারীবাবা সর্ব্বদা সর্ব্বজনগম্য ছিলেন, যে

কেহ আসিত সে প্রথমেই তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতে পাইত। কে কাহাকে নিষেধ করিবে? তিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। উন্মুক্ত জায়গায় পড়িয়া থাকিতেন। মহালক্ষ্মী মাকে চিত্রধাম আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করিবার পরে অজপানন্দ কিছুদিন তাঁহার শরীররক্ষক ছিলেন। আশ্রমের যে ঘরে ব্রহ্মচারীবাবা সর্ব্বদা বাস করিতেন, তাহার দ্বার প্রায়শঃ উন্মুক্ত থাকিত। কয়েকটি নোটিশ লিখিয়া টাঙাইয়া দেওয়া হইল! কিন্তু নোটিশ পড়ার আগেই স্বয়ং ব্রহ্মচারীবাবাকে দেখা যাইত। কে নোটিশ পড়িবে! তামাক তো পুরাদমেই চলিত! পল্লীগ্রামের লোক, অধিকাংশ অশিক্ষিত, ব্রহ্মচারীবাবার এইসব আধ্যাত্মিক গুরুত্বপূর্ণ ও নিগূঢ়ার্থসূচক কথার প্রকৃত মর্ম্ম খুব কমই বুঝিত। তাঁহাকে তেমন ভাবে রাখারও কোন ব্যবস্থা ছিল না। একটি ঘরও ছিল না যেখানে তিনি একাকী থাকিতে পারিতেন। মহালক্ষ্মীমা বার বার সাবধান ও সতর্ক করিয়া দিতেছিলেন যে আশ্রমের নিয়মাদি যথাযথ রক্ষিত হইতেছে না। ব্রহ্মচারীবাবা প্রায়ই বলিতেন, "মা চলিয়া যাইবেন।"

শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ কেন তাঁহাদের শিষ্যগণ হইতে এত স্বতন্ত্র থাকেন তাহার মর্ম্মার্থ পরবর্ত্তীকালে পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগদান করিয়া আমি এইভাবে বুঝিয়াছিলাম। অবশ্য আধ্যাত্মিক জগতে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ব্রহ্মচারীবাবার গুরুশিষ্য সম্বন্ধেরই মত। পণ্ডিচেরী আশ্রমেই ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম। তবে ইহা খুবই স্বীকার্য্য যে, পুরাতন চেতনা ও পুরাতন জীবনের রূপান্তর-সাধনে—(Transformation) অতিমানস যোগে গুরু ও শিষ্যে স্বাতন্ত্র্য হয়ত আরও বেশী প্রয়োজনীয়।

ভাগ্যবিপর্য্যয় ও পর্য্যটন

ব্রহ্মচারীবাবার স্বাস্থ্য বৎসর দুই তিন আগে হইতেই ভাঙ্গিতেছিল। বিগত পাঁচ ছয় বৎসরেই তাঁহার প্রচারকার্য্য ও শিষ্য-সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। তাহাতে তাঁহার পরিশ্রম খুব বাড়িয়া যায়। তিনি এতদঞ্চলে সর্ব্বদাই পায়ে হাঁটিয়া গ্রামে গ্রামে যাতায়াত করিতেন। কিন্তু বৃন্দাবন যাইবার কিছুকাল পূর্ব্বে হইতে আর হাঁটিতে পারিতেন না। কোমরে ও হাঁটুতে জোর পাইতেন না। খাওয়াও ছিল অতি সাধারণ। যাহা সর্ব্বসাধারণে খাইত তিনিও তাহাই খাইতেন; তাঁহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে দিতেন না। শেষ সময়ে যখন অসুস্থতা বাড়িল, তখন সাধারণ ভিক্ষার চাউলের মোটা ভাত আর খাইতে পারিতেন না, কষ্ট হইত; তাহা সত্ত্বেও তেমন কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। একদিনের করুণ কাহিনী মনে আছে, তখন ব্রহ্মচারীবাবা চিত্রধাম আশ্রমে। ১৩৩২ সনের শেষভাগ বা ১৩৩৩ সনের প্রথম ভাগ হইবে। ভারতসমাজ-গঠন প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন হইতেছে। গৃহস্থ শিষ্য ভক্তগণ যাঁহারা গুরুদেবের অন্তরঙ্গ ও অগ্রণী তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত আছেন—উপেন্দ্রকিশোর দত্ত রায়, নকুল সরকার, সুরেন্দ্রমোহন দত্ত, সুরেশ সরকার, যামিনী কর বর্ম্মা, অজপানন্দ ও আমি এবং আরও বহু জন। ব্রহ্মচারীবাবা এই সভার মধ্যে নিজেই সবাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার তোমাদিগকে জানান উচিত যে, আমার শরীরটা তোমাদের সম্পত্তি, উপযুক্ত খাওয়ার অভাবে ইহা নষ্ট হইয়া যাইতেছে।" এই মর্ম্মান্তিক কথা তাঁহার নিজ মুখ হইতে সবাই শুনিলেন এবং তখন সবাই চান

ব্রহ্মচারীবাবাকে তাঁহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইবেন এবং সেবা-যত্ন শুশ্রূষা করিবেন। কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবাকে এখন একাকী রাখাও কঠিন। লোকসমাগম ঠেকাইবে কে? নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ, দুইটি জিলার মত বিরাটদেশ—তাঁহার কথা এত প্রচার হইয়াছে যে এখন তাঁহার কাছে নিত্য অনবরত বহু লোক আসে—যেখানেই তিনি থাকুন তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিবেই। কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবা যেখানে যাইবেন, সেখানে এত লোকসমাগম হইবে, যে নিত্য এক বিরাট খরচ, তাহা কাহারও পক্ষে অধিক দিন চালান সম্ভব ছিল না। অনেকে ইহা পছন্দও করিত না। আশ্রমের কাজে বা আশ্রমের নিত্যনৈমিত্তিক সেবার জন্য দৈনিক চাউলভিক্ষা ছাড়া কোনরূপ অর্থসাহায্য করা এতদঞ্চলের লোকের মোটেই অভ্যাস নাই। শিষ্যভক্তগণ যথাশক্তি আশ্রমের সেবার জন্য দিতেন, কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবার আপন কাজের জন্য খুব কম সাহায্যই পাওয়া যাইত। সাধু সন্ন্যাসীর আবার টাকা পয়সার দরকার কি? আশ্রমের নিত্যনৈমিত্তিক সেবার জন্য চাউলভিক্ষা যাহা পাওয়া যাইত, তাহা হয়ত আশ্রমবাসীদের জন্যই যথেষ্ট নয়, তাহার উপর অতিথি অভ্যাগত সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিত। এই সময় সিংরৈল নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দত্ত ব্রহ্মচারীবাবার সেবার দুধের জন্য একটি গাভী খরিদ করিয়া দিয়াছিলেন এবং বাড়ী হইতে সরু চাউল পাঠাইতেন। হাসামপুর হইতে শ্রীযুক্ত নকুল সরকার ও শ্রীযুক্ত সুরেশ সরকার সরু চাউল পাঠাইতেন। কিন্তু উপযুক্ত ভিক্ষার অভাবে আশ্রমের সর্ব্বসাধারণের একবারই আহার জুটিত না, এমতাবস্থায় ব্রহ্মচারীবাবার বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা, স্বতন্ত্র আহারের ব্যবস্থা হইলে তিনি একান্ত দুঃখিত ও সঙ্কোচ বোধ করিতেন। এখন তাঁহার শরীর যদিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু আশ্রমবাসীদের যথাবিহিত একবারও ভোগের ব্যবস্থা না হইলে তিনি কেমন করিয়া সরু চাউলের ভোগ গ্রহণ

করিতে পারেন ? আশ্রমবাসীদের সেবার ব্যবস্থা দৈনন্দিন চাউলভিক্ষা বা মুষ্টিভিক্ষা ছাড়া আশ্রমের গোড়ার থেকে কখনই হয় নাই ; চিরদিন একই ভাবে চলিয়া আসিয়াছে।

সবচেয়ে বেদনা ও দুঃখের বিষয় ছিল ব্রহ্মচারীবাবার গৃহীশিষ্যগণের সহিত আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের চির মতানৈক্য ও বিরোধ। ব্রহ্মচারীবাবা ইহা কোনদিনই মিটাইতে পারেন নাই। বাস্তবিক ইহা মিটিবার নয়—সন্ন্যাসী ও গৃহীর আদর্শ পরস্পরবিরোধী। ব্রহ্মচারীবাবা চাহিয়াছিলেন যে গৃহী ও সন্ন্যাসীর সহযোগিতায় সমাজ গঠিত হইবে। পরবর্ত্তীকালে পণ্ডিচেরী আশ্রমে পাইয়াছি ইহার সমাধান ; এখানে গৃহী ও সন্ন্যাসীর দুই বিপরীত আদর্শের কথা উঠেই না। সবাই শ্রীমার সন্তান। গৃহী হোক বা সন্ন্যাসী হোক, স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক, শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ যাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন—তিনিই তাঁহাদের সন্তান। আমার মনে হয় শ্রীঅরবিন্দের যোগের যে মহান্ লক্ষ্য—দিব্য রূপান্তরে—অতিমানবত্ব,—অতিমানবসমাজে গৃহী ও সন্ন্যাসীর প্রাচীন আদর্শের আর প্রয়োজন নাই।

১৩৩৩ সনের বৈশাখ মাসে ভারতসমাজ-গঠন প্রতিষ্ঠানের প্রচারকার্য্য আরও ব্যাপকভাবে চালাইবার জন্য আশ্রম সমিতি "সোনার ভারত" নামে একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ব্রহ্মচারীবাবার উপদেশে অজপানন্দের সম্পাদনায় প্রথম সংখ্যা বৈশাখ মাসে বাহির হইল। আমি উহার প্রকাশক ছিলাম। এই কার্য্যে অজপানন্দ ও আমারই বেশী উৎসাহ ছিল। দ্বিতীয় সংখ্যা বাহির হইবে। ব্রহ্মচারীবাবার পরিচালনায়, নূতন সমাজের অসাম্প্রদায়িক আদর্শে চতুর্দ্দিকে গ্রামে গ্রামে খুব সাড়া পড়িয়াছে। ঠিক এই সময়, খুবই পরিতাপের বিষয়, আশ্রমের গৃহী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে বিরোধ আবার দেখা দিল। মোক্ষদানন্দ, ধীরানন্দ ও আমি দলবদ্ধ হইলাম। ব্রহ্মচারীবাবা প্রথম

আমাদিগেরই পক্ষে ছিলেন এবং আমাদিগের প্রত্যেককে, বিশেষ করিয়া আমাকে, খুবই বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন "এইসব বিষয় নিয়া বেশী আলোচনা করিতে নাই, সময়ে বুঝিতে পারিবা।" কিন্তু তাঁহার সদুপদেশের মর্ম্ম মূর্খতাবশতঃ তখন আমি বুঝি নাই। আমরা জিদ্ করিলাম যে, গৃহীদের সংস্পর্শে থাকিব না। ব্রহ্মচারীবাবার হিতোপদেশ অমান্য করিয়া, গৃহীদের বিরুদ্ধে, আশ্রমের বিরুদ্ধে, এমন কি ব্রহ্মচারীবাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলাম। আমরা তিন জন আশ্রম হইতে বাহির হইয়া নেত্রকোনা সহরে গিয়া সহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগকে আমাদের এই বিরোধের কথা জানাইয়া ইহার প্রতিকার চাহিলাম। প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত মোক্ষদানন্দ আহার ত্যাগ করিলেন। আট নয় দিন পর স্থানীয় ভদ্রলোকগণ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মচারীবাবাকেই মধ্যস্থ মানিলেন, কারণ ব্রহ্মচারীবাবার প্রতি সকলেরই গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। ব্রহ্মচারীবাবা কিন্তু নীরবই রহিলেন, কাজেই এ বিষয়ের কোন উত্থাপনই হইল না। আগন্তুক ভদ্রলোকগণ ব্রহ্মচারীবাবার সহিত আধ্যাত্মিক বিষয় এবং দেশের ও সমাজের তৎকালীন অবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনা করিয়া চলিয়া গেলেন। ফলে আশ্রমের বিষয় সম্বন্ধে কিছুই প্রতিকার হইল না। গৃহীভক্তগণ তাহাতে খুবই খুসী হইলেন। আমরা নিরুপায়, বুঝিলাম আমরা সংসারানভিজ্ঞ, সাধারণ জ্ঞানেরও আমাদের একান্ত অভাব। কিন্তু এক অপরাধের বিচার করাইতে যাইয়া আমরা নিজেরা যে মহাপরাধ করিলাম— গুরুদেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাহা আমরা তখন কেহই বুঝিতে পারি নাই। আমরা তিন জনেই গৃহীদের সঙ্গে থাকিব না বলিয়া, আশ্রম ত্যাগ করিলাম। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা অবসাদ ও উদাসীনতা আসিয়াছিল। যে-মনোবলে দলবদ্ধ হইয়াছিলাম সে শক্তি আমার আর ছিল না। আশ্রম হইতে খানিকদূর গিয়াই, তখনই আমি একা আবার

আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। সভা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সবাই চলিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মচারীবাবা বড় ঘরের বারান্দায়, সভার সময় যেখানে তিনি স্বতন্ত্র ও পৃথক আসনে বসিয়াছিলেন, তখনও সেখানেই তদবস্থায় একাকী বসিয়া রহিয়াছেন, দেখিতে পাইলাম। কি যেন এক গম্ভীর ও উদাসীন ভাব। কোন্ সুদূরে যেন চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে বলিলাম, "মোক্ষদানন্দ ও ধীরানন্দ চলিয়া গেল, আমি থাকি।" ব্রহ্মচারীবাবা অতি বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইলেন এবং বলিলেন "না, তোমার আর থাকিয়া কাজ নাই, তুমিও যাও।" ব্রহ্মচারীবাবার সহিত তাঁহার জীবদ্দশায় এই আমার শেষ কথা ও শেষ বিদায়। উপরোক্ত ঘটনা ১৩৩৩ সনের জ্যৈষ্ঠমাসের, বোধ হয়, গোড়ার দিকে। আমিও পর্য্যটনে চলিয়া গেলাম।

গুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবার দেহরক্ষা

নেত্রকোনা হইতেই আমরা পৃথক হইলাম। মোক্ষদানন্দ ও ধীরানন্দ কাশ্মীর যাইবেন। আমি পরে কাশ্মীরে মিলিত হইব, এরূপ স্থির হইল। নেত্রকোনা ছাড়িয়া আসাম—কামরূপ কামাখ্যা অভিমুখে রওনা হইলাম। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী উপলক্ষে কামাখ্যান'র বাড়ীতে পৌঁছিলাম। পাহাড়ের উপর প্রাচীন মন্দির, নীচে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত—কি সুন্দর দৃশ্য! কামাখ্যা শক্তিপীঠ, কিন্তু তেমন শক্তিসাধক বা সাধিকার সাক্ষাৎ পাইলাম না। যত তীর্থ দেখিয়াছি সর্ব্বত্রই পাণ্ডাদের ভীষণ উৎপাত; একমাত্র কামাখ্যার পাণ্ডাগণই ভদ্রোচিত ব্যবহার করিলেন। যাত্রীদিগকে কোনরূপে না ঠকাইয়া, নিজেদের বাড়ীতে সযত্নে রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতেছেন দেখিলাম। হিন্দুমিশনের স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ তাঁহার দলবলসহ এই উপলক্ষে কামাখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি হিন্দুমিশনের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করেন; কীর্ত্তন ও গানের প্রসেসন্ বাহির হইত। অতি সুন্দর ও প্রাণমাতান দেশাত্মবোধের গান। হিন্দুমিশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতাও দেওয়া হইত। কামাখ্যা উৎসবের পর ক্রমে নওগাঁ, তেজপুর ঘুরিয়া গৌহাটি আসিলাম। এখানে পাহাড়ের উপর স্বামী পূর্ণানন্দ মহারাজের মহিলাশ্রম। বহু-কুমারীমেয়ে এখানে গেরুয়াবস্ত্র পরিহিতা, সংস্কৃতবিদ্যালয়ে পাঠ করেন। শুনিয়াছি চট্টগ্রামেও তাঁহার আর একটি মহিলাশ্রম আছে। অনেক কুমারী মেয়ে এখানে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়া সংস্কৃত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরে শুনিয়াছি শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণানন্দ মহারাজের দেহরক্ষা হইলে মহিলাদের একমাত্র শিক্ষাদীক্ষার স্থান এই আশ্রমটি

উঠিয়া গিয়াছে। গৌহাটি হইতে রওনা হইয়া ক্রমে উত্তরবঙ্গ, বিহার, কাশী ও আগ্রা হইয়া শ্রাবণমাসের শেষে বা ভাদ্রমাসের প্রথমদিকে ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে মথুরায় উপনীত হইলাম। ঝুলন উৎসব উপলক্ষে মথুরায় ও বৃন্দাবনে কয়েকদিন থাকিয়া দিল্লী হইয়া হরিদ্বারে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে হৃষীকেশে যাইয়া দিন কয়েক থাকিয়া আবার হরিদ্বারে ফিরিয়া আসিলাম। হরিদ্বার হইতে কাশ্মীর—উধম-পুরে মোক্ষদানন্দকে চিঠি লিখিয়া উত্তর পাইলাম যে, পত্রপাঠ তাঁহার কাছে চলিয়া যাইতে লিখিয়াছেন। পত্র পাইয়াই রওনা হইলাম। পথে অমৃতসর ও লাহোরে দুইতিন দিন থাকিয়া শিয়ালকোট হইয়া জম্মুতে উপনীত হইলাম। জম্মু হইতে শ্রীনগর যে রাস্তা গিয়াছে তাহার প্রায় মাঝামাঝি পথে উধমপুরে পৌঁছিলাম। আশ্বিনমাস কি কার্ত্তিকমাস হইবে।

দুইতিনদিন পর মোক্ষদানন্দ আমাকে ব্রহ্মচারীবাবার দেহরক্ষার সংবাদ দিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা দেহরক্ষা করিলে চিত্রধাম আশ্রম হইতে তারযোগে তাঁহাকে ইহা জানান হইয়াছিল। আমি তখন বোধহয় হরিদ্বারে ছিলাম। মোক্ষদানন্দের এখানে আসিয়া এই নিদারুণ সংবাদ শুনিলাম। স্মরণ হইল তাঁহার সঙ্গে শেষ দেখা ও শেষ কথা এবং বিদায়—"না, তোমার আর থাকিয়া কাজ নাই, তুমিও যাও।" সে কি বিষাদপূর্ণ দৃষ্টি, কি উদাসীনভাব! মনে হইল আমাদের বিদ্রোহই তাঁহার দেহ-রক্ষার মূল কারণ। তখন আমাদের অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তাঁহার প্রতি, তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলাম। তিনি আমাদিগের উপর অনেকখানি আশা করিতেন, আমাদের কথায় বিশ্বাস করিতেন। আমাদিগকে কত ভালবাসিতেন। তাঁহার এই অহেতুকী ভালবাসাতেই আমরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি তো জীবনে তাঁহার নিজের জন্য আমাদের কাছে

কিছুই চান নাই। আমাদের মঙ্গল কামনাই তিনি সর্ব্বদা করিতেন; আমরা যাহাতে মার দিব্য-লীলার অধিকারী হইতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ তিনি করিতেন।

তিনি আমাদের কৃতকর্ম্মে খুব অসন্তুষ্ট হইলেও কোন কটুকথা তাঁহার মুখে কখনও শুনি নাই, কোন দুর্ব্ব্যবহার পাই নাই। এই বিদ্রোহের সময়েও আমাকে নির্জনে ডাকিয়া বুঝাইয়াছিলেন যে, আমি দল হইতে স্বতন্ত্র হইলে ধীরানন্দ ও মোক্ষদানন্দ তখনই চলিয়া যাইবে। কিন্তু মূর্খতাবশতঃ আমি তখন তাঁহার কথা শুনি নাই। এখন অনুশোচনা ও পরিতাপের শেষ নাই—কি কুশক্তির প্রভাবে পড়িয়া এমন করুণাময় ব্রহ্মচারীবাবার কথা সেদিন অমান্য করিতে পারিলাম। খুব মর্ম্মান্তিকভাবে ব্রহ্মচারীবাবা সেদিন বলিয়াছিলেন যে, "দারুণ কলি আমার সর্ব্বনাশ করিল," কিন্তু আমাকে কিছুই বলেন নাই। পরবর্ত্তীকালে পণ্ডিচেরী আশ্রমে আসিয়া বুঝিয়াছি ব্রহ্মচারীবাবা যাহাকে "কলি" বলিতেন, ইহাকেই শ্রীঅরবিন্দ ভগবদ্বিরোধীশক্তি (hostile force) বলিয়াছেন। এই অন্ধশক্তি সর্ব্বদাই ভগবৎকার্য্যের বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। বুঝিলাম, আমরা তখন যে-ভগবদ্‌বিরোধী অন্ধশক্তির কবলে পড়িয়া এমন অন্ধ হইয়াছিলাম, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রহ্মচারীবাবা সেই ভগবদ্বিরোধী অন্ধশক্তিকেই দোষী করিয়াছেন। বলিয়াছিলেন, "দারুণ কলি আমার সর্ব্বনাশ করিল।" তবুও আমাদের চৈতন্যোদয় হয় নাই।

শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ মত সাধক যদি নিজেকে খুব সজাগ না রাখে তবে এই অন্ধশক্তির কবলে পড়িয়া অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। বুঝিলাম, আমরা যে গুরুদেবের হিতোপদেশ অমান্য করতঃ বিদ্রোহী হইয়া কৃতঘ্নতার কাজ করিয়াছি তাহার কুফল হাতে-হাতে পাইলাম। ব্রহ্মচারী-বাবার যেমন স্থৈর্য্য-ধৈর্য্যের সীমা ছিল না তেমনি তাঁহার করুণা ও ক্ষমারও সীমা ছিল না। আদর্শ ঋষির মত স্বভাবসুলভ মাধুর্য্য ছিল। আমাদের

জীবত্ববশতঃ, মূর্খতাবশতঃ, তাঁহার এই স্বভাব-মাধুর্য্যের সুযোগ লইয়া আমরা বার বার তাঁহার অনেক কাজ পণ্ড করিয়াছি, ভুল করিয়াছি, অপরাধ করিয়াছি, তিনি প্রত্যেকবারই, আমরা অজ্ঞানজীব বলিয়া, সহ্য করিয়াছেন, ক্ষমা করিয়াছেন। আশা করিতেন যে আমাদের জ্ঞান হইলে সব ঠিক হইবে। কিন্তু সর্ব্বশেষে এই যে মহাপরাধ করিয়া বসিলাম, আর সহ্য করিলেন না, অপেক্ষা করিলেন না—আমাদের মায়া, চিরদুঃখিনী পৃথিবীমাতার মায়া পরিত্যাগ করিয়া, মায়ের কাজ মায়ের উপর ছাড়িয়া দিয়া নীরবে, অকালে দেহরক্ষা করিলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না। কিন্তু আমি যে ভুল করিয়াছি এ-জীবনে তাহার আর সংশোধন হইবে না। এই মহাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের প্রত্যেককেই ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার অকালে দেহরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার জীবন্ত আধ্যাত্মিক প্রভাব ও নির্দ্দেশের অভাবে আমাদের প্রত্যেকের সাধনা-জীবনে এক আধ্যাত্মিক বিপর্য্যয় আসিয়াছিল, যাহার ফলে সাধনা-জীবনে অসময়ে গুরুদেবকে হারাইয়া, মহাসমুদ্রে প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে নিপতিত কর্ণধারবিহীন নৌকার মত অশেষ দুর্দ্দশা ও দুর্ভোগ ভুগিয়া, কোন এক অজ্ঞাতশক্তির কৃপা ও সাহায্যে সমুদ্রতীরে পণ্ডিচেরী আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার কৃপাশ্রয় ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ঘোর দুরবস্থা হইতে রক্ষা পাইলাম।

উধমপুরে মোক্ষদানন্দের কাছে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ পাইয়া আমার মন প্রাণ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমাকে অত্যন্ত অনুতপ্ত দেখিয়া মোক্ষদানন্দ বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, ব্রহ্মচারীবাবা তত্ত্বজ্ঞানী, আমরা জীব, তিনি আমাদের কৃতকর্ম্মের জন্য কেন দেহরক্ষা করিবেন? মোক্ষদানন্দের কথা ও যুক্তিতে আমার মন বুঝিত না, অন্তরে কোনই সাড়া পাইতাম না, প্রাণ প্রবোধ মানিত না। কারণ ব্রহ্মচারীবাবার দেহরক্ষার সময় তো এখনও হয় নাই। তিনিই অনেকবার

বলিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতার মহাপ্রকাশ হইবে, দেবতা ও মানবে অপূর্ব্ব লীলা হইবে, সেই প্রতীক্ষায় তিনি ছিলেন। আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠান ও প্রচারকার্য্য ইত্যাদি এ-সব তাঁহার গৌণ কাজ। আমাদের মধ্যে কাহারও অধ্যাত্মজীবন বিকাশ হইল না, মার মহাপ্রকাশ হইল না, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইল না, তাঁহার দৃষ্ট কোন সত্যই (visions and voices) সফল হইল না, অথচ তিনি দেহত্যাগ করিলেন। অবশ্য আমাদের দুর্ব্ব্যবহারে তিনি অনেক সময় বলিতেন—"আমি শরীর ছাড়িয়া দিয়া সূক্ষ্মশরীরে মার কাজ বেশী করিতে পারিব। এমন কি, তখন তোমাদিগকে শাসনও করিতে পারিব। আমাকে তোমরা জগদলের ভারত—সাড়ে তিন হাত চুঙ্গা মনে কর, এখন শরীরের মধ্যে আছি বলিয়া মায়া মমতা হয়, তাই তোমাদিগকে কিছু বলিতে পারি না। থাকতে কাচি হারালে দা।"

আমি তখন মানসিক বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রায় সারাদিন উধমপুরের পাহাড় পর্ব্বতে একাকী ঘুরিতাম আর মনে করিতাম বাংলা গানের একটি পদ, "একি সব মিছে কথা, ভাবিতে যে ব্যথা বড় বাজে প্রভু মরমে।" বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলাম। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও হতাশ; ভীষণ অশান্তি ও অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। এইভাবে পাহাড়-পর্ব্বতে ঘুরিতে ঘুরিতে জ্বর হইয়া পড়িল। উধমপুরের মোক্ষদানন্দের কুটিয়ায় কয়েক সপ্তাহ জ্বরে ভুগিয়া একটু সুস্থ হইলে আবার হরিদ্বারে ফিরিয়া আসিলাম।

১৩৩৩ সন, এবার চৈত্রমাসে সেখানে পূর্ণকুম্ভমেলা। এখনও তিন চার মাস বাকী। গভর্ণমেন্ট এবং সাধু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলি কুম্ভমেলার বিরাট আয়োজন করিতেছেন। ভাবিলাম বেশীদূর আর কোথাও যাইব না। ঘুরিয়া ফিরিয়া এতদঞ্চলেই থাকিব। হরিদ্বারের পূর্ণ-কুম্ভমেলা বহুভাগ্যে দেখিবার সুযোগ হয়। কত সাধু সন্ত মহাপুরুষের দর্শন পাইব। হরিদ্বারে কয়েকদিন থাকিয়া আবার হৃষীকেশে গেলাম।

হৃষীকেশেও ভাল লাগিল না; তখন স্বর্গাশ্রমে গেলাম। এখানে ছত্রে একদিন হঠাৎ আমাদের গুরুভাই বিরজানন্দের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি এখানে অনেকদিন আছেন। ঐ যে তিনি প্রথম পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন, নানা তীর্থ ঘুরিয়া বর্ত্তমানে কিছুকাল যাবৎ এখানেই আছেন। ভিক্ষান্তে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কুটিয়ায় গেলাম। তিনি স্বর্গাশ্রমের উপরের দিকে পর্ব্বতের পাদদেশে, একটি নির্জন, একান্ত কুটিয়ায় বাস করেন। তাঁহার কুটিয়ার কাছেই একটি কুটিয়া খালি হওয়ায়, আমি সেখানেই রহিলাম। বুঝিলাম বিরজানন্দ ব্রহ্মচারী-বাবার দেহরক্ষার সংবাদ রাখেন না। ধীরে ধীরে তাঁহাকে এই দুঃসংবাদ আমিই বলিলাম। তিনি বহুদিন বাংলার আশ্রম ছাড়া। পর্য্যটনের কঠোরতায় অনেকটা শান্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মচারীবাবার দেহত্যাগ সংবাদ শান্তভাবেই গ্রহণ করিলেন। আমার মত এত মর্ম্মাহত হইলেন না।

স্বর্গাশ্রমে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের অনেকেই, যাঁহারা নির্জন বাস, তপস্যা ও সাধনা করিতে চাহিতেন, তাঁহারা রহিয়াছেন; তাঁহাদের সঙ্গে বিরজানন্দের খুব বন্ধুত্ব ও সদ্‌ভাব হইয়াছে। মিশনের একান্তসেবী সাধক তপস্বীদের নিজেদের একটি ছোট লাইব্রেরীও আছে। আমি বিরজানন্দের গুরুভাই এই পরিচয়ে আমারও স্বামিজীদের সঙ্গে বেশ পরিচয় হইল এবং তাঁহাদের সাহায্যে গঙ্গার একেবারে উপরেই একটি কুটিয়া পাইলাম। এই সময় মিশনের লাইব্রেরী হইতে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ দুইখণ্ড পাঠ করিয়া আমার মনেপ্রাণে একটা বিশেষ শান্তি আসে।

বিরজানন্দের সঙ্গে একদিন কথাপ্রসঙ্গে মন্ত্রপুরশ্চরণের কথা হয়। এখনও কুম্ভমেলার তিন চার মাস দেরী, স্থির করিলাম দুইজনেই মন্ত্রপুরশ্চরণ করিব। তাহাতে তিনমাস স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইবে। শাস্ত্রে

পড়িয়াছি, গঙ্গাতীরে মন্ত্রপুরশ্চরণ খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়। বিরজানন্দ ও আমি ব্রহ্মগায়ত্রী পুরশ্চরণ আরম্ভ করিলাম। আমি প্রথম দিন তিনবারে চারিশত ব্রহ্মগায়ত্রী কুম্ভকে জপ করিলাম এবং বাকী আটশত জপ শুধু করে (অঙ্গুলীতে) জপ করিয়া দৈনিক বারশত জপ পূর্ণ করিলাম। এইভাবে রোজ বারশত জপ হইলে তিনমাসে লক্ষাধিক জপ পুরশ্চরণ সম্পূর্ণ হইবে। যেদিন ব্রহ্মগায়ত্রী পুরশ্চরণ আরম্ভ করিয়াছি, সেইদিন রাত্রে জপ শেষ করিয়া যেইমাত্র শুইয়াছি এবং একটু তন্দ্রা আসিয়াছে আর তখনই শুনিলাম গীতার একটি শ্লোক—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

গীতা ২।৪৬

অনুবাদ: সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে কূপে যে প্রয়োজন, জ্ঞানী ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ ও উপনিষদ সকলে সেই প্রয়োজন অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নাই।

স্বপ্নে গীতার এই শ্লোকটি পাইয়া খুব আনন্দ হইল। বুঝিলাম আমার মন্ত্র পুরশ্চরণ করিবার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মচারীবাবাও আমাকে কোনদিন পুরশ্চরণ করিতে বলেন নাই। কিন্তু ইহা শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি যে তিনি অনেক শিষ্যকে মূলমন্ত্র বা ব্রহ্মগায়ত্রী পুরশ্চরণ করাইয়াছেন এবং পুরশ্চরণ শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে কাহারও কিছু উপলব্ধি বা আভাস ইঙ্গিত হইল কি না। পুরশ্চরণ জপের প্রথম দিনই আমার এই শ্লোকবাণী আসিল, ইহা খুবই আশ্চর্য্য। ব্রহ্মচারীবাবার সিদ্ধগায়ত্রী মন্ত্র কি জাগ্রত। দ্বিতীয় দিনও এইরূপ চারিশত সংখ্যা ব্রহ্মগায়ত্রী কুম্ভকে জপ করিলাম এবং বাকী এমনই করে (অঙ্গুলীতে) জপ সমাপ্ত করিয়া শুইয়াছি, সামান্য একটু তন্দ্রা আসিতেই, গতরাত্রির মত গীতার আর একটি চরণ শুনিলাম—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং।" অনুবাদ: আত্মার দ্বারা আত্মার উদ্ধারসাধন করিবে।

পুরশ্চরণের এইরূপ সদ্য অনুভূতি ও বাণী লাভ করিয়া খুব আনন্দিত হইলাম। তৃতীয় দিনও ঠিক একই পরিমাণ জপ সমাপ্ত করিয়া শুইবা-মাত্র একটু তন্দ্রা আসিতেই শুনিলাম গীতা বা উপনিষদের একটি মাত্র শব্দ "আত্মস্থোভব" অর্থাৎ বুঝিলাম আত্মস্থ বা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার জন্য। আমি বিরজানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তাঁহার কোনই আভাস ইঙ্গিত হয় নাই। উপর্য্যুপরি তিনদিনই আমার উপরোক্ত বাণীলাভ হইয়াছে, তাহা বিরজানন্দকে বলিলাম। এবং আরও বলিলাম যে এই বাণীর নির্দ্দেশমত আত্মস্থ হইবার চেষ্টাই করিব। তিনমাস কঠিন পদ্মাসনে ততোধিক কঠিন কুম্ভকে পুরশ্চরণ করিবার আর প্রয়োজন নাই। যখন গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র হাতে নিয়া, গঙ্গাতীরে বসিয়া এই সঙ্কল্প করিয়াছি তখন লক্ষ গায়ত্রীজপ পূর্ণ করিতেই হইবে সুতরাং সাধারণ ভাবে অঙ্গুলীকরে রোজ তিন হাজার জপ করিয়া প্রায় একমাস মধ্যে লক্ষ জপ সম্পূর্ণ করিলাম এবং হরিদ্বার ব্রহ্মকুণ্ডঘাটে গিয়া জপ বিসর্জন করিলাম।

ব্রহ্মচারীবাবা বলিতেন যে তিনি এই ব্রহ্মগায়ত্রীটি বারদীর শ্রীশ্রী-লোকনাথ ব্রহ্মচারীবাবার শিষ্য শ্রীমৎ অভয়াচরণ ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের সময় পাইয়াছিলেন। সিদ্ধমহাপুরুষের ব্রহ্মগায়ত্রী কি প্রত্যক্ষফলপ্রদ! ব্রহ্মচারীবাবা বলিতেন যে ইহা নির্গুণ ব্রহ্ম-গায়ত্রী—সুতরাং আত্মস্থ হইবার নির্দ্দেশ হইতেই তাহা উপলব্ধি করিলাম। কিন্তু এখন এই সুদুর্লভ নির্দ্দেশ পালন করিবার মত মনের অবস্থা ও সে একাগ্র নিষ্ঠা আর নাই।

স্বর্গাশ্রমের কুটিয়া ছাড়িয়া আরও নির্জন, একান্ত লছমন্‌ঝোলার নিকট পাহাড়ের পাদদেশে গঙ্গার ঠিক উপরে যে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়টি

আছে, তাঁহাদেরই একটি গুহার মত ছোট কুটির পাইলাম। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের ছত্র হইতে আমার দুবেলা ভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সব রকম সুবিধাই হইল। স্থানটি ঠিক গঙ্গার উপর, সকাল সন্ধ্যায় হৃষীকেশের বিদ্যার্থীদের বেদধ্বনি লহরে লহরে ঝঙ্কৃত হইয়া আসিত, সে কি সুন্দর শুনা যাইত। এই পবিত্র নির্জনতার মধ্যে মনের শান্তভাব ও স্থিরতা আনয়নের জন্য খুব নিবিষ্ট হইতে চেষ্টা করিলাম, কারণ আত্মস্থ হওয়ার পূর্ব্বে মনের স্থিরতা ও শান্তভাব না আসিলে আত্মস্থ হওয়া সম্ভবই হইতে পারে না। লক্ষ্মীয়া সিদ্ধাশ্রমে, ব্রহ্মচারীবাবার জীবদ্দশায়, সাধনকালে এই মনের প্রশান্তি ও স্থিরতা অতি সহজেই পাইয়াছিলাম ; যখন আত্মোপলব্ধির জন্য নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের চেষ্টা করিয়াছিলাম, প্রকৃতপক্ষে তখনই আত্মস্থ হওয়ার সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলাম। মন শান্ত সমাহিত হইয়া তখনই অজ্ঞান-সমাধি হইত। কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবা তখন আমাকে এই প্রকার সমাধি-চেষ্টা সম্বন্ধে নিরুৎসাহ করিয়াছিলেন। এখন আবার আরম্ভ করিলাম মনকে নির্ব্বিকল্প করিয়া আত্মস্থ হইতে, কিন্তু আত্মস্থ হওয়া তো বহুদূরের কথা, মনকে আর আগের মত শান্ত সমাহিত করিতেই সমর্থ হইলাম না।

সাধনায় সেই একাগ্র নিষ্ঠা আর আসে না। প্রথম কারণ করুণাময় ব্রহ্মচারীবাবার দেহরক্ষার বেদনা মনে অতি তীব্র। দ্বিতীয় কারণ নিম্নপ্রাণের আবেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এমনটি ব্রহ্মচারীবাবার নিকট দীক্ষা ও সাধনা লইবার পর আর কখনও হয় নাই। বুঝিলাম ব্রহ্মচারীবাবার প্রতি যে কৃতঘ্ন ব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছি তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে, অব্যাহতি নাই। মনে মনে স্থির করিলাম মিথ্যাচার অপেক্ষা সংসারে ফিরিয়া বিবাহ করিব। এক আত্মীয় বন্ধুকে একখানি চিঠিও লিখিলাম যে আমি সংসারে চলিয়া আসিতেছি, কিন্তু চিঠিখানি পোষ্ট করি নাই।

সেই রাত্রিতেই গুহার মধ্যে স্বপ্নে একটি বাণী পাইলাম—"অপোকস্ আরও আট দশজন লোক চাই।" অপোকস্ শব্দটির অর্থ না জানায় বাণীটির অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। ঝুলার বেদবিদ্যালয়ের পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু অপোকস্ শব্দটির অর্থ পাইলাম না। হৃষীকেশে বহু বেদবিদ্যালয়, ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় আছে। মধ্যাহ্নে ভিক্ষান্তে ঝুলা পার হইয়া হৃষীকেশে গিয়া দুই একটি বেদবিদ্যালয়ের অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলাম যে এমন কোন শব্দ নাই। অপর একটি বিদ্যালয়ে গিয়া অধ্যাপক মহাশয়কে অপোকস্ শব্দটির অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেই বিদ্যার্থী ছেলেরা সংস্কৃত অভিধান লইয়া বসিয়া গেল, আর আমাকে শব্দটি পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে বলিতে লাগিল। অধ্যাপক মহাশয়ও একটি অভিধানের পাতা উলটাইতেছিলেন। বিদ্যার্থী ছেলেরা বলিল যে এমন শব্দ নাই। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন ওকস্ শব্দ আছে। অপ্ উপসর্গ যদি যোগ করেন অপোকস্ হইতে পারে। ওকস্ শব্দের অর্থ কি আমি জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন ঘর, বাড়ী, আশ্রয় যাহার অপগত হইয়াছে। অধ্যাপক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই অর্থ হইলে আমার প্রকৃত অর্থ হয় কি না? আমি বলিলাম হাঁ, ইহাই হইবে। আমি সংসারে যাইতে চাই কিন্তু স্বপ্নে বাণীটি বলিতেছে সংসারত্যাগী আরও অনেক লোক চাই। রাত্রি প্রভাতে আত্মীয় বন্ধুর নিকট লিখিত চিঠিখানি টুকরা টুকরা করিয়া গঙ্গার মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। বুঝিলাম, আমার প্রতি কি ইঙ্গিত।

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলা

বাংলা ১৩৩৩ সন, চৈত্রমাস

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। কাশ্মীর—উধমপুর হইতে মোক্ষদানন্দ ও ধীরানন্দ আসিবেন। কুম্ভমেলা উপলক্ষে আমরা সবাই, যাহারা পর্য্যটনে আছি, হরিদ্বারে মিলিত হইব। যথাসময়ে মোক্ষদানন্দ, ধীরানন্দ, বিরজানন্দ ও আমি, এই চারজন হরিদ্বারে মিলিত হইলাম। আমাদের গুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবা দেহরক্ষা করিয়াছেন। বাংলার আশ্রম ও ক্ষেত্র—সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে। আমরা ইহা আলোচনা করিয়া সবাই একমত হইয়া ঠিক করিলাম যে আমরা বাংলাদেশের আশ্রমে বর্ত্তমানে যাইব না। এতদ্দেশেই—উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর বিশেষ করিয়া উত্তরাখণ্ডে—হরিদ্বার, হৃষীকেশ, উত্তরকাশী ইত্যাদি স্থানে থাকিয়া সাধনা করিব এবং মাঝে মাঝে নানা তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিব। আপাততঃ স্থির হইল যে, কুম্ভমেলার শেষে আমি ও ধীরানন্দ কাশ্মীর—অমরনাথ তীর্থ দর্শনে যাইব। মোক্ষদানন্দ ও বিরজানন্দ উধমপুরে চলিয়া গেলেন।

সেবার হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভমেলার বিস্তৃত বিবরণ আজ প্রায় পচিশ বৎসর পর লিখা সম্ভব নয়। সে এক বিরাট ব্যাপার। ১৯৪৮ সনে ডিসেম্বর মাসে স্বাধীন ভারতের সর্ব্ব প্রথম জয়পুরে, আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন দেখিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। প্রতি দ্বাদশ বৎসরান্তর ধর্ম্মের নামে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে, হিন্দুসমাজের আজ পতনের দিনেও, হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলাতে যে লোকসমাগম হয় হিন্দু সমাজের প্রাণে যে সাড়া পড়ে তাহার তুলনায়

জাতীয় বার্ষিক কংগ্রেস অধিবেশনও অতিক্ষুদ্র। ১৩৩৩ সনের হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভমেলায় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় বার লক্ষ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব ও উদাসী প্রভৃতি। অত্যুচ্চ গিরিরাজ হিমালয়ের গভীর প্রদেশ হইতে পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া পতিতপাবনী গঙ্গা এই পুণ্যভূমি হরিদ্বারে সমতলভূমিতে নামিয়াছেন। হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে গঙ্গাতীরে ক্ষুদ্র হরিদ্বার সহরটি ছবির মত অতি সুন্দর। হরিদ্বারে গঙ্গার ব্রহ্মকুণ্ড-ঘাট বাঁধান সিঁড়ি ও বিস্তৃত বাঁধান প্ল্যাটফরম্, চারিদিকে ধূসরিত অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা—নীচে বেগবতী স্রোতস্বিনী গঙ্গা দ্রুতবেগে প্রবাহিতা, সে কি সুন্দর, মনোরম দৃশ্য! কুম্ভমেলায়, পবিত্র কুম্ভলগ্নে এই ব্রহ্মকুণ্ডঘাটে স্নানই মহাপুণ্যদায়ক।

হরিদ্বারের দক্ষিণ প্রান্তে কন্‌খল হইতে আরম্ভ করিয়া, হরিদ্বারের উত্তরপ্রান্ত হৃষীকেশ রোড পর্য্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গার তীরবর্ত্তী আটদশ মাইল লম্বা ও অপ্রশস্ত স্থান, উত্তর প্রদেশের গভর্ণমেন্ট ও স্থানীয় মিউনিসিপালিটি কড়া নিয়ম কানুন বাঁধিয়া দিয়া রাস্তা ঘাট সমস্ত এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন যে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এবং অন্যান্য প্রদেশেরও শত সহস্র স্বেচ্ছাসেবকগণের আন্তরিক সেবার তুলনা হয় না। মাসাধিক কাল এই কুম্ভমেলা স্থায়ী থাকে। এই কাল মধ্যে দুই তিনটি বিশেষ লগ্ন থাকে, সেইদিন বিশেষ স্নানোপলক্ষে সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসীর দুই তিন মাইল লম্বা বিরাট মিছিল, ব্রিটিশ সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া চলেন। লক্ষ লক্ষ নরনারী তীর্থযাত্রী রাস্তার দুই পাশ হইতে সাধুসন্ত দর্শন করেন; এই রকম প্রসেসন্‌বন্দী হইয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সাধুসন্তগণ ব্রহ্মকুণ্ডে ও গঙ্গায় স্নান করেন।

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলা

হরিদ্বারের গঙ্গার তীরবর্ত্তী এই অপ্রশস্ত দীর্ঘ স্থানটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আশ্রম, আখড়া, গুরুদ্বারা, বাগান, ময়দান গঙ্গার পরপারে বিস্তৃত চর ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুসন্তের সমাগমে পরিপূর্ণ থাকে তদুপরি বিরাট বিশাল দর্শনার্থী তীর্থযাত্রীর দল— তিল ধারণের স্থান থাকে না। কোন কোন সম্প্রদায় নানাস্থানে স্বল্প-সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া থাকেন। দুই, চার, পাঁচশত সংখ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ হাজার, দশ হাজার সাধুসন্ত অনেক স্থানে থাকেন। এই সমস্ত সাধু সন্ন্যাসীদের খাওয়ার লঙ্গর ও ব্যবস্থা অতি বিরাট। যুদ্ধের বড় বড় ডিভিসনের সৈনিকদের খাওয়ার ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করিলে কতকটা ধারণা হয়। প্রত্যেকদিনই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্মিলনে, বিরাট ভাণ্ডারা বা ভোজের অনুষ্ঠান হইতেছে। এই রকম বহু ভাণ্ডারা নিত্য চলিয়াছে। কোথাও দশ, বিশ হাজার, কোথাও ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ হাজার সাধু সন্ত, তন্মধ্যে বহু তীর্থযাত্রীও ভোজন করিতেছেন। পাকের বাসন-পত্রও তেমনি বিরাট। হালুয়া, পুরি-তরকারী নানাপ্রকার মিঠাই ও মিষ্টান্নই হিন্দুস্থানে ব্যবহার বেশী হয়। এইসব বিরাট কার্য্যের নিয়ম শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা অতি চমৎকার। দশটার সময় খাওয়া আরম্ভ হইয়া বারটা একটার মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার সমবেত সাধুসন্তের ভোজন শেষ হইয়া যায়। সে কি বিরাট আয়োজন ও বিরাট ব্যাপার, খরচের তো কথাই নাই। ধর্ম্মের নামে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা এখনও এই গরীব দেশে খরচ হয়। দেশীয় রাজন্যবর্গ, কলিকাতা ও বোম্বের ধনী ব্যবসায়ীগণ অর্থসাহায্য ও আটা, ঘি, চাউল, ডাল এবং বস্ত্র ও কম্বল ট্রেনে করিয়া কুম্ভমেলায় সাধুসন্তের সেবার জন্য পাঠাইয়া থাকেন। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী তীর্থযাত্রী, প্রত্যেকে পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য যথাশক্তি অর্থসাহায্য, সেবা, ভোজ্য ও বস্ত্রাদি দান করিতেছেন।

আমরা কনখলে সিন্ধুপ্রদেশের এক মহাত্মার আশ্রমের পিছনে বাগানের মধ্যে আসন করিয়াছি। দিনকয়েক এখানে ছিলাম। সিন্ধুদেশীয় তীর্থযাত্রীতে আশ্রমটি ভর্ত্তি। উক্ত সিন্ধি মহিলারা খব ভোরে উঠিয়া পবিত্রভাবে পুরী আর হালুয়া নিজেরা স্বহস্তে তৈরী করিয়া লইয়া বাহির হইতেন, সর্ব্বপ্রথম বাগানে আসিয়া— গরম পুরি আর হালুয়া আমাদের আসনের কাছে রাখিয়া এমন নম্র ও মিষ্টভাবে বলিতেন, "বাবাজী গরম্ গরম্ পুরি হালুয়া খা লেনা।" এইরকম তাঁহারা যাঁহার যেখানে ইচ্ছা সাধুসন্তকে ভোজন করাইতেন। আমাদের ভিক্ষার জন্য কোথাও আর যাইতে হইত না, যে কয়দিন এখানে ছিলাম। দিনের মধ্যে কয়েকবার এই রকম; ইহা ছাড়াও ছত্র, ভাণ্ডারা ইত্যাদিতে রোজ ভোজনের ব্যবস্থা রহিয়াছে, যাহার যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন।

কুম্ভমেলাতে যেসব সাধুসন্ত সমবেত হন, তাঁহাদের মধ্যে মহাত্যাগী পণ্ডিত, বিদ্বান উচ্চস্তরের সাধক ব্যক্তি অনেক আছেন। বিশেষতঃ বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও নাগা সন্ন্যাসীদের মধ্যে কঠোরতপা ত্যাগী, তপস্বী বহু দেখা যায়। কিন্তু আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্ ও ভগবদুপলব্ধিসম্পন্ন যোগী মহাপুরুষকে চেনা বা তাঁদের পরিচয় পাওয়া খুবই কঠিন। সাধারণতঃ তাঁহারা বেশী লোক সমাগমে থাকেন না। ভগবদিচ্ছায় যদি সেরূপ কোন সাধু মহাপুরুষ বা যোগী সন্ন্যাসী এই বিরাট ভিড়ের মধ্যে বিচরণ করেন তো তিনি নিজে কৃপাপরবশ হইয়া পরিচয় না দিলে, কে তাঁহাকে চিনিতে পারিবে? তত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ যোগী ঋষির সংখ্যা চিরকালই মুষ্টিমেয় ও সুদুর্লভ। তথাপি ভারতবর্ষের হিন্দু-জাতির ও হিন্দ সমাজের অন্তর ধর্ম্মের নামে ও অধ্যাত্মের অন্বেষণে কিরূপ জাগ্রত হয় তাহার পরিচয় একবার হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভমেলা দেখিলেই বুঝা যায় ও উপলব্ধি হয়।

পাঞ্জাব ও কাশ্মীর পর্য্যটন

১৩৩৪ সনের বৈশাখের প্রথম ভাগে হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভমেলা ভাঙ্গিয়া গেলে, ধীরানন্দ ও আমি পাঞ্জাবের অমৃতসহর, লাহোর ও উজিরাবাদ হইয়া রাউলপিণ্ডি উপনীত হইলাম। তখন সমস্ত পাঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্ত্তিত আর্য্যসমাজীদের খুব প্রভাব। সনাতনধর্ম্মী সাধুসন্ন্যাসী কোথাও বড় একটা পাত্তা পায় না। আমরা যদিচ গোঁড়া দলভুক্ত নই তথাপি অবস্থাবিপাকে আমরা গোঁড়া সাধু বলিয়াই পরিগণিত। ইতঃপূর্ব্বে অমরনাথযাত্রী সাধুসন্ন্যাসীগণ রাউলপিণ্ডিতে অনেক সাহায্য পাইতেন। কিন্তু আর্য্যসমাজীদের প্রচারের ফলে আমরা কোথাও কোন সাহায্য পাইলাম না। আর আমরা এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত। রাউলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর দুইশত বার মাইল। বাস সারভিস্ আছে। অতি দুর্গম পার্ব্বত্য রাস্তা। সমস্ত কাশ্মীরের যাতায়াত, মাল সরবরাহ লরি ও বাস সারভিসের উপর নির্ভর করে। তখনকার দিনে এতবড় বিরাট বাস ও লরি সারভিস ভারতবর্ষের অন্য কোথাও ছিল না। মোটরে একদিনেই শ্রীনগর পৌঁছায়। বাসে দুই দিন লাগে। সামান্য দশ-বার টাকা জন প্রতি ভাড়া।

রাউলপিণ্ডি হইতে পদব্রজে শ্রীনগরের রাস্তায় রওনা হইলাম, মাত্র দুই আনা সম্বল হাতে। অনেকে আমাদিগকে ভয় দেখাইয়াছিল যে অন্ততঃ আট-দশ টাকা সঙ্গে না থাকিলে শুধু ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া এই দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে চলিবে না, অত্যন্ত কষ্ট হইবে। পদব্রজে খুব শীঘ্র গেলেও তিন সপ্তাহের রাস্তা। সকালে আট-দশ মাইল হাঁটিতেই চড়াই আরম্ভ হইল। চড়াই মানে পাহাড় উর্দ্ধে অতিক্রম

করা। অনেক দূর হইতে ক্রমে উঁচু হইয়া পাহাড়ের দিকে রাস্তা উঠিয়া চলিয়াছে। চড়াই অতিক্রম করিলেই আবার উৎরাই, নীচের দিকে রাস্তা নামিয়া গিয়াছে। সবচেয়ে কঠিন চড়াই—পূর্ব্বোক্ত অত্যুচ্চ পর্ব্বত-গুলির গায়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে রাস্তা চলিয়াছে তাহা পদব্রজে অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্টকর ও পরিশ্রমসাপেক্ষ। ভাগ্যক্রমে কোথাও পাকদণ্ডী short cut দুই পায়ের রাস্তা আছে। তবে অত্যুচ্চ পার্ব্বত্যরাস্তা হইতে কাশ্মীরের চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর, তাহাই শ্রম লাঘব করে।

চড়াই আরম্ভ হইয়াছে—একটি ঝরণার মত ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যাইতেছে। পাশেই একটি ছোট পাহাড়ী বস্তি বা গ্রাম, দেখিয়া মনে হইল অতি গরীব। ঝরণাতে স্নান করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম ভিক্ষার জন্য। খুব গরীব হইলে কি হইবে, গ্রামবাসী অধিকাংশ শিখ, তাহাদের একটি গুরুদ্বারা আছে; অল্পসংখ্যক হিন্দু আছে, তাহাদেরও একটি ঠাকুরদ্বারা আছে। যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্তই হউক না কেন, সাধু সন্তের সেবাই শিখদের পরমধর্ম্ম। প্রত্যেক গৃহে আমরা একখানি রুটি ও কিছু ঘোল এবং কোন কোন গৃহে রুটি ও একটু মাখন, খুব গরীবের ঘর হইলেও আধখানি রুটি ও কিঞ্চিৎ ঘোল পাইলাম। কোন গৃহেই নিরাশ হইতে হইল না। শিখ এবং হিন্দু সব গৃহে আমরা ভিক্ষা করিয়া প্রচুর খাদ্যদ্রব্য পাইলাম। গুরুদ্বারাতে গিয়া ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিলাম। অর্দ্ধেক রুটি রহিল রাত্রির জন্য। বিকালে তিন চারিটার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম। গ্রামবাসীগণের নিকট খবর পাইলাম আট-দশ মাইল গেলে আর একটি গ্রাম পাইব, সেখানেও কয়েকঘর শিখের বাস, সেখানে রাত্রি যাপন করিতে হইবে। পাহাড়ের চড়াই কিছু আগেই আরম্ভ হইয়াছিল, সেই গ্রামে পৌঁছিতে আমাদের সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। এক শিখ ভদ্রলোকের বাড়ীতে রাত্রিবাসের

স্থান পাইলাম। দুই তিন বাড়ী ভিক্ষা করিয়া এত রুটি পাইলাম যে বাড়ীর কুকুরটিকে মধ্যাহ্নের রুটি হইতে কয়েকখানা দিয়া ভার কমাইলাম। গৃহস্বামী রাত্রে বলিলেন যে এখানে খুব সাপের ভয়, আমরা রাত্রে যেন খুব সাবধানে বাহির হই। পরের দিন ভোরে আমরা আবার রওনা হইলাম; গৃহস্বামী বলিয়া দিলেন, মধ্যাহ্নে কোন্ গ্রামে পৌঁছিব। যথাকালে সেই গ্রামে উপস্থিত হইলাম, প্রচুর ভিক্ষাও পাওয়া গেল। দুইদিনের এই অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিলাম যে, শ্রীনগরের পথে কোথাও কষ্ট পাইব না। দুই তিন দিন মধ্যেই পাঞ্জাবের স্বাস্থ্য-নিবাস মুরী পৌঁছিলাম।

এই পার্ব্বত্য সহরটি আসামের শিলং সহরের মত। সেখানে আট দশটি টাকা ভিক্ষা পাইলাম। খাওয়া থাকার ত কথাই নাই। তথা হইতে ক্রমে পাঞ্জাব সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ঝিলাম নদীর উপর কোহালা সেতু পার হইয়া কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। কি সুন্দর দৃশ্য, হাঁটিতে এত ভাল লাগিত, কোনই পরিশ্রম বোধ হইত না। পর্ব্বতের সানুদেশে ছবির মত গ্রাম ও বস্তি, খুব উঁচুতে উঠিয়া দেখা যাইতেছে ঐ গ্রামটি দুই তিন মাইল হইবে কিন্তু হাঁটিতে গিয়া দেখি কোন সময় দ্বিগুণ তিন গুণ দূরে। প্রথমে যেরূপ মনে করিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর দৃশ্যাবলী ও নাতি-শীতোষ্ণ আবহাওয়া। প্রত্যেক গ্রামেই খুব আদর যত্ন পাইয়াছি: ভাষা মোটেই জানা নাই, গৈরিকবাসই আমাদের সাধুত্বের প্রমাণ। পাহাড়ী কি হিন্দু কি শিখ,—সাধুসেবা এদের মত আর কোথাও দেখি নাই। এখন মনে মনে হাসি পায়, যখন মনে হয় প্রথমবার পর্য্যটনের সময় সমৃদ্ধ পূর্ব্ববঙ্গের—ময়মনসিংহ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও বিক্রমপুরের হিন্দুসমাজের আতিথেয়তার শোচনীয়তা আর এই গভীর পার্ব্বত্য অঞ্চলের গরীব পাহাড়ীদের আতিথেয়তার কথা।

এক বৃদ্ধার বাড়ীতে গুরুদ্বারা আছে, রাত্রিবাসের জন্য তথায় যাইব। রাস্তার উপর জনৈক দোকানীর কাছে খোঁজ লইতেছি। কিন্তু গরীব দোকানী আমাদিগকে ছাড়িলেন না। তাঁহার দোকানে বসাইয়া, তাঁহার স্ত্রীকে দিয়া আধঘন্টার মধ্যে রুটি তরকারী তৈরী করাইয়া সাধু অতিথি সেবা করাইলেন। তাঁহার আবাসে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা না থাকায় তিনি নিজে আমাদিগের সঙ্গে যাইয়া যে বৃদ্ধার বাড়ীতে গুরুদ্বারা আছে, সাধুসন্তের থাকার ব্যবস্থা আছে, তথায় পৌঁছাইয়া দিলেন। খাওয়া দাওয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অন্যত্র ঐ দোকানীর বাড়ীতে হইয়া গিয়াছিল সুতরাং গুরুদ্বারাতে রাত্রে শুইয়া আছি। বৃদ্ধ বোধ হয় বাড়ীতে ছিলেন না। বৃদ্ধাই আমাদিগের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। কিছু রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া বৃদ্ধ হয়ত অতিথির কথা শুনিয়া থাকিবেন, আমরা তখনও ঘুমাই নাই। রাত্রে ভীষণ ঠাণ্ডা, আমাদের দেশের পৌষ মাঘ মাসের মতন। আমার পায়ে কে হাত বুলাইতেছে মনে হইল, কম্বলের নীচে হইতে মাথা বাহির করিয়া দেখি যে বৃদ্ধ। আর বৃদ্ধা দুইটি গ্লাসে গরম দুধ লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। ধীরানন্দ ও আমি মনের সুখে দুধ খাইলাম; তারপর খুব নিদ্রা দিলাম। পর দিন ভোরে রওনা হইব, এমন সময় বৃদ্ধা আমাদিগকে হাত জোড় করিয়া কি বলিলেন, সব বুঝিলাম না; এইটুকু বুঝিলাম যে না খাওয়াইয়া যাইতে দিবেন না। বৃদ্ধা ডাল ও আলু খুব যত্ন করিয়া রাখিয়াছেন অমরনাথযাত্রী সাধু-সন্তের সেবার জন্য। এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে ডাল ও আলু খুব দুষ্প্রাপ্য। বৃদ্ধার আগ্রহে থাকিতে হইল। ভোজন ও বিশ্রাম করিয়া বিকালে যখন রওনা হইলাম, তখন বৃদ্ধা আমাদের সঙ্গে কতকগুলি ফল দিয়া দিলেন, কম্বলাদি শীতবস্ত্র আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। শীতবস্ত্র কম্বলের অভাব ছিল বটে, কিন্তু যে কম্বল আছে তাহা লইয়াই পাহাড় চড়িতে কষ্ট হয়, আর রাত্রে সব

জায়গাতেই প্রচুর কম্বল পাই, শুধু কেন পথে বোঝা বাড়াইব? কম্বল নিলাম না।

এইভাবে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অতি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করিয়া দুই তিন সপ্তাহ মধ্যেই শ্রীনগরের পঁয়ত্রিশ মাইল নীচে বারমুল্লা সহরে উপনীত হইলাম। এখানটা প্রায় সমতল ভূমি। ঝিলাম নদীর তীরে বারমুল্লা কাশ্মীর রাজ্যের একটি জিলা সহর। সন্তসিং নামক এখানকার জনৈক পাঞ্জাবী ধনী ব্যবসায়ীর বাগানবাড়ীতে সাধুসন্তের বাসের জন্য কয়েকটি ঘর করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ সরস্বতী, একটি বাঙ্গালী তপস্বী সাধু, এই বাগান বাড়ীতে একটি ঘরে আছেন। দুচারজন অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীও অন্যান্য ঘরে প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে থাকেন। ধীরানন্দ ও আমি দুইটি ঘর নিলাম। অর্দ্ধমাইল দূরে সহরে সন্তসিংয়ের বাড়ীতে ভোজনের ব্যবস্থা মধ্যাহ্নে এবং রাত্রে দুবেলাই রহিয়াছে। মধ্যাহ্নভোজনের সময় দেখিলাম তাঁহার বাগান বাড়ীর সাধুসন্ত আমরা কয়জন ছাড়া আরও পনর বিশজন অতিথি সাধুসন্ত ভোজন করিলেন। এখানে সাধুসন্তেরা যতই আসুন খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বৎসরে গ্রীষ্মকাল ছয়মাস ধরিয়াই অমরনাথ তীর্থযাত্রী এবং কাশ্মীর ভ্রমণকারী সাধু-সন্তরা যাতায়াত করেন। সচ্চিদানন্দ স্বামী মাত্র গত দুই তিন বৎসর যাবৎ এখানে আছেন। শীতের সময়ও এখানেই থাকেন, গায়ে একটিমাত্র আলখাল্লা ব্যবহার করেন। তাঁহার ইচ্ছা পাঁচ ছয় বৎসর যদি এখানের শীত সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার গুরু বদরিকাশ্রমের নিকটবর্ত্তী যেখানে থাকেন, তথায় তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারিবেন। সচ্চিদানন্দ স্বামী বেশ পণ্ডিত লোক। বারমুল্লা সহরে শিক্ষিত কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁহার ভক্ত হইয়াছেন। তাঁহারাই সচ্চিদানন্দ স্বামীর সেবার ফল দুধ কুটিয়াতে পাঠাইয়া দেন। ধীরানন্দ

তাঁহার কাছে গীতা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের শীতবস্ত্রের অভাব দেখিয়া সচ্চিদানন্দজী তাঁহার কোন ভক্ত, বারমুল্লার গভর্ণমেন্ট অফিসারকে বলাতে তিনি আমাদিগকে দুইখানি মূল্যবান কাশ্মীরী লুই দেন তাহাতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে সচ্চিদানন্দজীর সঙ্গে তাঁহার ভক্তবৃন্দের সহায়তায় কাশ্মীরের বিখ্যাত ডালহ্রদ এবং ক্ষীরভবানীর মন্দির ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থান নৌকাযোগে পরিভ্রমণ করিলাম। ধীরানন্দ বারমুল্লাতে সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর কাছে গীতাপাঠ করিতেছিলেন বলিয়া তাহাকে বারমুল্লাতে রাখিয়া আমি জনৈক পাঞ্জাবী সাধুর সহিত কাশ্মীরের সবচেয়ে দুর্গম তীর্থ সারদাপীঠ রওনা হইলাম।

এবারও কপর্দ্দকহীন; প্রায় তিন দিনে সারদাপীঠ পৌঁছিয়াছিলাম। কুড়িপঁচিশ মাইল খুব দুর্গম উচ্চ পর্ব্বতমালা,—পাহাড়ী বস্তী কোথাও নাই। তখন জ্যৈষ্ঠমাস, তথাপি ভীষণ শীত। চারিদিকের অত্যুচ্চ তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গের ঠাণ্ডা বাতাস অসহনীয়। সিন্ধুনদীর উৎসের দিকে এই সারদাপীঠ তীর্থে একটি ধর্ম্মশালা, একটি মন্দির ও একঘর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। একটি দুর্গ আছে, তাহাতে বিশ ত্রিশ জন সৈনিক দুর্গের প্রহরী। খুব দূরে দুই চারিটি গরীব গ্রাম। কথিত আছে একসময়ে এখানে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। মুসলমান আক্রমণে এই স্থান ধ্বংস হয়। এখানের বিরাট গ্রন্থাগার একটি গর্ত্তে পুঁতিয়া রাখা হয়। তাহার মুখে এক বিশাল প্রস্তরখণ্ড, সারদাপীঠ বলিয়া নিত্য পূজিত।

আমার সঙ্গী পাঞ্জাবী সাধুটি শীতের ভয়ে পরদিনই ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। তীর্থস্থানে ত্রিরাত্রি বাস করিতে হয় বলিয়া আমি তিনদিন থাকিব, ধর্ম্মশালায় একটিমাত্র কামরা, আমাদের আগে আসিয়া এক সাধু সেটি অধিকার করিয়াছেন। পাঁচ দিন ছিলাম কিন্তু তাঁহার সঙ্গে দেখা বা কথা বলিবার সুযোগ পাইলাম না। তিনি বাহির হইতেন কি না বুঝিতে

পারিলাম না। আমি উক্ত ধর্ম্মশালার বারান্দায় তিনদিকে তিনটি ধুনি জ্বালাইয়া আমার আসনে বসিয়া থাকিতাম। এখানে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায় কুড়াইয়া লইলেই হইল। মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ আমাদিগকে দুইবেলাই বাজরার রুটি, মাখন এবং একটু চাটনীর মত কি দিতেন। চাউল চিরদিনই এই সব দুগম পার্ব্বত্য অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য। শ্রীনগরে তখন দুইটাকা আড়াই টাকা চাউলের মণ, দুই তিন পয়সা আলুর সের, খুব ভাল ও মস্ত বড় বাঁধাকপি এক আনার বেশী নয়। আর এই সব দুর্গমস্থানে টাকায় তিনচার সের মাত্র চাউল, তাও সর্ব্বদা পাওয়া যায় না। পূজারী ঠাকুর আমাকে পাঁচদিনের মধ্যে মাত্র একদিন অন্নভোজন করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণটি আমাকে একদিন অন্ন ভোজন না করাইয়া ছাড়িলেন না। চাউল সংগ্রহ করিতে তাঁহার দুই দিন দেরী হইল। প্রত্যহ দুইবেলা রুটি ও চাটনী ধর্ম্মশালায় আসিয়া ঠাকুর দিয়া যাইতেন। অন্নভোজনের দিন আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন, নিকটেই পাহাড়ের গায়ে, পাহাড়ী কোঠাবাড়ী। অপর সাধুটি গেলেন না। তৃপ্তির সহিত সেদিন অন্ন ভোজন করিলাম, সেই পরম সুস্বাদু কাশ্মীরের বিখ্যাত করমশাকের ঝোল, ছানার বড়ার তরকারী। এমনটি কাশ্মীর পণ্ডিতের বাড়ী ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও খাই নাই। পণ্ডিতের বাড়ীর কয়েকটি শিশু ছেলে মেয়ে যদিও ময়লা কাপড় অপরিষ্কার শরীর কিন্তু শরীরের রং ও গঠন-ভঙ্গিমা যেন দেব-বালকবালিকা। সারদাপীঠে পাঁচদিন ছিলাম। একদিন রাত্রে স্বপ্নে একটি তিন চারি বৎসরের ছোট বালিকার মত, শ্বেতবর্ণা সহাস্যবদনী সরস্বতী মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এই স্বপ্নদর্শন হইতেই বুঝিলাম যে এই সারদাপীঠ বাস্তবিকই জাগ্রত তীর্থ।

ষষ্ঠদিনে, পূজারী ঠাকুরের কাছ হইতে বিদায় লইয়া রওনা হইলাম। প্রায় পঁচিশ মাইল একদিনে অতিক্রম করিতে হইবে। মধ্যে

চার পাঁচ মাইল একটি চড়াই আছে। আগে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি—আমি যেদিক হইতে গিয়াছি সারদাপীঠ মন্দির, ধর্ম্মশালা ও দুর্গ এক ভীষণ পার্ব্বত্য নদীর পরপারে অবস্থিত। সিন্ধু নদ বা ইহার পঞ্চশাখা নদীর কোন একটি হইবে। নদীর উপর ঝুলা। সুতরাং আজ প্রথমেই ঝুলার উপর দিয়া উক্ত নদী পার হইতে হইবে। পার্ব্বত্যনদী, বরফগলিত জল ভীষণ সোঁ সোঁ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। ইহারই উপর অর্দ্ধ ফার্লং লম্বা ঝুলা ; অর্থাৎ পাহাড়ী লতাদ্বারা তিনটি মোটা কাছির মত পাকাইয়া তাহা নদীর এপার হইতে ওপার অবধি বাঁধা। হাতে ধরিবার জন্য বুক পরিমিত উঁচুতে দুই পাশে দুইটি কাছি এবং নীচে হাঁটিবার জন্য একটি কাছি। প্রায় অর্দ্ধ ফার্লং চওড়া, ভীষণ পাহাড়ী নদীর উপর দিয়া টানা এই তিনটি কাছি, উভয়তীরে পাথরের মধ্যে অতি দৃঢ়ভাবে বাঁধা, ইহারই নাম ঝুলা, পার্ব্বত্য ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধির চরম পরিচয়। ঝুলা হইতে অকস্মাৎ কেহ নীচে পড়িয়া গেলে, তাহার আর হাড় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

সারদাপীঠের ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়া প্রথমই উপরোক্ত ঝুলার উপর দিয়া নদী পার হইলাম এবং নদীর তীরবর্ত্তী পাহাড়ের গা দিয়া অতি সরু রাস্তা দিয়া খানিক যাইতেই একটি পাহাড়ী বস্তি—দুচার-খানি বাড়ী। একটি বাড়ীর প্রায় উপর দিয়াই রাস্তা গিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই একটি পাহাড়ী মহিলা আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন। মেয়েটি কি কাজ করিতে-ছিলেন, হাত ধুইয়া একটু কি গুঁড়া ঘর হইতে আনিয়া জল ঢালিয়া, বারান্দায় চুলাতে হাতে একটি রুটি তৈরী করিয়া আগুনে সেঁকিয়া, একটু মাখন মাখাইয়া আমার হাতে দিয়া করজোড়ে আমাকে নমস্কার করিলেন। পাহাড়ী মেয়েটির মুখে কি পবিত্র ও মিষ্টি হাসি দেখিলাম—মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করিলাম। পাঁচ সাত

মিনিটের বেশী লাগিল না। মাখন মাখানো গরম রুটিখানি খাইলাম, খুব ভালো লাগিল। সারদাপীঠ হইতে দুই তিন মাইলের বেশী আসি নাই, সবে মাত্র অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালার উপর সূর্য্যকিরণ দেখা যাইতেছে। আট কি সাড়ে আটটার পূর্ব্বে সূর্য্য দেখা যায় না। অপ্রত্যাশিতভাবে ভগবানের করুণায় প্রাতর্ভোজন হইল।

আবার পথ চলিতে লাগিলাম, কয়েক মাইল গিয়াছি—এমন সময় হঠাৎ আমার শরীর কাঁপিয়া ভীষণ জ্বর আসিল। অত্যধিক শীত হইলেও ধুনীর তাপে এই কয়দিন বেশ গরম ছিলাম। এখন রাস্তার ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া বা অন্য কোন কারণে জ্বর আসিল। তবুও দুচার মাইল অতিকষ্টে হাঁটিলাম। ভাবিলাম আসিবার সময় মধ্য রাস্তায় যে জঙ্গল বিভাগের একটি নূতন কাঠের বাংলা ও লোকজন দেখিয়াছিলাম তথায় যদি আশ্রয় পাই তো বাঁচি; আর পথ চলিতে পারিতেছি না, শরীর শুধু শুইতে চাহিতেছে। যখন বেলা মধ্যাহ্ন হইয়াছে তখনও অর্দ্ধেক রাস্তা আসিতে পারি নাই। এইসব অঞ্চলে কখনও কখনও ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটিলেও কোন জন-মানবের সাক্ষাৎ মিলে না। পাহাড়ের গায়ে এক সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া চলিয়াছি একা। রাস্তার ধারে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম; কি যে আরাম বোধ হইল, কি বলিব! একটু তন্দ্রার মত আসিতেই শুনিলাম এই জনমানবহীন দুর্গমস্থানে কে আমাকে আমার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ধরিয়া "যতীন্দ্র যতীন্দ্র উঠ্‌লে না?" বলিয়া ডাকিতেছে। চমকিত হইয়া মাথা তুলিয়া দেখিলাম ছয়সাতটি প্রকাণ্ড বন্য মহিষ আমার দিকে আসিতেছে; তাড়াতাড়ি উঠিয়া কম্বল হাতে লইয়া বৃক্ষটির আড়ালে দাঁড়াইলাম, আর ঐ মহিষগুলি আমি যে স্থানে শুইয়াছিলাম তাহার উপর দিয়া হন্ হন্ করিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া চলিয়া গেল। বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম এখানে কে আমাকে

আমার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ধরিয়া এত পরিচিতের মত ডাকিল ! না ডাকিলে মহিষগুলি তো আমাকে মারিয়া ফেলিত ! মনে মনে করুণাময় ব্রহ্মচারী-বাবাকে স্মরণ করিলাম।

অপরাহ্ণ হইয়াছে, অতিকষ্টে আরও খানিকটা হাঁটিয়া, জঙ্গলবিভাগের বাংলায় উপস্থিত হইলাম। দেখি যে আজ সেখানে কেহই নাই, ঘরের দরজা বন্ধ। বারান্দার কাঠের মেজের উপর শুইয়া পড়িলাম। একটি দড়ির খাটিয়া বাহিরে পড়িয়াছিল তাহা আমার উপর রাখিলাম। কোন হিংস্র জন্তু জানোয়ার যদি হঠাৎ আক্রমণ করে তবে প্রথমে খাটিয়ার উপরেই পড়িবে। অনেক রাত্রে জাগিয়া দেখিলাম যে প্রাঙ্গণের এক কোণে গাছের নীচে আগুন জ্বলিতেছে এবং মানুষের গলা শুনা যাইতেছে। উঠিয়া সেখানে গেলাম; দেখিলাম যে উহারাও পথিক, ঐখানে রাত্রিবাস করিতেছে, শীতের জন্য আগুন জ্বালাইয়াছে। আমাকে দেখিয়া হয়ত বুঝিল যে, আমি খাবার চাই ; অযাচিত ভাবে এই পাহাড়ী পথিকগণ একটা কি গুঁড়া দিল, হয়ত কোন প্রকার খাদ্য হইবে। আমি তাহা লইলাম কিন্তু আমার তখনও জ্বর ছাড়ে নাই, কিছু খাইতে ইচ্ছা করিল না। ইহাদিগকে দেখিয়া একটু সাহস পাইলাম।

রাত্রি প্রভাত হইলে আবার রওনা হইলাম। চড়াই উৎরাই অতিকষ্টে অতিক্রম করিয়া সমতলভূমিতে একটি গ্রামে পৌঁছিলাম। যাবার সময়ও এই গ্রামেই যে ব্রাহ্মণবাড়ীতে রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম, অপরাহ্ণে ঐ বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া যখন বলিলাম যে আমার জ্বর হইয়াছে, তাহারা বলিল যে সেখান হইতে তিন চার মাইল দূরে একটি গভর্ণমেন্ট হাসপাতাল আছে, তথায় গেলে ভাল হইবে। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণবাড়ীতে একটু কাশ্মীরী চা খাইয়া হাসপাতালের উদ্দেশ্যে চলিলাম ; সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেখানে পৌঁছিয়া ডাক্তারকে পাইলাম।

ডাক্তারটি কাশ্মীরী পণ্ডিত। তিনি আমাকে খুব সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিলেন। একটি ঘরে বিছানা করিয়া দিলেন। ডাক্তারকে আমাদের আশ্রমের ঠিকানা এবং বারমুল্লাতে ধীরানন্দের ঠিকানা লিখিয়া দিয়া বিছানাতে শুইয়া পড়িলাম। জ্বরের প্রকোপে ও কঠিন পথ-শ্রমে দুইদিন প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিলাম। ডাক্তারের ঐকান্তিক সেবা শুশ্রূষায় ও চিকিৎসায় আমি সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ভাল হইলাম। এবং পদব্রজেই বারমুল্লাতে ফিরিয়া আসিলাম। ডাক্তারটির নাম ও ঠিকানা আমার কাছে লিখা ছিল সে খাতা এখন কোথায় জানি না, সব ভুলিয়া গিয়াছি। তাঁহার যত্ন আত্তি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

বারমুল্লাতে আসিয়া ধীরানন্দকে সারদাপীঠের কঠিন অভিযান ও নানা দুর্ভোগের কথা বলিলাম। কি জানি কেন, ধীরানন্দ এখন হইতে বলিতে লাগিলেন যে বাংলায় ফিরিয়া যাইবেন, তাঁহার গর্ভধারিণী মা রহিয়াছেন ইত্যাদি। আমাকে সঙ্গে করিয়া লইবেন বলিয়া আবদার আরম্ভ করিলেন—একা যাইতে পারিবেন না। খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন ; রোজই ঐ এক কথা। এই তিন মাসও হয় নাই হরিদ্বারে আমরা সকলে মিলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে এখন আর বাংলায় আশ্রমে যাইব না। এরই মধ্যে ধীরানন্দ এই জেদ ধরিলেন। আমি সত্যই মহাসমস্যায় পড়িলাম। এই সময় একদিন ব্রহ্মচারীবাবাকে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি বলিলেন, "তোমরা দেড় বৎসর হইয়াছে এ দেশে আসিয়াছ, আরও সাড়ে তিন বৎসর এই দেশেই থাক।" ধীরানন্দকে এই স্বপ্নাদেশের কথা বলিলাম, তিনি দুইচারি দিন চুপ করিয়া রহিলেন। এদিকে অমরনাথ দর্শন নিকটবর্ত্তী। শ্রাবণী ঝুলন পূর্ণিমা দিনে অমরনাথ দর্শন। আমরা বারমুল্লা হইতে শ্রীনগরে গেলাম এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আশ্রমে অতিথি হইলাম।

শ্রীনগরে ইঁহার একটি আশ্রম আছে। কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহাকে খুবই শ্রদ্ধা করেন ও মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসেন। ইনি বাঙ্গালী, বহুকাল এখানে আছেন। এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। কাশ্মীর ও অমরনাথ তীর্থযাত্রী বাঙ্গালী সাধুসন্ন্যাসীগণ সাধারণতঃ এইখানেই উঠেন। আমরা তথায় উপনীত হইয়া দেখিলাম যে সেখানে বহু পদস্থ বাঙ্গালী যাত্রীর সমাগম হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুগণ, হরিদ্বারের ভোলানন্দ আশ্রমের স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি এইরূপ পনরবিশজন সাধু সন্ন্যাসী আসিয়াছেন; আমরাও আছি। এখানে ধীরানন্দ আবার জিদ্ ধরিলেন বাংলায় যাইবেনই এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। অমরনাথ দর্শন করিলে বাংলায় গুরুদেবের প্রথম বার্ষিক তিরোভাব উৎসব ধরা যায় না। কি করিব অমরনাথ দর্শনের পূর্ব্বেই ধীরানন্দকে লইয়া, ব্রহ্মচারীবাবার তিরোভাব উৎসব যাহাতে ধরা যায়, বাংলায় আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে স্বীকৃত হইলাম। মহাদুর্ভাগ্যবশতঃ অমরনাথের দ্বারে আসিয়াও অমরনাথ দর্শন হইল না। শ্রীনগর হইতে অমরনাথের পথে যেসব পরম রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ স্থান কিছুই দেখিতে পারিলাম না। শ্রীনগর হইতে জম্বুপথে, আমরা বাসে, পিরপঞ্জর পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া উধমপুরে মোক্ষদানন্দের কুটিয়াতে উপস্থিত হইলাম। পথে রাত্রিতে যেখানে বাস রাত্রিযাপন করে অত্যাশ্চর্য্যরূপে বিরজানন্দের সঙ্গে তথায় সাক্ষাৎ। রাত্রি হইয়াছে আজ আর বাস যাইবে না, যাত্রীসহ রাত্রে এখানে বাস থাকে। তিনি উধমপুর হইতে অমরনাথ দর্শন করিতে যাইতেছিলেন, তাঁহাকেও ফিরাইলাম। পরদিন তিনজনে উধমপুর মোক্ষদানন্দজীর কুটিয়াতে উপস্থিত হইলাম। বাংলায় আশ্রমে যাওয়া, ধীরানন্দের এই সিদ্ধান্তে তিনি খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ধীরানন্দ শুনিলেন না। আমরা তিনজন আবার উত্তরভারত ঘুরিয়া বাংলায় গুরুদেবের সমাধি আশ্রম চিত্রধামে উপনীত

হইলাম—ব্রহ্মচারীবাবার তিরোভাব উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্বে। আসিবার পথে ময়মনসিংহে ধীরানন্দের জ্বর হইয়াছিল। তথাপি গৃহীভক্তগণ আমাদিগকে আশ্রমে স্থান দিলেন না। জ্বর শুদ্ধ ধীরানন্দকে লইয়া বাহির হইতে হইল। গৃহীশিষ্যগণ বলিলেন যে আমরা বিদ্রোহ করিয়া চলিয়া যাইবার পরে ব্রহ্মচারীবাবা আদেশ দিয়াছিলেন যে আমাদিগকে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত আশ্রমে জায়গা না দিতে। অগত্যা আমরা চিত্রধাম আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ধীরানন্দকে তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার মার কাছে পোঁছাইয়া দিলাম। আমি ও বিরজানন্দ লক্ষ্মীয়া সিদ্ধাশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। রামানন্দ আমাদিগকে দেখিয়া সেইদিনই চিত্রধাম আশ্রমে চলিয়া গেলেন। প্রায় দেড় বৎসর আমরা এখানে থাকি নাই, আশ্রমের কুটির সব ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমরা সেগুলিকে আবার নূতন করিয়া বাঁধিয়া দিতে বা মেরামত করিতে প্রস্তুত হইলাম কিন্তু দেবালয়ের মালিকগণ একটা কি আইনের অজুহাতে এবং ব্রহ্মচারীবাবা এখন আর নাই, এই বলিয়া বাধা দিলেন। বুঝিলাম, সঙ্গদোষে আবার মহাভুল করিয়াছি। কাশ্মীর বারমুল্লায় সন্তসিংয়ের বাড়ীতে, ব্রহ্মচারীবাবার স্বপ্নাদেশ, "তোমরা দেড় বৎসর হইয়াছে এ দেশে আসিয়াছ আরও সাড়ে তিন বৎসর এদেশেই থাক।" আদেশ অমান্য করিয়া যে বাংলায় আসিলাম তাহার কুফল হাতে হাতে ফলিল এবং আধ্যাত্মিক বিপর্য্যয় আরম্ভ হইল।

সিদ্ধাশ্রমের মালিকগণ আশ্রমের ঘর দ্বার মেরামত করাতে বাধা দিলেন। গ্রামের অন্যান্য ভদ্রলোকেরা পুরাতন আশ্রমের নিকটেই নূতন ঘর বাঁধিবার জন্য একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ধীরানন্দ ক্রমে সুস্থ হইয়া আশ্রমে আসিলেন। তাঁহার জন্মভূমি খুব নিকটেই বলিয়া তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে এখানে একটা নূতন আশ্রম হউক। আমার নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরানন্দ আমি এবং গ্রামবাসী ও

চতুপার্শ্ব বর্ত্তী গ্রামের ভদ্রলোকগণের অর্থ এবং জিনিষপত্রের নানারূপ সহায়তায় নূতন আশ্রম তৈয়ারী হইল। ব্রহ্মচারীবাবার নামে "ভারত যোগাশ্রম" নামকরণ হইল। কিন্তু নূতন আশ্রমে আমার বেশীদিন থাকা হইল না। ধীরানন্দ এবং আর কেহ কেহ থাকিতেন। আমি আশ্রমে, বাড়ীতে বা পর্য্যটনে কোথাও শান্তি পাই না। ধ্যান ধারণা-তেও মন বসে না। একেবারে উদ্দেশ্যবিহীন, পথভ্রষ্টের মত, মন যেদিকে যায় সেইদিকে যাই। এইসময় মাঝে মাঝে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের কথা মনে করি যে, তাঁহাকে আমার এই দুরবস্থার কথা লিখিয়া জানাইতে চাই কিন্তু লিখি লিখি করিয়াও আর লিখিতে পারি না। কি লিখিব, কি চাই কিছুই বুঝি না, কি যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি। মনস্থির করিলাম পণ্ডিচেরীতে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব ও তাঁহার উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ লইব। বাড়ী হইতে ১৯২৮ সনে, বাংলা বোধহয় ১৩৩৫ সন হইবে, পণ্ডিচেরী উদ্দেশে রওনা হইলাম। ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ হইয়া বগুড়া জিলায় মা ভবানীর মন্দিরে কয়েকদিন থাকিয়া কলিকাতা পৌঁছিলাম। তখন আমি লবণ-বর্জিত হবিষ্যান্ন মাত্র আহার করি। ভবানীমার মন্দিরের ঠাকুর আমাকে শুধু পায়সান্ন দিতেন। অন্নভোগের প্রসাদ পাইতাম না। কলিকাতায় আমাদের আত্মীয় শ্রীমান কৈলাসের বাসায় উঠিলাম। কৈলাস আমার স্বপাক হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং যে কয়দিন তাঁহার কাছে ছিলাম খুব সেবা যত্ন করিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে পণ্ডিচেরী রওনা হইব সব খোঁজ খবর লইতেছি এমন সময় বাড়ী হইতে ভাইদের চিঠি পাইলাম, বাড়ীর অপর সরিকের সঙ্গে কি ফৌজদারী মোকদ্দমা সৃষ্টি হইয়াছে। তজ্জন্য কলিকাতা হইতে আবার বাড়ী ফিরিয়া গেলাম, মামলা মিটিয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ পণ্ডিচেরী যাওয়া হইল না।

ইতোমধ্যে সংবাদ পাইলাম চিত্রধাম আশ্রমের ভক্তগণ আমাকে যাইতে বলিয়াছেন। চিত্রধাম আশ্রমে আমার যাওয়া ও থাকা সম্বন্ধে তাঁহাদের তত আপত্তি নাই। বাংলা ১৩৩৬ সন। অজপানন্দজী "ভারত সমাজ" নামক ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৬ সন কার্ত্তিক মাস, বাহির করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধে এই কার্য্যে যোগদান করিলাম। ভারত সমাজ কয়েকমাস নিয়মিতভাবে বাহির হইল। তখনই লবণ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইল। দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন। এই সময় অজপানন্দ কি একটি ইঙ্গিত বা আদেশ পাইলেন যে আশ্রমবাসী আমাদের এই আন্দোলনে যোগদান করিতে হইবে। নেত্রকোনা মহকুমা কংগ্রেস কমিটিকে আমাদের কথা জানাইলাম। শঙ্করানন্দ ও আমি এবং আরও দশবারজন গুরুভাই কংগ্রেস কমিটিতে যোগদান করিলাম। নেত্রকোনা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত শান্তি মজুমদার মহাশয়ের নেতৃত্বে নেত্রকোনা হইতে স্বেচ্ছাসেবক এবং আমরা আশ্রম হইতে সব মিলিয়া জন পঁচিশেক লবণ আইন অমান্য করিতে প্রস্তুত হইলাম।

প্রেসিডেন্ট শান্তিবাবু আমাদিগকে লইয়া বাহির হইলেন আমাদিগের এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে কলিকাতা পাঠাইবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে। সর্ব্বপ্রথম আমাদিগকে লইয়া শান্তিবাবু তাঁহার নিজগ্রাম ঠাকুরাকোনায় উপনীত হইলেন। গ্রামে গ্রামে কি বিপুল উৎসাহ ও আনন্দ দেখা যাইত। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী প্রসেশনবদ্ধ হইয়া জাতীয় পতাকাহস্তে নেত্রকোনার সন্নিকটে কয়েকটি গ্রাম ঘুরিল। যে যে গ্রামে উপনীত হইয়াছি গ্রামবাসীগণ পরম যত্নে আমাদিগকে আহার করাইয়াছেন। সভা হইয়াছে, বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে আমাদের বর্ত্তমান লবণ আইন ভঙ্গ সম্বন্ধে। বিপুল উৎসাহ, উন্মাদনায়

দেশের অন্তঃস্থল এই পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত মাতিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক গ্রামেই যথাসম্ভব অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে—মহিলাগণ নিজেদের অঙ্গের গহনাদি পর্য্যন্ত খুলিয়া প্রেসিডেন্ট শান্তিবাবুর হাতে দিয়াছেন। প্রত্যেক গ্রামেই এরূপ ঘটনা হইয়াছে। অর্থ সংগ্রহের জন্য আমাদের বেশী ঘুরিতে হইল না; নেত্রকোনা সহরের সন্নিকট কয়েকটি গ্রাম হইতেই প্রয়োজনীয় অর্থ উঠিয়া গেল। খরচও কম নয়, আমাদের পঁচিশজন সেচ্ছাসেবকবাহিনীর প্রত্যেককে একটি সৈনিকের মত ইউনিফরম ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দিয়া সজ্জিত করিয়া কলিকাতা পাঠান হইল।

সবচেয়ে মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল আমাদের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর লবণ আইন ভঙ্গের জন্য নেত্রকোনা হইতে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে বিদায়-যাত্রার বিজয়-আশীর্ব্বাদ। কলিকাতা রওনা হওয়ার দিন বিকালে নেত্রকোনা কোর্ট-প্রাঙ্গণে বিরাট সভা হইয়াছে আমাদের আইন অমান্যকারী স্বেচ্ছাসেবকগণকে বিদায় দিবার জন্য। সামান্য বক্তৃতাদির পর আমরা মিলিটারী শৃঙ্খলায় লাইন করিয়া দাঁড়াইলাম। জগন্মাতার অংশসম্ভূতা উপস্থিত ভদ্রমহিলাগণ আমাদিগের প্রত্যেককে চন্দন কুঙ্কুমদ্বারা আমাদের ললাটে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় তিলক দিয়া এবং মঙ্গল চিহ্ন স্বরূপ ধান্য দুর্ব্বাদ্বারা অর্ঘ দিলেন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। সে মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যের অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থ ভাষায় প্রকাশ হয় না। আর আমার তেমন ভাষাজ্ঞানও নাই, প্রকাশ করিবার শক্তিরও অভাব তবে গুরুকৃপায় অন্তরাত্মার মধ্যে অনুভব পাইয়াছি যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতমাতার ইহাই বিজয়চিহ্ন।

নেত্রকোনা হইতে এই পুণ্য স্মৃতি ও শক্তি লইয়া শান্তিবাবুর সঙ্গে কলিকাতা রওনা হইলাম। ময়মনসিংহ কংগ্রেস কমিটিতে আমাদিগকে দিন কয়েক প্রতীক্ষা করিতে হইল। আমাদের অগ্রে

কিশোরগঞ্জ হইতে এক মস্ত বড় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ময়মনসিংহ আসিয়া কলিকাতা রওনা হইয়া গিয়াছেন। সেই বাহিনীর নিরাপদ পৌঁছান সংবাদ পাইয়াই কংগ্রেস কমিটির কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে পাঠাইলেন। শান্তিবাবু আমাদিগকে লইয়া কলিকাতা বি, পি, সি, সিতে উপনীত হইলেন। আমাদিগকে বি, পি, সি, সিতে পৌঁছাইয়া ও পরিচয় করাইয়া বৃদ্ধ শান্তিবাবু বিদায় লইলেন। গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কংগ্রেস কমিটির তখন লবণ আইন ভঙ্গের যুদ্ধ চলিতেছে। সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসেবক সারাদেশব্যাপী কংগ্রেসের নির্দ্দেশে নিরুপদ্রবে সুশৃখল-ভাবে লবণ-আইন ভঙ্গ করিতেছে। গভর্ণমেন্টের পুলিস একদলকে ধরিয়া ভীষণ প্রহার ও অত্যাচার করিয়া জেলে পাঠাইতেছে, অন্যদল আসিয়া সে স্থল পূর্ণ করিতেছে। যখন দেশের সমস্ত জেল প্রায় ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে আর জেলে পুরিবার স্থান নাই তখন শারীরিক প্রহার ও নানাভাবে ভয়াবহ অত্যাচার চলিতেছে যাহাতে দেশের যুবকবৃন্দ আর আইন অমান্য আন্দোলনে, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগদান না করেন। আমরা এই চরম অত্যাচারের সময় বি, পি, সি, সিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। পরের দিনই বি, পি সি, সি আমাদিগকে ক্যানিং রেল লাইনের উপর কালিকাপুর কেন্দ্রে পাঠাইলেন। শঙ্করানন্দ ও আমার তত্ত্বাবধানে, আমরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া লবণ তৈরী করিতে লাগিলাম। সপ্তাহ-খানেক পরেই আমাদের দলকে পুলিস লবণ আইন অমান্য করাতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। পুলিস হানা দিবার সময় আমি কলিকাতা ছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া আমার দলকে পাইলাম না। আমি দুই তিন দিন অপেক্ষা করিলাম; আমাকে আর পুলিস গ্রেপ্তার করিল না। খবর পাইলাম, আমাদের দলকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতা লইয়া গিয়া পুলিস সার্জেন্ট ভীষণভাবে প্রহার করে। সেই প্রহারের ফলে দুইটি যুবকের অবস্থা সঙ্গীন হইয়াছিল। বি, পি, সি, সি আমাকে

অন্য এক শিবিরে প্রেরণ করিলেন। সেখানে সেইদিনই বি, পি, সি, সির আদেশ আসিল ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জে ভীষণ হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা লাগিয়াছে, ময়মনসিংহবাসী স্বেচ্ছাসেবক আমরা যাহারা জেলের বাহিরে আছি তাহাদিগকে সেইদিনই কিশোরগঞ্জ রওনা হইতে হইবে। আমাদের দল সবাই গ্রেপ্তার হইয়া জেলে আছেন। আমরা সত্তর আশিজন স্বেচ্ছাসেবক বি, পি, সি, সিতে সমবেত হইলাম এবং সেই রাত্রেই সিরাজগঞ্জ মেলে রওনা হইলাম। পরদিন ময়মনসিংহ পৌঁছিয়া শুনিলাম যে দাঙ্গার জোর অনেকটা কমিয়াছে। রাত্রে কিশোরগঞ্জ উপনীত হইলাম। দাঙ্গাহাঙ্গামা লুটতরাজ প্রশমিত হইয়াছে, সব ঘুরিয়া দেখিলাম। দাঙ্গাবিধ্বস্ত হিন্দু অধিবাসীদের অবস্থা শোচনীয়। রিলিফ কার্য্য আরম্ভ হইল। কিছুদিন সেই কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলাম।

পর্য্যটনে—রেঙ্গুন মৌলমীন

কিশোরগঞ্জ দাঙ্গার পর দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলের রিলিফকার্য্য কয়েক-মাসের মধ্যেই শেষ হইল। এই সময়ে চট্টগ্রাম হইয়া ষ্টীমারে রেঙ্গুন গিয়াছিলাম, বর্ম্মাদেশ পর্য্যটন করিতে। চট্টগ্রামে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের আশ্রমে দুই তিন দিন ছিলাম। রেঙ্গুনে আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমান পরিচিত বহু বন্ধু আছেন। আমি আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের স্বর্গীয় শচীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের অতিথি হইয়াছিলাম। রেঙ্গুনে কিছুদিন থাকিয়া সহরের বৌদ্ধমন্দিরগুলি ঘুরিয়া দেখিয়াছিলাম। বৌদ্ধভিক্ষু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ভাষা বিভ্রাটের জন্য তেমন মিশিতে পারি নাই। রেঙ্গুন হইতে একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে মৌলমীন যাই। সেদিন ট্রেনেই সামান্য জ্বর হয়। পরদিন বন্ধুর বাসায় জ্বর লইয়াই উপস্থিত হইলাম। জ্বর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিল। তিনি রেল-কর্ম্মচারী। বাসাটি খুব ছোট। ক্রমে আমি শয্যাগত হইয়া পড়িলাম। আমার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বন্ধু আমাকে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়াও জ্বর শীঘ্র ছাড়িল না। এই হাসপাতালটি খুব ভাল। রোগীকে খুব সেবা শুশ্রূষা করা হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যেও স্থানটি খুব সুন্দর। আমি হাসপাতালে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলাম। রোগ আর কিছু নয়, কোন উপসর্গ নাই, শুধু জ্বর।

এই অবস্থায় একদিন বিকালে বালিশ ঠেশ দিয়া বসিয়া ভাবিতেছি, আমার লক্ষ্যহীন জীবনের কথা—সমস্ত জীবনটার স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে—ছাত্রজীবন, বিপ্লবীজীবন, সদ্‌গুরুলাভ, কারাজীবন, অন্তরীণ অবস্থা, আশ্রমজীবন, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিতুল্য সত্যদ্রষ্টা গুরুদেবের

দিব্য-দৃষ্টি ও দিব্যবাণী, ভারতসমাজ-গঠন প্রতিষ্ঠান, সমাজসংস্কার, গৃহী গুরুভাইগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, গুরুদেবের দেহরক্ষা, নানাদেশ পর্য্যটন, পাহাড়পর্ব্বত পরিভ্রমণ। লক্ষ্যহীন, কাণ্ডারীবিহীন তরণীর ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া সুদূর বর্ম্মাদেশের এই মৌলমীন সহরের হাস-পাতালে, আত্মীয় স্বজনহীন, অসহায়, কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছি। অসুখ শুধু জ্বর, কিন্তু সে জ্বর আর কিছুতেই ছাড়িতেছে না। এইসব ভাবিতেছি, স্মরণ হইতেছে স্বপ্নসম সব অতীত বিচিত্র জীবন-কাহিনী—ঠিক সেই সময় হঠাৎ এক বিকটবাণী শুনিলাম, বজ্রনির্ঘোষের মত। বাণীটি এই—"Indian Reformation is our aim of life." উচ্চৈঃস্বরে এই বাণীটি শুনিবামাত্র চমকিত হইয়া উঠিলাম, আমার চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হইল। দেখিলাম ঘরের অন্যান্য রোগীরা যেমন ছিল তেমনই শুইয়া আছে। আর, এই বিকট শব্দের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। কাশীতেও আমার জীবনের মহাসমস্যার সময় এই-রূপ একটি অদ্ভুত বাণী শুনিয়াছিলাম। আজ বহুদিন পরে আবার সেই অদ্ভুত বাণী, বুঝিলাম ইহা উপরের লক্ষ্যনির্দ্দেশক আকাশবাণী। তফাৎ—এই বাণীটি ইংরাজীতে। প্রথমেই ভাবিলাম আমি লক্ষ্য-শূন্য। বৎসরের পর বৎসর এই উদ্দেশ্যহীনভাবে শুধু ঘুরিয়া বেড়াই-তেছি। বর্ম্মা আসার কি উদ্দেশ্য ? কিছুই নয়। তৎপরেই মনে মনে একটি দৃঢ় সঙ্কল্প জাগিল যে এবার যদি বাঁচি তবে একেবারে পণ্ডিচেরী—শ্রীঅরবিন্দের কাছে যাইব, আর কোথাও নয়।

১৯৩১ সনে মৌলমীন হাসপাতালে একান্ত অসহায় অবস্থায় এই দৈববাণীই হইল আমার পণ্ডিচেরীর পথপ্রদশক। ইহার নয় বৎসর পূর্ব্বে, ১৯২২ সনে ময়মনসিংহ জিলা কংগ্রেস কমিটি গৃহে আমাদের বিপ্লবী-দলের পথপ্রদর্শক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে একদিন গভীর রাত্রে আধ্যাত্মিক বিষয়ে বহু আলাপ আলোচনা হইয়াছিল। ব্রহ্মচারীবাবার

সত্যদৃষ্টি ও প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে সর্ব্বপ্রথম উপদেশ দিয়াছিলেন এই সব গুহ্য আধ্যাত্মিক বিষয়ের ঠিক ঠিক উত্তর পাইতে হইলে আমাকে পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দের কাছে যাইতে হইবে। সেই সময় তিনি আমাকে Ideal of Karmayogin বইখানি পড়িতে বলেন। ব্রহ্মচারীবাবার প্রকট অবস্থায়ই ১৯২৪ সনে বেলগাঁও কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সময়, সর্ব্বপ্রথম পণ্ডিচেরী যাইতে প্রস্তুত হইতেছিলাম, সেই সময় ব্রহ্মচারীবাবা স্বপ্নে দর্শন দিয়া এমনভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়াছিলেন যে এই আনন্দানুভূতি পাইয়া পণ্ডিচেরী রওনা হইতে পারি নাই। তাঁহার দেহরক্ষার পর ১৯২৮ সনে পণ্ডিচেরী উদ্দেশে রওনা হইয়াও কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হই। ১৯৩০ সনে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ নেত্রকোনা আসিলে, আমি তখন নেত্রকোনা চিত্রধাম আশ্রমে, তিনি আমাকে খুব জোরের সহিত বলিয়াছিলেন পণ্ডিচেরী যাইতে এবং The Mother বইখানি পড়িতে। কিন্তু তখন লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। পরে মৌলমীন হাসপাতালে প্রাপ্ত সেই বজ্রনির্ঘোষ বাণীই আমার পণ্ডিচেরীর দিশারী হইয়াছিল।

পরদিন সকালে নার্স ও ডাক্তার আমাকে দেখিয়া চলিয়া গেলে, দেয়ালের গায়ে ঝুলান আমার টিকেটে দেখিলাম জ্বরের কাল ও আঁকাবাঁকা ঊর্দ্ধমুখী রেখা নিম্নের দিকে অনেকটা নামিয়া গিয়াছে। তার পরের দিনই জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া গেল। দীর্ঘদিন জ্বরে ভুগিলেও জ্বর ছাড়া অন্য কোন উপসর্গ দেখা দেয় নাই, তাই জ্বর ছাড়িয়া গেলে পথ্য পাওয়ার পূর্ব্বেই শরীর ও মন-প্রাণে বেশ শক্তি অনুভব করিলাম। জ্বরের মধ্যে নার্সগণ রোজ শরীর গরমজল ও সাবান দ্বারা মুছিয়া দিতেন এবং দুধ কমলালেবু ইত্যাদি প্রচুর পথ্যও দিতেন। তাই শরীর খুব দুর্ব্বল হয় নাই। হাসপাতালের নিয়মানুসারে আমাকে অন্নপথ্য হয়ত দেওয়া

হইবে আরও দুই তিন দিন পরে, কিন্তু আমি নার্সকে বলিলাম যে আমি ভাল হইয়া গিয়াছি, আমার বন্ধুর বাসায় চলিয়া যাইব। আমার খুব প্রবল ইচ্ছা দেখিয়া নার্স আমাকে তার পরদিনই ছাড়িয়া দিলেন। বন্ধুর বাসায় যাইয়া সাধারণ খাওয়াই খাইলাম। পরদিনই তাঁহাদের কোন কথা না শুনিয়া রেঙ্গুন রওনা হইলাম। রেঙ্গুনে আসিয়া মাত্র দুই তিন দিন থাকিয়া পরবর্ত্তী ষ্টীমারে চট্টগ্রাম চলিয়া আসি। এবার আমার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প আসিয়াছে পণ্ডিচেরী যাইতেই হইবে নচেৎ রক্ষা নাই কিন্তু পরে দেখিয়াছি মস্ত ভুল করিয়াছিলাম। রেঙ্গুন হইতে যদি মাদ্রাজের জাহাজে উঠিতাম এবং সোজা চলিয়া আসিতাম, তাহা হইলে আমার কর্ম্মভোগ অনেক কম হইত, কিন্তু আমার ভাগ্যলিপিতে আরও অনেক দুঃখকষ্ট বাকী ছিল।

কর্ম্মপাশ-ছেদন

রেঙ্গুন হইতে চট্টগ্রাম হইয়া বাড়ী গেলাম। এই সময় বাড়ীতে দেখিলাম আমার ভাইরা ঋণ ও ঋণের দরুণ মামলা মোকদ্দমাতে খুব বিপদ্‌গ্রস্ত। কিশোরগঞ্জ দাঙ্গার পর হিন্দুদের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া গিয়াছে। আমার মধ্যমভাই আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিল বাড়ীতে কিছুদিন থাকিতে, বলিল যে থাকিলে তাহাদের অনেক সাহায্য হয়। তাহারা আমার সাহায্য আর কখনও এমন ভাবে চায় নাই। তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া মমতা আসিল, স্বীকৃত হইলাম কিছুদিন থাকিতে। এবার একাদিক্রমে সাত আট মাস বাড়ীতে রহিলাম। এত দীর্ঘদিন কখনও বাড়ীতে থাকি নাই। আত্মীয় স্বজন মনে করিলেন যে, গুরুদেব নাই, হয়ত বা সংসারেই থাকিয়া যাইতে পারি। তাহারা আমার বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই একজন বাল্যবন্ধু হাসিঠাট্টা করিতে করিতে আমার মতও জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবা যখন আমাকে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে বলিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শবাদে তখন মনপ্রাণ পূর্ণ ছিল, তখন গুরুদেবের আদেশ ও উপদেশ অমান্য করিয়া তীর্থপর্য্যটনে গিয়াছিলাম, সেই সময়ের মনোবল আর আমার নাই। সংসারে ও বাড়ীতে থাকিতে হইলে বিবাহ প্রয়োজন, তবে আমি সংস্কারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী এই বাধা রহিয়াছে; বিবাহ মহান্‌ ও পবিত্র সন্ন্যাস-আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। বৈরাটি অঞ্চলের একটি গৃহীভক্ত ব্রহ্মচারীবাবার ও মার আদেশ পাইতেন জানিতাম, এ সম্বন্ধে আমার প্রতি ব্রহ্মচারীবাবার কি ইচ্ছা এবং কি আদেশ, তাহা জানিবার জন্য, তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এদিকে আমার ভাইরা

আমাকে দোমনা দেখিয়া বিবাহের খুব চেষ্টা করিতে লাগিল। এক ভদ্রলোক আমাদের বাড়ীতে আসিলেন আমাকে দেখিবার জন্য। আমাকে সাধু দেখিয়াও আমার সহিত তাঁহার মেয়ের বিবাহ দিবেন এই কথা বলিয়া গেলেন। আমার মধ্যম ভাই গেল তাঁহাদের বাড়ী মঙ্গলাচরণ করিতে। সে গিয়া দেখিল যে যিনি বিবাহ ঠিক করিয়া গিয়াছেন তাঁহার ভীষণ জ্বর হইয়াছে। এমতাবস্থায় মঙ্গলাচরণ হইল না। আমার ভাই বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। তিন চার দিন পর সংবাদ আসিল যে সেই ভদ্রলোক মারা গিয়াছেন।

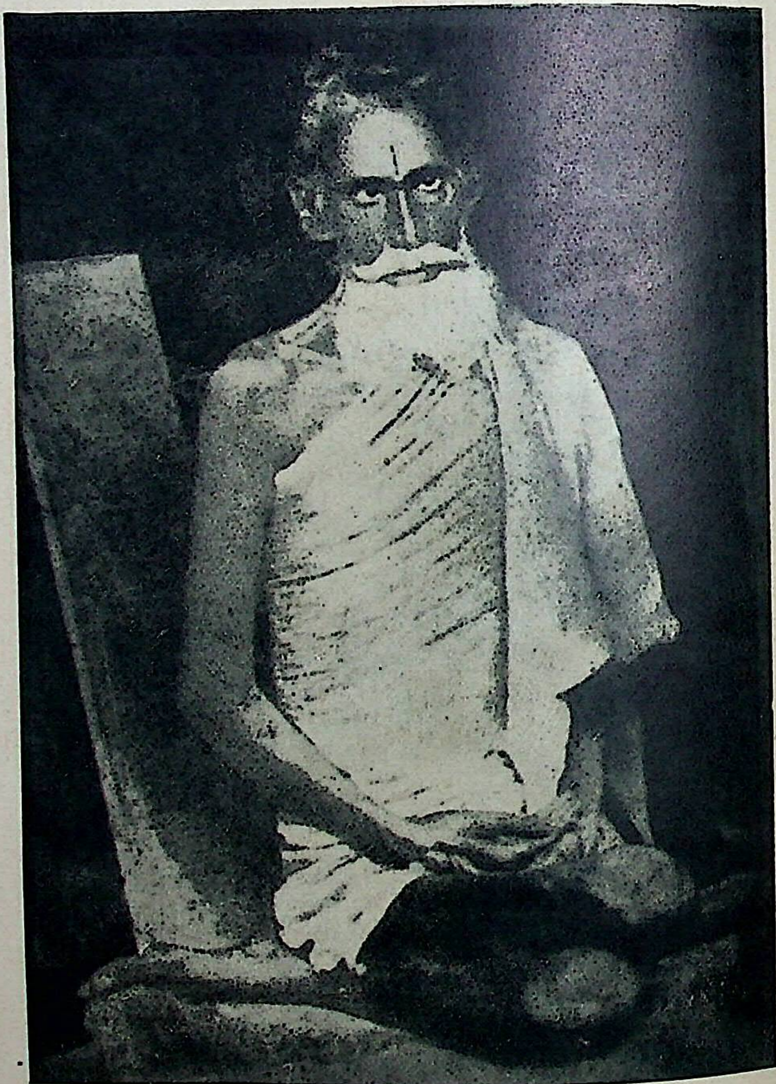
কাশ্মীর বারমুল্লা হইতে ব্রহ্মচারীবাবার স্বপ্নাদেশ অমান্য করিয়া ধীরানন্দের একান্ত অনুরোধে যখন বাংলায় আশ্রমে আসিয়াছিলাম, তাহার পর হইতে আমি নিজে শত চেষ্টা করিয়াও স্বপ্নে বা জাগ্রতে কোন আভাস ইঙ্গিত বা ব্রহ্মচারীবাবাকে স্বপ্নে দর্শন ও আলাপ, কিছুই পাই না। সমস্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই উপরের আভাস ইঙ্গিত নির্দ্দেশ, স্বপ্নদর্শন ইত্যাদি একেবারে হারাইয়া পথভ্রষ্ট ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ঘুরিতেছি। রেঙ্গুন হইতে যদি মাদ্রাজ ষ্টীমারে সোজা মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরী চলিয়া যাইতাম! কি ভুলই করিয়াছি! তাহা হইলে আজ আমি আবার এই কর্ম্মফেরে পড়িতাম না। গুরুশক্তির সাহায্য হারাইলে এবং অকৃপা হইলে, সাধক-জীবনে কত কি সব বাধাবিঘ্ন আসে তাহা প্রতিপদে প্রতিদিন বুঝিতেছি; শুধু আলো ও ছায়ার খেলার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি, বিন্দুমাত্রও শক্তি আর নাই উদ্ধার পাইতে। এই ভদ্রলোক যদি মারা না যাইতেন ত আমার বিবাহ হয়ত হইয়াই যাইত, আমার শক্তি ছিল না বাধা দিবার। ঘটনাচক্রে বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল মাত্র। মনে পড়িল ব্রহ্মচারীবাবার পত্র যাহা হৃষীকেশে পাইয়াছিলাম, লিখিয়াছিলেন, "বিবাহের মত কর্ম্মপাশ আমিই ছেদন করিতে পারি।"

(ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ৭৫ পৃষ্ঠা।)

পূর্ব্বোক্ত আদেশপ্রাপ্ত গুরুভাইটি আমার চিঠির কোনই উত্তর দিলেন না। কিন্তু উপরোক্ত ঘটনার পরই সৌভাগ্যক্রমে আমিই দীর্ঘদিন পরে ব্রহ্মচারীবাবাকে স্বপ্নে দেখিলাম ও তাঁহার বাণী শুনিলাম। দৃশ্যটি এই —ঐ আদেশ-প্রাপ্ত পূর্ব্বোক্ত গুরুভাইটির চোখ দুইটি ব্যাণ্ডেজ দিয়া বাঁধা, যেন তাঁহার চোখে কি অসুখ হইয়াছে। গুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতি বিষাদপূর্ণভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "আমি বুঝিতে পারি না যোগদা কেন বিবাহ করিতে চায়?" স্বপ্নে এই দৃশ্য দেখিয়া এবং ব্রহ্মচারীবাবার বিষাদপূর্ণ ভাব ও তাঁহার ঔদাস্যপূর্ণ বাণী শুনিয়া গুরুভাইটির অবস্থাও বুঝিলাম এবং আমার বিবাহে ব্রহ্মচারীবাবার একেবারে অনিচ্ছা তাহাও দেখিলাম ও শুনিলাম। পরদিন ভাইদিগকে খুব স্পষ্ট বলিয়া দিলাম তাহারা যেন আমার জন্য বিবাহের চেষ্টা একেবারে না করে, আমি বিবাহ করিব না। মধ্যম ভাই আমাকে বাড়ীতে রাখিয়া কলিকাতা চলিয়া গেল। বাড়ীতে এই ভীষণ দুরবস্থার সময় কোন চাকুরী ইত্যাদি করিয়া কিছু সাহায্য করিতে পারে কি না, দেখিতে। ইহার কিছুদিন পরই সেজভাই যোগেন্দ্র একদিন বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া আমাকে খুব তুচ্ছার্থক কথা বলে। তখনই আমি এককাপড়ে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় উঠিয়াই মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প—এবার সোজা পণ্ডিচেরী, আর কোথাও নহে।

আমি বাড়ীতে থাকার সময় কিছুদিন পূর্ব্বে মোক্ষদানন্দ কাশ্মীর হইতে আসিয়া লক্ষ্মীয়ার নূতন আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। এই আশ্রমটি তৈরী করিয়া আমি তথায় থাকি নাই, ধীরানন্দই থাকিতেন। তাঁহার একান্ত আগ্রহ ও অনুরোধে মোক্ষদানন্দ বাংলায় আসিয়াছেন। তিনি কাশ্মীর হইতে আসিয়াই আমাদের বাড়ী গিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন এবং আমাকে আধ্যাত্মিকভাবে উদ্বুদ্ধ

করিয়াছিলেন। এখন বাড়ী হইতে মধ্যাহ্নে এককাপড়ে বাহির হইয়া প্রায় আঠার মাইল হাঁটিয়া সন্ধ্যার পর লক্ষ্মীয়া নূতন আশ্রমে উপনীত হইলাম। মোক্ষদানন্দকে আমার পণ্ডিচেরী রওনা হওয়ার সঙ্কল্পের কথা বলিলাম। ইহা শুনিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইলেন। বাড়ী হইতে আমার চতুর্থ ভাই সুরেন তাহাদের মুসলমান বন্ধু শ্রীমান নুর-হোসেন সহ রাত্রিতেই লক্ষ্মীয়া পৌঁছিল আমাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য, খুব কান্নাকাটি করিল। এ-সময় উহাদের সাংসারিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। প্রথম যখন অন্তরীণ হইতে আসিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলাম তখন মনে সেরূপ কষ্ট হয় নাই, আজ বড় দুঃখ হইল। কিন্তু পণ্ডিচেরী আমাকে যাইতেই হইবে। তাহারা নিরাশ হইয়া চলিয়া গেল। তাহাদিগকে আমি কি সাহায্য করিতে পারি ? তাহাদের যাহাই হওয়ার হইবে, ভগবদিচ্ছার ও ভগবদকরুণার উপর তাদের ছাড়িয়া দিলাম, তাহাতেই মনে শান্তি পাইলাম।



মহাযোগী শ্রীশ্রীমৎ লোকনাথ ব্রহ্মচারী

জন্ম ১১৩৭ সাল দেহত্যাগ ১২৯৭ সাল

মহাযোগী শ্রীমৎ লোকনাথ ব্রহ্মচারীবাবা ও বারদীর আশ্রম—ঢাকা

পরদিন প্রাতে মোক্ষদানন্দের নিকট হইতে বিদায় হইয়া পণ্ডিচেরী উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। মোক্ষদানন্দ লক্ষ্মীয়া গ্রামের কাহারও নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া দুই টাকা পাথেয় আনিয়া আমার হাতে দিলেন। প্রথমই ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইলাম এবং মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম এইবার ভগবদ্দর্শন ও ভগবৎকৃপা লাভ না করিয়া আর বাংলায় আসিব না। হঠাৎ মনে হইল আমাদের গুরুদেবের পরমগুরুদেব ঢাকা, বারদীর মহাযোগী প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিতুল্য শ্রীশ্রীমৎ লোকনাথ ব্রহ্মচারীবাবার আশ্রম, কখনও দেখি নাই। আর বাংলায় ফিরিব কি না কে জানে সুতরাং আমাদের এই পরমতীর্থ একবার দেখিয়া যাইব। বারদী উদ্দেশে রওনা হইলাম। মহেশ্বরদি পরগণার ভিতর দিয়া, প্রায় ষাট সত্তর মাইল রাস্তা হইবে, সোজা হাঁটিয়া, আড়াই হাজার গ্রাম হইয়া, তিন দিনে বারদীর পুণ্যাশ্রমে উপনীত হইলাম। ব্রহ্মচারীদেবের তৈলচিত্রের এখানে নিত্যসেবা পূজা ভোগ আরতি হয়। উজ্জ্বল জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল, জিতনিদ্র অপলকদৃষ্টি মহাশক্তিধর অসীমকরুণা-পূর্ণ যেন জীবন্ত মূর্ত্তি—কঠোরতপা মহাযোগী গোমুখ আসনে সমাসীন। ইহাই তাঁহার স্বাভাবিক বসার আসন। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম। আমি মধ্যাহ্নের পর পৌঁছিয়াছি। আশ্রমটি শান্ত। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইল বারদীর ব্রহ্মচারীবাবা দেহরক্ষা করিয়াছেন। ছাব্বিশ বৎসর এই একস্থানে ছিলেন, অন্য কোথাও যান নাই।

এইজন্যই তাঁহাকে বারদীর ব্রহ্মচারীও বলে। তাঁহার দিব্যপ্রভাব এখনও, জীবন্ত, জাগ্রত। আমার খুব ভাল লাগিল।

বারদীর প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী নাগ জমিদারগণ ব্রহ্মচারীবাবার বিশেষ ভক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে পাঁচহিস্যার জমিদারগণই আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক। আশ্রমে সাধু সন্ন্যাসী বা যোগী সাধক কেহই নাই। উপরোক্ত পাঁচহিস্যার জমিদারগণের তত্ত্বাবধানে একজন পূজারী ব্রাহ্মণ দ্বারা নিত্যসেবাপূজা হয়। সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ ব্রহ্মচারীবাবার আধ্যাত্মিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত। হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়কেই তিনি সমানভাবে দেখিতেন। এত বড় শক্তিশালী মহাপুরুষ পূর্ব্বে আর এতদ্দেশে কখনও আসেন নাই। "লোকনাথ মাহাত্ম্য" ও "সিদ্ধ-জীবনী" নামক দুইখানি পুস্তকে তাঁহার অত্যদ্ভুত জীবনের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়।

মধ্যাহ্নের একটু পরই বারদী আশ্রমে পৌঁছিলাম। এখানে সাধু সন্ন্যাসী কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলাম নিকটেই আর একটি আশ্রম আছে, তথায় একজন স্বামী আছেন।

বারদী আশ্রমের নিকটবর্ত্তী জগদম্বা তপোবনে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী বাস করেন। ইনি শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। উপরোক্ত পাঁচহিস্যার নাগ জমিদারগণেরই দৌহিত্র, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। নিজেদের জমিদারীর অন্তর্গত একটি বাগানবাড়ীতে জগদম্বা তপোবন নামে আশ্রম করিয়া নির্জনে সাধনা করেন। প্রথমেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করি এবং তিনি আমাকে তাঁহার তপোবনে থাকিতে অনুমতি দেন। তিনি নিজে অতি সামান্য সাত্ত্বিক আহার করিতেন এবং আমাকেও তাহাই দিতেন। উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী ইত্যাদি তাঁহার নিত্যপাঠ্য। তাঁহার সঙ্গ প্রভাবে আমার মধ্যে গীতা চণ্ডী ও উপনিষদের একটা সমন্বয় শক্তিসত্তা অভেদ

জ্ঞান খুব সুস্পষ্ট ও জাগ্রত হইল। সিদ্ধাশ্রমে গীতা উপনিষদ আমাদের নিত্যপাঠ্য ছিল। স্বামী শিবানন্দ গীতা ও চণ্ডীর শক্তি ও সত্তাকে নিজ নিত্য সাধনা উপাসনায়, তাঁহার অন্তরাত্মার স্বতঃস্ফূর্ত্ত কবিতায় সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য করিয়াছেন। ভগবদিচ্ছায় তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া আমার খুবই উপকার হইল। বাস্তবিক অল্পকয়েক দিনের সঙ্গলাভেই আমি তাঁহার স্নেহ ভালবাসা পাইয়াছিলাম। তিনি আমাকে বারদী আশ্রমে থাকার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি তাঁহাদের স্নেহ ভালবাসায় ও যত্নে বারদীতে ছয়সাত মাস রহিলাম।

আমি তখন জানিতাম না যে পণ্ডিচেরী আশ্রমে আসিয়া সাক্ষাৎ মাকে পাইব। কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম যে মার দিব্যশক্তিই জগদম্বা তপোবনে ও বারদী আশ্রমে আমাকে পণ্ডিচেরীর জন্যই তৈরী করিতেছিল। বারদীতে ব্রহ্মচারীবাবার আশ্রমে থাকাকালে আমার সাধনা এমন নিবিষ্ট হইয়াছিল যে পূর্ব্বে আমাদের সিদ্ধাশ্রম ছাড়া আর কোথাও কখনও হয় নাই। বাবা লোকনাথের কৃপা অনুভব করিয়াছি। এমন কি পণ্ডিচেরী আসিবার পরও বাবা লোকনাথ দুইদিন স্বপ্নে দর্শন দিয়াছেন। তিনি দুইদিনই প্রকাণ্ড হাতীর উপরে চড়িয়া আসিয়াছিলেন। হাতীর Significance—গুহ্যার্থ—শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন "Spiritual power of India", ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি। বারদীর আশ্রম হইতে বাবার বার্ষিক তিরোভাব উৎসবের পর যখন পণ্ডিচেরী উদ্দেশে রওনা হইব, তখন একদিন বাবা লোকনাথ স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়া বলিলেন "এরা সন্ন্যাসী চায় না।" বাবার এই বাণীটির কি অর্থ তাহা আমি তখন ঠিক বুঝি নাই। কিন্তু ইহা খুবই আশ্চর্য্য, বারদী আশ্রমে কোন সাধু সন্ন্যাসী যোগী নাই, যদিও ইহা একটি মহাশক্তিশালী যোগীর আশ্রম। তবে পাঁচহিস্যার শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন বসু, উপরোক্ত জগদম্বা তপোবনের স্বামী শিবানন্দ মহারাজের ভাই, আমি বারদীর ব্রহ্মচারী

বাবার শিষ্যানুশিষ্য বলিয়া আমাকে বারদী আশ্রমে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আশ্রমের মালিকী স্বত্ব নিয়া তখন হাইকোর্টে মামলা চলিতেছিল। পরে হাইকোর্টের মামলায় শশাঙ্কবাবুরাই জয়লাভ করেন এবং আমাকে পণ্ডিচেরীতেও চিঠি লিখিয়াছিলেন বারদীতে বাবার আশ্রমে যাইবার জন্য কিন্তু পণ্ডিচেরী আশ্রমে বাসই আমার ভবিতব্য।

পণ্ডিচেরী উদ্দেশে

বারদী হইতে মেঘনানদীর ষ্টিমার ধরিয়া নারায়ণগঞ্জ হইয়া গোয়ালন্দ, তথা হইতে ট্রেণে কলিকাতা আসিয়া রামকৃষ্ণবেদান্ত সমিতিতে উঠিলাম। তখন সমিতি বিডন ষ্ট্রীটে ছিল। তথায় স্বামী পূর্ণানন্দ আমার বন্ধু। তাহার অতিথি হইয়া বেদান্ত সমিতিতে প্রায় তিন সপ্তাহ রহিলাম এবং পণ্ডিচেরী আশ্রমের সব সংবাদ লইলাম। তবে সেখানের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ আছে এমন কোন সাধকের সাক্ষাৎ পাইলাম না। তখন সাধারণতঃ পণ্ডিচেরী সম্বন্ধে কেহই বিশেষ কিছু জানিত না। মোটামুটি এইটুকু জানিতে পারিলাম যে শ্রীঅরবিন্দ বৎসরে মাত্র তিনদিন দর্শন দেন, আগামী ১৫ই আগষ্ট তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে দর্শন দিবেন। তেমনই এও শুনিলাম যে আশ্রমে একজন মা আছেন, তিনি সব করেন, আশ্রম পরিচালনা এবং সাধকদের সাধনায় সাহায্য করা, এসবই তাঁহার কাজ, এবং আগে অনুমতি না লইলে কেহ আশ্রমে প্রবেশ করিতে পায় না ইত্যাদি। একখানা পরিচয়পত্র সংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কলিকাতায় আমার তেমন জানা শুনা না থাকায় পরিচয়পত্র সংগ্রহ হইল না। অবশেষে পূর্ণানন্দের গুরুভাই বেদান্তসমিতির স্বামী সদ্‌-রূপানন্দ, ডাক নাম শান্তমহারাজ আমাকে বলিলেন যে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহাশয় পণ্ডিচেরী আশ্রমে আছেন, তিনি তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন। এই বলিয়া শান্তমহারাজ অনিলবরণ রায় মহাশয়ের নিকট আমার জন্য একখানি চিঠি লিখিয়া দিলেন; ইহাই হইল আমার পণ্ডিচেরীর জন্য পরিচয়পত্র। পত্রখানি আপাততঃ শান্তমহারাজের নিকটই রাখিয়া দিলাম—এই বলিয়া যে মাদ্রাজে পৌঁছিয়া তাঁহাকে ইহার জন্য চিঠি লিখিব।

শ্রীশ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীজগন্মাতার মহাবির্ভাব

১৯৩২ সনের জুন মাস হইবে। কলিকাতা হইতে পণ্ডিচেরী উদ্দেশে রওনা হইলাম। কোন ভদ্রলোক দুইটি টাকা দিয়াছিলেন তাহাই সম্বল! হাওড়া ষ্টেশনে পুরী ট্রেণে ঐ দুই টাকা দিয়া একখানি টিকেট কিনিয়া চড়িয়া বসিলাম। খড়গ্‌পুরের পরেও কয়েক ষ্টেশন পর্য্যন্ত টিকেট ছিল। রাত্রিতে মাঝামাঝি কোথাও চেকার ট্রেণ হইতে নামাইয়া দিল। পরদিন আবার এক চেকারকে বলিয়া গাড়ীতে উঠিলাম এবং একেবারে পুরীতে আসিয়া নামিলাম। সেখানে তখন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব চলিতেছে। নরেন্দ্র সরোবরের তীরে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে দশবারো দিন ছিলাম। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন এবং সমুদ্রস্নান করিলাম। পুরী হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক ব্রহ্মচারীর সাহায্যে পুরী মাদ্রাজ প্যাসেঞ্জার ট্রেণে উঠিলাম। পরদিন প্রাতে আবার কোথাও চেকার নামাইয়া দিল; এইভাবে কখন ভিক্ষা করিয়া কিছু সংগ্রহ হইলে ট্রেণে উঠিয়াছি, আবার নামিয়া গিয়াছি; কতক হাঁটিয়া, কতক ট্রেণে, রাজমহেন্দ্রী, গোদাবরী এবং বেজোয়াদা কৃষ্ণা প্রভৃতি তীর্থস্থানে কিছুদিন কিছুদিন কাটাইয়া অবশেষে মাদ্রাজে পৌঁছিলাম। বেলুড়মঠের আমার বিশেষ বন্ধু জগবন্ধু মহারাজ—স্বামী নিত্যাত্মানন্দের একখানি পত্র আনিয়াছিলাম তাহা নিয়া মাদ্রাজ ময়লাপুর রামকৃষ্ণমঠে উঠিলাম। সেখানে তিন দিন অতিথি ছিলাম; তাঁহারা খুবই যত্ন করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ পৌঁছিয়া দেখিলাম ১৫ই আগষ্টের এখনও দেরী আছে। প্রাণের খুব আকাঙ্ক্ষা রামেশ্বর ও কুমারিকা দর্শন করি; একবার পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগদান করিলে আর হয়ত বাহির হইতে পারিব না, ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মাদ্রাজ হইতে রামেশ্বর পৌঁছিলাম। তখন সেখানে একটা বিশেষ উৎসব চলিতেছে; দশবারোদিন সেখানে রহিলাম। সেইখান হইতেই কলিকাতায় শান্তমহারাজকে চিঠি লিখিয়া দিলাম পণ্ডিচেরীর অনিল-

বরণ বাবুর নামে আমার পরিচয় পত্রখানির জন্য। রামেশ্বরে উৎসবে ভারতের নানাস্থানের বহুযাত্রী ও সাধুসন্ত উপস্থিত হইয়াছেন। ভাগ্য-ক্রমে আমি এই সময় আসিয়া জুটিয়াছি। একটি বেদ বিদ্যালয়ের বারান্দায় আসন রাখিয়াছি। নিত্য খুব ভোরে উঠিয়া আসন প্রাণায়া-মাদি সমাপন করি। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র স্নান করিয়া শ্রীশ্রীরামেশ্বরের মন্দিরে যাই এবং তথায় গর্ভমন্দিরের সম্মুখে বসিয়া ধ্যান জপ প্রার্থনাদি ও গীতাপাঠ করি। তারপর দেবতাদি দর্শন। বিশাল বিরাট মন্দির, এরূপ প্রকাণ্ড গগনস্পর্শী গোপুরম ভারতবর্ষের কোথাও দেখা যায় না। এই উৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ রাত্রে বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইত পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের স্বর্ণ-নির্ম্মিত বিগ্রহ লইয়া। সোনার ষাঁড়, সোনার পালঙ্ক, বহুমূল্য মণিরত্নখচিত দেবতার অঙ্গাবরণ। রামেশ্বর নগরের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত রাস্তায় রাস্তায় এই বিরাট মিছিল ঘুরিয়া আসিত। এইভাবে দশবারোদিন এখানেই কাটিয়া গেল। কুমারিকা দর্শনের খুবই ইচ্ছা ছিল, যে-কুমারিকা স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় "ভারতের শেষ প্রস্তরটুক"। কিন্তু তথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। এখানে একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহার গল্প ভবিষ্যতে করিবার ইচ্ছা রহিল।

পণ্ডিচেরী আশ্রমদ্বারে পরীক্ষা

রামেশ্বর হইতে মাদুরা দুই একদিন থাকিয়া মাদুরার মীনাক্ষীমন্দির এবং যাহা যাহা দর্শনীয় ছিল দর্শন করিয়া ট্রেণে ভিল্লুপুরম হইয়া পণ্ডিচেরীর আশ্রমদ্বারে পৌঁছিলাম ১৯৩২ সনের ১১ই আগষ্ট। ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের দর্শন। বাহির হইতে ধাক্কা দেওয়াতে কেহ ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দিলেন। তখনকার দিনে আশ্রমের ফটক সর্ব্বদা বন্ধ থাকিত, প্রয়োজন হইলে দ্বাররক্ষী খুলিয়া দিতেন। আশ্রম দরজার বিপরীত ফুটপাতে বা কোণে ব্রিটিশ গুপ্তচর তিনচারটি রাতদিন সর্ব্বদা পাহারা দিত। ইহা আগন্তুক অনেকে জানিতেন না। আশ্রমে প্রবেশ করিবার সময় গুপ্তচর কিছুই বলিত না। বাহির হওয়ার সময়েই তাহারা আগন্তুককে ডাকিয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করিত ও নাম ধাম লিখিয়া নিত এবং রিপোর্ট করিত। এইজন্য অনেকের অযথা বহু হয়রাণী হইয়াছে। ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম এবং আশ্রম হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতে তাঁহার বাসস্থান সর্ব্বদা নজরে রাখিবার জন্য পণ্ডিচেরীতে একটি বড় establishment বা গুপ্তচরের আস্তানা রাখিয়াছে, তাহারা পালাক্রমে তিনচারি জন দলবদ্ধ হইয়া পাহারা দিত। ১৯৩৫ সনে কংগ্রেসমন্ত্রী-শাসন হওয়ার পর, শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিশিষ্ট এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত দুরাইস্বামী আয়ারের প্রচেষ্টায় গুপ্তচরদের পাহারা উঠিয়া গিয়াছে।

দ্বাররক্ষক দরজা খুলিয়া আমাকে ভিতরে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি কি চাই?

আমি বলিলাম—আমি এখানেই আসিয়াছি।

দ্বাররক্ষক—এখানে কেহ আপনার পরিচিত আছেন কি?

আমি—না, শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহাশয় এখানে থাকেন কি?

দ্বাররক্ষক—হাঁ, তিনি এখানেই থাকেন।

আমি—তাঁর নামে ডাকে আমার এক পরিচয়পত্র আসিবার কথা আছে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন কি?

দ্বাররক্ষক—আমাকে বসিতে বলিয়া আশ্রমের ভিতরে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে আমি অনিলবরণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এমন কোন পত্রাদি তিনি পান নাই।

তখন আশ্রমের ফটকের বারান্দায় বসিবার কোন নিয়ম ছিল না। ভিতরের হলও সর্ব্বদা বন্ধ থাকিত। আমি আশ্রমে যোগদানের বহুপরে বারান্দায় একখানি বেঞ্চ দেওয়া হইয়াছে। ভিতরের হলে আগন্তুকদের বসিবার জন্য সোফা ইত্যাদি রাখা হইয়াছে। ইদানীং বারান্দায় বসিবার জন্য কয়েকখানি চেয়ার, টুল ও বেঞ্চ রাখা হইয়াছে। হলের একপার্শ্বে শ্রীঅরবিন্দের একখানি বড় বাস্ট ফটো বোর্ডে টাঙ্গান রহিয়াছে। দর্শকেরা ফটোই দর্শন ও প্রণাম করিত। আশ্রমে প্রবেশ করা নিষেধ ছিল। এখনও সেই প্রতিকৃতিই রহিয়াছে। আমি শ্রীঅরবিন্দের প্রশান্ত, স্নিগ্ধমূর্ত্তি ফটোতে দর্শন ও প্রণাম করিলাম এবং আমার কম্বল মেজেতে পাতিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এবং একটু চিন্তিত হইলাম। আমি জানিতাম যে বিনা অনুমতিতে এখানে আসা যায় না এবং পরিচয়পত্রাদি না থাকিলে কাহাকেও আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। দ্বাররক্ষকের নিকট হইতে একটুকরা কাগজ ও পেন্সিল চাহিয়া লইয়া শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়কে একটি ছোট্ট চিঠি লিখিলাম এবং তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলাম। দ্বাররক্ষকের হাতে চিঠিখানি

দিলে তিনি তখনই তাহা ভিতরে গিয়া দিয়া আসিলেন। শুনিলাম অনিলবরণ তখন কাহারও সঙ্গে দেখা করেন না, আশ্রমের বাহিরে কোথাও যান না। তবে আমাকে বসিতে বলিয়াছেন। প্রথম দ্বার-রক্ষক চলিয়া গেলেন, বারোটার পরে অপর একজন আসিলেন। আমি সাড়ে দশটায় দ্বারে আসিয়াছি, প্রায় সাড়ে বারোটা বাজিল। এই সময়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বার দুই ঐদিকে আসিয়াছিলেন। মেজেতে কম্বল পাতিয়া বসা সন্ন্যাসী আমাকে দেখিয়া দুইবারই বলিয়াছিলেন যে এখানে বসিবার নিয়ম নাই, বাহিরে যান। প্রথম দ্বাররক্ষক আমার প্রতি বোধহয় একটু সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। নলিনী বাবুর নির্দ্দেশ মত আমি উঠিয়া বাহিরে যাইতে চাহিলে, তিনি ইঙ্গিত করিলেন বসিয়া অপেক্ষা করিতে। আমি বসিয়াই রহিলাম। অবশেষে বোধহয় আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অনিলবরণ নীচে নামিয়া আসিলেন এবং আমার সঙ্গে দেখা করিলেন। মিনিট দুই তিন তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমি এখানে আশ্রমে যোগদান করিতে আসিয়াছি, কি ভাবে তাহা সম্ভব হইতে পারে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিবেন কি?" শ্রীযুক্ত অনিলবরণ বলিলেন "থাকাটাকার কথা পরে হইবে। ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের দর্শন দিন, আপনি প্রথমে দর্শনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া শ্রীঅরবিন্দকে একখানি পত্র লিখিয়া আমার হাতে দিন, আমি তাহা শ্রীঅরবিন্দকে পাঠাইয়া দিব।" শ্রীযুক্ত অনিলবরণের এই নির্দ্দেশ শুনিয়া খুব আশ্বস্ত হইলাম। তিনিই প্রকৃত পথ দেখাইলেন। কতদিন ভাবিয়াছি শ্রীঅরবিন্দকে পত্র লিখিয়া জীবনের সব কথা জানাইয়া তাঁহার উপদেশ চাহিব কিন্তু তাহা করা হয় নাই। আর আজ অনিলবরণ কত সহজ-ভাবে বলিলেন যে শ্রীঅরবিন্দকে আমি পত্র লিখিতে পারি, এবং তিনি সেই পত্র দেখিবেন। খুব আশা হইল।

তখন শ্রীযুক্ত অনিলবরণকে আমি বলিলাম, "আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, আমার কাছে টাকা পয়সা কিছু নাই, আমার এখানে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা কি হইতে পারে ?" তিনি বলিলেন "এ আশ্রমে অতিথি অভ্যাগতের খাওয়া থাকার কোন ব্যবস্থা নাই ; আশ্রমের এই নিয়ম।" তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানে কোন ছত্র বা ধর্ম্মশালা আছে কি ?" তিনি আশ্রমের বাহিরে যান না তাই কোন খবর রাখেন না। কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে বলিয়া দিলেন যে সহরে "অন্নিবাসম্" নামে একটি ছত্র আছে, তথায় আমি যাইতে পারি। আশ্রমদ্বার হইতে প্রায় একটায় বাহির হইলাম। গতরাত্রে খাওয়া হয় নাই। এই দক্ষিণভারতে সাধু সন্ন্যাসীর ভিক্ষা পাওয়া খুব কঠিন। রামেশ্বর ভারতবর্ষের চারিধামের একধাম। সেখানে দশবারো দিন ছিলাম, রোজ একবারের বেশী খাওয়া হয় নাই, তাহাও কষ্টে। তাই দুইতিন মাস এই দক্ষিণভারত ভ্রমণে, পথশ্রমে, অর্দ্ধাহারে অনাহারে শরীর খুবই ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ভাবিয়াছিলাম পণ্ডিচেরী আশ্রমে পৌঁছিলেই সর্ব্বকর্ম্মভোগের শান্তি হইবে কিন্তু দেখিলাম এখনও আমার কর্ম্মভোগ ও পরীক্ষা বাকী আছে। কিন্তু এত নিরুৎসাহ ও নিরাশার মধ্যেও যেন একটি ক্ষীণ আশার আলো দেখিলাম—শ্রীযুক্ত অনিলবরণ বলিয়াছেন আমি শ্রীঅরবিন্দের কাছে আমার কথা লিখিয়া জানাইতে পারি। ইহাই যেন আমার শেষ আশা ভরসা, মনে প্রাণে এই অনুভব করিলাম। তাই এই সব বাহ্যিক দুঃখ কষ্ট আমাকে একেবারে নিরুৎসাহ করিতে ও নিরাশ করিতে পারে নাই। কঠোরতপা, নিঃসম্বল অবস্থায় ভ্রমণকারী ব্রহ্মচারীবাবার শিষ্য আমি—দুই একদিন খাইতে না পাইলে কি হয় ? কিন্তু একটি বিষয়ে আমি বিস্মিত হইলাম, প্রায় সারা ভারতবর্ষ—আসমুদ্র হিমাচল ও বার্ম্মা আমি পরিভ্রমণ করিয়াছি, কপর্দ্দকহীন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর মত, এই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের মত দ্বিতীয় আশ্রম

ভারতবর্ষে কোথাও দেখি নাই যেখানে মধ্যাহ্ন সময়ে একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী অভুক্ত অবস্থায় চলিয়া যায়। তবে এখানকার যাহা নিয়ম তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এইরূপ ব্যতিক্রম হইবার নিশ্চয়ই অনিবার্য্য কোন কারণ আছে।

দ্বাররক্ষকের নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রায় একটার সময় বাহির হইলাম "অন্নিবাসম্ চোলট্রি" ছত্রের অনুসন্ধানে। জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি উহা নামে ছত্র বটে কিন্তু একটি হোটেল। একখানি বেঞ্চিতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—আজ প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের আকাঙ্ক্ষিত শ্রীঅরবিন্দ, তাঁহার আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হইয়াও এমনভাবে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিলাম! গুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবার দেহরক্ষার পর বিগত ছয় সাত বৎসর নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়া শরীর ও মনের অবস্থা এমনই হইয়াছিল যে আশ্রমের এই ব্যবহারে আমার যে উদ্ধত ও রাগী স্বভাব, তদনুযায়ী তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাওয়াই আমার পক্ষে স্বাভাবিক হইত, কিন্তু দেখিলাম যে, মন প্রাণ সব মানিয়া লইল। কে জানে, আশ্রমের এই সব বাহ্যিক নিয়ম কানুনের মধ্যে হয়ত কোন সত্য রহিয়াছে।

আমার কাছে কোন টাকা পয়সা নাই জানিয়া হোটেল মালিকের একটি যুবক ছেলে আমাকে ইংরাজীতে বলিল যে অন্নিবাসমের বিপরীত পার্শ্বে একটি ধনী লোকের বাড়ী, তাহারা সাধু সন্ন্যাসীকে ভিক্ষাদি দিয়া থাকেন। আমি গেলাম সেই বাড়ীতে এবং ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলাম; তিনি হয়ত উপরতলা হইতে ভিক্ষুক সন্ন্যাসী দেখিয়া আর আসিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না, হয়ত বা এই অপরাহ্নে বিশ্রাম করিতেছিলেন। একটি দু-আনি চাকর দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। দুই আনিটি নিলাম না। আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলাম, আর তিনি দুই আনা পাঠাইয়া দিলেন! ফিরিয়া

আসিয়া হোটেলের বেঞ্চিখানিতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। উপরোক্ত হোটেল মালিকের ছেলেটি আমি অভুক্ত আছি জানিয়া আমাকে সামান্য কিছু ভাত তরকারী খাইতে দিলেন, তাতে আমার পেট ভরিল না কিন্তু আশু ক্ষুন্নিবৃত্তি হওয়াতে তৃপ্তি বোধ হইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে পণ্ডিচেরী বাজারে ভিক্ষা করিতে বাহির হইলাম; সারা বাজারটি ঘুরিলাম। অনেক বড় বড় দোকান আছে। প্রায় এক কি দেড় ঘন্টা ঘুরিয়া ছয়টি দাম্রি পাই পয়সা অর্থাৎ দুই পয়সা পাইলাম। এক পয়সার কাগজ ও এক পয়সার একটি পেন্সিল কিনিয়া অন্নিবাসম্ চোলট্রিতে রাত্রে ফিরিয়া আসিলাম। এবং বারান্দায় আসন পাতিয়া শুইয়া রহিলাম। ১১ই আগষ্ট এই ভাবে গেল। পরদিন ১২ই আগষ্ট, একাদশীর উপবাস। খুব ভোরে উঠিয়া নিত্যকর্ম্ম আসন, প্রাণায়াম ধ্যান, প্রাতঃস্নান ও গীতাপাঠ কোনক্রমে সারিয়াছি। আজ আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা : শ্রীঅরবিন্দকে পত্র লিখিব। আজ একাদশী, আজ আর ভিক্ষা করিতে হইবে না। শ্রীঅরবিন্দকে চিঠি লিখিতে বসিলাম। গুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবার দেহরক্ষার পর, আমার জীবনের নানা সঙ্কটের সময়, কতদিন মনে করিয়াছি শ্রীঅরবিন্দকে সব লিখিয়া জানাইব, তাঁহার উপদেশ চাহিব, কিন্তু তাহা হয় নাই। আজ তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া অনিলবরণের নির্দ্দেশে শ্রীঅরবিন্দকে পত্র লিখিতে এই উৎসাহ ও সাহস পাইতেছি।

আজ প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের কথা, জানি না সেদিন পত্রে শ্রীঅরবিন্দকে কি লিখিয়াছিলাম, তবে এইটুকু মনে আছে যে পেন্সিল দিয়া বাংলায় লম্বা এক চিঠি সারাদিন ধরিয়া লিখিয়াছিলাম। বিকালে প্রায় চারটার সময় আশ্রমে গিয়া অনিলবরণের হাতে চিঠিখানি দিলাম। তিনি চিঠিখানি নিয়া একটু স্মিত হাসিয়া "কাল প্রাতে আসিবেন"

বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। আমি আশ্রমদ্বার হইতে বাহির হইয়া অন্নিবাসমের দিকে ফিরিয়া চলিলাম। কিন্তু পথ হাঁটিতে অন্ধকার দেখি। প্রায় দুই তিন দিনের অর্দ্ধাহার অনাহারে শরীর যে কত দুর্ব্বল হইয়াছে শ্রীঅরবিন্দকে চিঠি লিখার ঝোঁকে তাহার বোধ ছিল না। বাজারের রাস্তা ধরিয়া ধীরে ধীরে অন্নিবাসমে যাইতেছি, রাস্তার ধারে কোন একটি বিস্কুটের দোকান দেখিয়া খুবই ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া কিছু বিস্কুট চাওয়াতে দোকানী দুইখানি ছোট বিস্কুট আমার হাতে দিল। অন্নিবাসমে পৌঁছিয়া বিস্কুট দুইখানি খাইয়া, বাহিরের কলের জল পেট ভরিয়া খাইলাম। বারান্দায় গিয়া আমার আসন পাতিয়া শুইয়া রহিলাম, যেন একটা মস্ত বড় দায়িত্ব মাথা হইতে নামিয়া গেল। ভিক্ষার বা খাওয়ার আর কোন চেষ্টাই করিলাম না। প্রথম অসুবিধা ভাষা জানি না। এখানে গেরুয়াকাপড় পরা সাধু সন্ন্যাসী, খুব পরিচয় না থাকিলে, গৃহস্থের বাড়ীতে তেমনভাবে গৃহীত হয় না। পরে জানিয়াছিলাম পণ্ডিচেরীতে সাধু সন্ন্যাসীর দুই একদিনের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা আছে। একটি মঠ আছে তাহা সহরের বাহিরে। কিন্তু এখানে আসিয়া শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ছাড়া অন্যত্র আহার সংগ্রহ আমার উদ্দেশ্য ছিল না। তাই সে চেষ্টা করি নাই। প্রথম দুই দিন খুবই কষ্ট হইয়াছিল কিন্তু পরদিন ১৩ই আগষ্ট ভোর হইতে আশ্চর্য্যরূপে সব অবস্থাটা আপনা আপনিই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

পরদিন ১৩ই আগষ্ট, খুব ভোরে উঠিয়া, স্নানাদি সমাপন করিয়া, অন্নিবাসমের শ্রীরামের ছবি বিগ্রহের সাম্নে গীতার কয়েকটি অধ্যায় মাত্র পাঠ করিয়া পাঠ সমাপ্ত করিয়াছি, এমন সময় পশ্চাৎদিক হইতে জনৈক অপরিচিত ভদ্রলোক আমাকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন—

Swami, will you kindly take a cup of coffee?
মহারাজ, এক কাপ কাফি খাবেন?

আমি—Thank you Sir, I am not accustomed in the habit of taking coffee. ধন্যবাদ, মহাশয়, আমি কাফি খাওয়াতে অভ্যস্ত নই।

ভদ্রলোক—Then please take a cup of milk. তাহলে এক কাপ দুধ খান।

আমি—Oh, Yes, Thank you. হাঁ, তা খেতে পারি, ধন্যবাদ।

আমার থাকারই অন্য কোন জায়গা ছিল না; বারান্দায় থাকি, হোটেলের বাহিরের কলে স্নানাদি করি; ভিতরে শ্রীরামের ছবির কাছে ধ্যান জপ গীতাপাঠ ইত্যাদি করি, হোটেলমালিকের এই ছেলেটির সহানুভূতিতেই। সে ভদ্রলোকটিকে তাহাদের ভাষায় কি যেন বলিল আমার সম্বন্ধে, আমি শ্রীঅরবিন্দ দর্শনোদ্দেশ্যে আসিয়াছি ইত্যাদি। তখন দেখিলাম ঐ ভদ্রলোক তাহাদিগকে বলিলেন, আমাকে কিছু জলখাবার এবং দুধ দিতে। হোটেল হইতে আমাকে যথেষ্ট ইট্‌লি ও পোঙ্গল এবং দুই কাপ্ দুধ দিলেন। ইহাতে আমার যথেষ্ট আহার হইল। আমি প্রায় তিন দিন অনাহারী। ভদ্রলোক আমাকে জল খাওয়াইলেন এবং ছয় আনা পয়সাও দিয়া গেলেন মধ্যাহ্নে আহার করিতে। হোটেলের সাধারণ খাওয়া তখন তিন আনাতেই হইত। এই সম্পূর্ণ অপরিচিত ভদ্রলোক এত ভোরে অযাচিতভাবে আমাকে খাওয়াইয়া গেলেন এবং আরও এমন পয়সা দিয়া গেলেন যাহাতে আমার আরও দুইদিন খাওয়া চলিবে। আমার পক্ষে উঁহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়াই মনে হইল। আরও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গতকল্য বিকালে শ্রীঅরবিন্দকে চিঠি দিয়াছি, আর আজই অতি প্রত্যূষে আমার অবস্থার এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন হইল। ভাবিলাম আমার গত কালের বিস্তৃত চিঠি শ্রীঅরবিন্দের হাতে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু এখানে আমার খাওয়া

থাকার খুব কষ্ট হইতেছে ইত্যাদি বাহ্য ব্যাপার তো তাঁহাকে কোথাও লিখি নাই। বুঝিলাম তাঁহারা অন্তর্য্যামী, তাঁহাদের দ্বারা অনুপ্রেরিত হইয়াই এই ভদ্রলোক আমাকে সর্ব্বপ্রথম সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করিলেন।

অন্নিবাসম হোটেলে জল খাওয়ার খানিক পরে, প্রায় ৮টার সময় আশ্রমে গেলাম। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ আসিয়া আমাকে বলিলেন, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাকে লিখিয়াছেন যে, ১৪ই আগষ্ট বিকালে আমার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন—অর্থাৎ আমি দর্শনের অনুমতি পাইতে পারি কি না, জানাইবেন। শ্রীঅরবিন্দ আমার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন এইটুকুই যেন আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিল। আশ্রম হইতে অন্নিবাসম্ ছত্রে আসিয়া দেখি যে এলাহাবাদ হইতে জনৈক মৌনী বৈষ্ণব সাধু আসিয়াছেন। তিনি বাংলার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। তিনি ফল ও দুধ মাত্র আহার করেন। তাঁহার সঙ্গে আরও দুইজন ভদ্রলোক আছেন, তাঁহারা সবাই রামেশ্বর যাইবেন; পথে শ্রীঅরবিন্দ-দর্শন করিতে আসিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধুটি হিন্দুস্থানী যুবক, নাম প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী। প্রয়াগে ঝারিতে তাঁহার কুটিয়া আছে। প্রভুদত্ত বাংলা-ভাষা জানেন, অমিয় নিমাই চরিত খুব ভালভাবে পড়িয়াছেন। আমাকে এখানে পাইয়া তাঁহার খুব আনন্দ হইল। শ্লেটে লিখিয়া তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম যে বিনা অনুমতিতে দর্শন পাওয়া যাইবে না। তখন তিনি তিনজনের জন্যই অনুমতি প্রার্থনা করিয়া শ্রীঅরবিন্দকে একখানি চিঠি লিখিলেন এবং বিকালে আশ্রমে গিয়া তাহা দিয়া আসিলেন। সাধুটির সঙ্গে আমার খুব ভাব জমিল। তিনি আমাকে বারান্দা হইতে তাঁহাদের ভাড়া করা কামরাতে লইয়া গেলেন। মধ্যাহ্নে ও রাত্রে প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীর একান্ত অনুরোধে তাঁহার সঙ্গে আমিও ফল দুধ খাইলাম। তাঁহার সঙ্গের ভদ্রলোক

দুইটি সাধুসেবার জন্য প্রচুর ফল ও দুধ কিনিয়াছিলেন। মনে মনে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিলাম। গতকাল একাদশীর উপবাস ছিল সেদিন মাত্র দুখানা বিস্কুট খাইয়া পেট ভরিয়া জল খাইয়াছিলাম। আর আজ অতি প্রত্যুষ হইতেই অপ্রত্যাশিতভাবে প্রাতর্ভোজন এবং পরে এই প্রচুর ফল দুধ! প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সারাটি দিন সৎপ্রসঙ্গে বেশ কাটিল। এইভাবে ১৩ই আগষ্ট গেল।

পরদিন ১৪ই আগষ্ট, প্রভুদত্ত সকালে আশ্রমে গিয়া জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা দর্শনের অনুমতি পান নাই। "It was too late" শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার পত্রের এককোণে লিখিয়াছেন। তাঁহারা খুবই দুঃখিত হইয়া সাড়ে দশটার গাড়ীতে রামেশ্বর অভিমুখে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় প্রভুদত্ত আমাকে আটআনা পয়সা দিলেন আজিকার ভোজনের জন্য। গতকালেরও ছয়আনা খরচ হয় নাই কারণ প্রভুদত্তের সঙ্গে দুবেলাই ফল দুধ খাইয়াছিলাম। তাই এখন আমার হাতে চৌদ্দ আনা পয়সা হইল। তাহা হোটেল মালিকের নিকটেই রাখিয়া দিলাম।

প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী চলিয়া গেলে পর অন্নিবাসমের বারান্দায় আমার আসনে বসিয়া ভাবিতেছি, আজ ১৪ই আগষ্ট, বিকালে শ্রীঅরবিন্দ আমার পত্রের উত্তর দিবেন, লিখিয়াছেন যে আমার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। আমি কি উত্তর পাইব, কে জানে—এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমন সময় একটি শ্বেতশ্মশ্রু ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক, শান্তমূর্ত্তি, দেখিলে শ্রদ্ধা হয়, আমার কাছে আসিয়া হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলেন যে "আমি জানিতে পারিলাম আপনি শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের অপেক্ষায় আছেন এবং আপনার নিকট টাকা পয়সা কিছু না থাকায় খুব কষ্টে আছেন; এই টাকাটি লইলে আমি খুব সুখী হইব।" আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, হাঁ, ইহা খুবই সত্য। প্রথম দুইদিন আমার খুবই কষ্ট হইয়াছিল কিন্তু

আজ দুইদিন বেশ চলিতেছে এবং এখনও আমার হাতে চৌদ্দ আনা রহিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট ; আমি দর্শনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া শ্রীঅরবিন্দকে পত্র লিখিয়াছি ; এখনও অনুমতি পাই নাই, আজ ১৪ই আগষ্ট, বিকালে আমার পত্রের উত্তর পাইবার আশা আছে ; তিনি আমার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন বলিয়াছেন ; সেই প্রতীক্ষায় আছি ; আজ বিকালে যদি দর্শনের অনুমতি না পাই তবে আগামী কাল কোথায় যাইব তাহার ঠিক নাই ! গতকল্য জনৈক হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব সাধু বিনা অনুমতিতে আসিয়াছিলেন, এখানে আসিয়া দর্শনের অনুমতির জন্য লিখিয়াও অনুমতি পাইলেন না ; এই মাত্র তাঁহারা অত্যন্ত মনঃকষ্টে চলিয়া গেলেন। আমার টাকার সত্য দরকার নাই, তবু ভদ্রলোক এমন ভাবে টাকাটি আমার হাতে গুঁজিয়া দিলেন যে শেষ অবধি না বলিতে পারিলাম না। এই ভাবে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম যে তিনিও শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনার্থী। তিনি বাড়ী হইতে লিখিয়া আগেই অনুমতি পাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বাড়ী দক্ষিণ ভারতের প্রায় শেষ প্রান্তে, তিন্নেভেলী জিলায়, তাম্রপর্ণী নদী তীরে বিখ্যাত কুল্লদাকুরিচী গ্রামে। তিনহাজার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস এই গ্রামে। তিনি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সেই স্বদেশী যুগ হইতেই খুব উৎসাহী। ইনিই শ্রীযুক্ত শঙ্কররাম আয়ার, পণ্ডিচেরী আশ্রমে আমার বিশেষ শ্রদ্ধেয় বন্ধু। আগামী কাল শ্রীঅরবিন্দ-দর্শন, একদিন পূর্ব্বেই আসিয়াছেন এবং অন্নিবাসম্ ব্রাহ্মণ হোটেলে উঠিয়াছেন। তাঁহার কাছে শ্রীঅরবিন্দের কোন পুস্তকাদি আছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আমাকে তিনখানি ছোট পুস্তক দিলেন Uttarpara Speech উত্তরপাড়া অভিভাষণ, Yoga and its object যোগ এবং ইহার উদ্দেশ্য, The Mother মা। আজ তিনচারদিন এখানে আছি, কোন একটি বই পাই নাই এবং শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর যোগ এবং আশ্রম

সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিব এমন কাহাকেও পাই নাই। আশ্রমে গেলে এক দ্বাররক্ষক ব্যতীত অপর কেহ কথা বলেন না। শঙ্কর-রামের সঙ্গেই সর্ব্বপ্রথম এখানে শ্রীঅরবিন্দ ও আশ্রম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। তিনখানি বইয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উত্তরপাড়া অভিভাষণ পড়িলাম, পড়িয়া মোহিত হইলাম। তারপর পড়িলাম যোগ এবং ইহার উদ্দেশ্য, বুঝিলাম এই যোগ আত্মসমর্পণ যোগ, আমার গুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবারও এই আত্মসমর্পণ যোগই ছিল। তারপর "মা" বইখানি পড়িলাম—ইহা পড়িয়া ভাল বুঝিতে পারিলাম না, তবে ইহা বুঝিলাম যে শ্রীঅরবিন্দ শাঙ্কর মায়াবাদী নন। তিনি শ্রীভগবান ও শ্রীভাগবতী আদ্যাশক্তিতে বিশ্বাসী এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতা আদ্যাশক্তিই তাঁহার যোগের মূলকেন্দ্র। অতএব আমার পক্ষে এই যোগ গ্রহণে কোন আপত্তি নাই। এখন শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা আমাকে গ্রহণ করিলে হয়।

শঙ্কররাম আয়ারের সঙ্গে সদালাপে ও সৎপ্রসঙ্গে আমার আজ দিনটিও বেশ কাটিল। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ভদ্রলোকের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলাম। এমন একটি বিশিষ্ট-ব্যক্তির সঙ্গলাভ বাস্তবিকই সৌভাগ্যের কথা—বিশেষ করিয়া আমার এই জীবন-মরণ সমস্যার সময়ে। শঙ্কররামেরও আমাকে খুব ভাল লাগিয়াছিল, কেন না সেইদিনই তিনি আমাকে বলিলেন "আপনি যদি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সংস্পর্শে এখানে থাকিতে চান, তো আমি আপনাকে একমাস এই হোটেলে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিব।" আশ্চর্য্য সৌভাগ্য! আমি রাস্তার উপর অনাহারে ছিলাম, সর্ব্বপ্রথম খাবার ব্যবস্থা হইল, তৎপরে সৎসঙ্গ সদ্‌গ্রন্থ এবং এই সমস্ত অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত সাহায্য আসিল। কিন্তু তখনও ইহা বুঝি নাই, অনেক পরে বুঝিয়াছিলাম যে, শ্রীমার শক্তি আমাকে কিভাবে সাহায্য করিতে-ছিল আমার আস্পৃহার বল পরীক্ষা করিবার জন্য। আরম্ভে আশ্রমের

১৮

এত সব বিধি নিষেধ ও উপেক্ষার ভাব দেখিয়া এখানে যে আশ্রয় পাইব বা গৃহীত হইব তাহা বিশ্বাস করি নাই। ১৪ই আগষ্ট বিকালে দর্শনের অনুমতির জন্য অতি সঙ্কুচিত ভাবে শঙ্কররাম আয়ারের সঙ্গে আশ্রমে গেলাম। তিনি তো অনুমতি পাইয়াই আসিয়াছেন। আগামীকাল ১৫ই আগষ্ট, শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন, প্রাতঃকালে দর্শন আরম্ভ হইবে। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় দর্শনার্থীর নামের তালিকা বাহির হয়, নামের সংখ্যা ও পরম্পরা নির্দ্দিষ্ট থাকে। আশ্রম দরজার বারান্দায় একটি বোর্ডে টাইপ কপি টাঙ্গান থাকে। তখন দর্শনের সময়ে শ্রীঅরবিন্দের হাতেও একখানি ঐ তালিকা থাকিত, তিনি দেখিতেন যে পর পর কাহারা আসিতেছেন। শঙ্কররাম আয়ার নামের তালিকা দেখিতে গেলেন, তাঁহার নম্বর ও সময় জানিতে। আমি শ্রীযুক্ত অনিলবরণের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম, আমার ভাগ্যলিপিতে কি লেখা আছে জানিতে। শঙ্কররাম তাঁহার নাম খুঁজিতে গিয়া আমার নামও তালিকাতে দেখিতে পাইয়া আমাকে আসিয়া জানাইলেন। এই আশাতীত শুভ সংবাদে আমি খুব আনন্দিত হইলাম। পরে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ আসিয়া আমাকে জানাইয়া গেলেন যে আমি দর্শনের অনুমতি পাইয়াছি, এবং বলিলেন কাল প্রাতে সাড়ে সাতটায় দর্শন আরম্ভ হইবে; খুব ভোরে, ৬-৩০-এ যেন আমি আশ্রমে চলিয়া আসি।

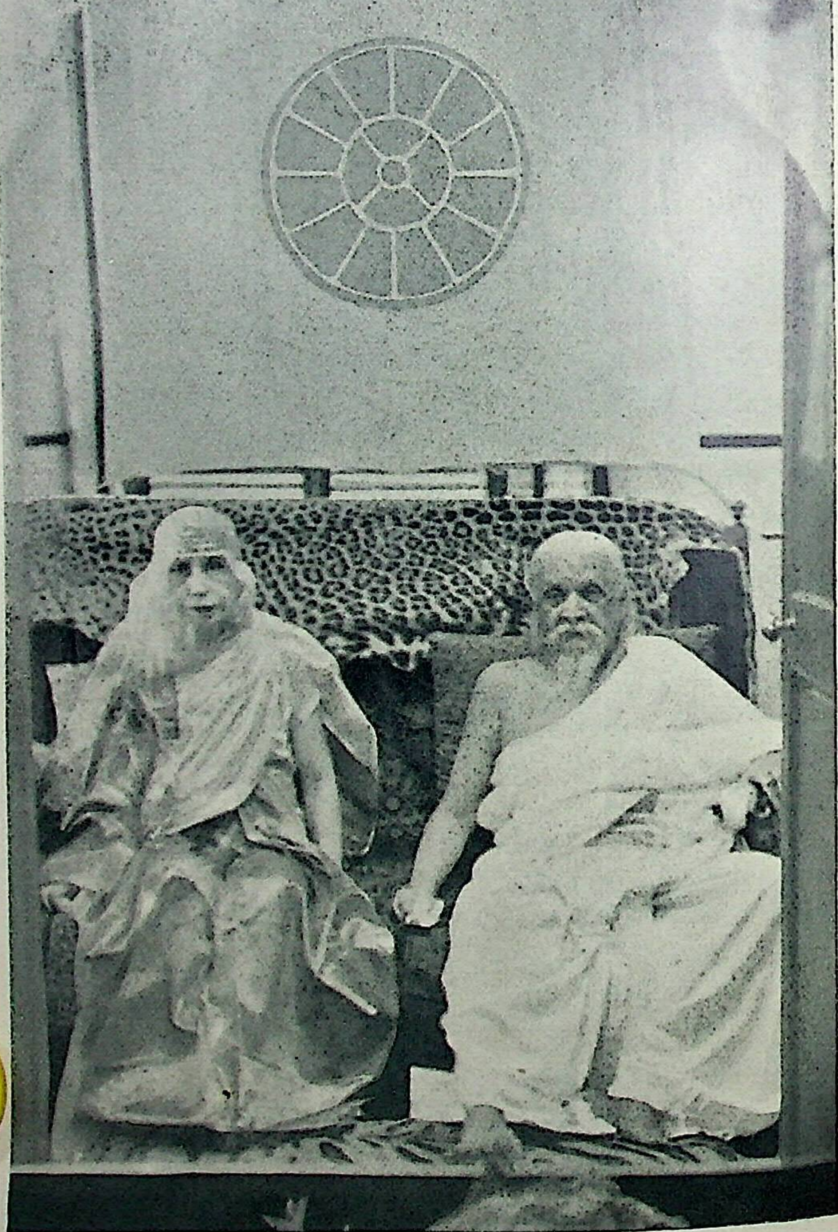


Photo: Henri Cartier Bresson

শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ

[দর্শন-দিবস—২৪শে এপ্রিল, ১৯৫০]

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার দর্শন ও আশ্রমে যোগদান

আগামী কাল ১৫ই আগষ্ট, শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবার বিশেষ কৃপায় শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করিতে পারিব, অনুমতি পাইয়া মনে অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করিতেছি। শঙ্কররাম আয়ারের সঙ্গে অন্নিবাসমে ফিরিতেছি, আর মনে মনে ভাবিতেছি, এখানে যে রকম সব কঠিন নিয়ম কানুন, আমার মত সন্ন্যাসীর স্থান এখানে হইবেই না ; যাক্ অন্ততঃ দর্শনের অনুমতি তো পাইলাম। বহুদিনের বাঞ্ছিত শ্রীঅরবিন্দকে তো একবার দর্শন করিতে পারিব ! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর রামের পিছনে পিছনে চলিয়াছি কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, আমার বাধা ও পরীক্ষা আজও শেষ হয় নাই। বাজারের রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ আমার খুব জ্বর আসিল, শরীর ভীষণ কাঁপিতে লাগিল। শঙ্কররাম একটি রিক্সা ডাকিয়া আমাকে অন্নিবাসমে নিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার ঘরে কম্বল পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম আর ভাবিতে লাগিলাম কি অভাগা আমি ! নচেৎ এত কষ্ট করিয়া এতদূরে আসিয়া, এমনভাবে দর্শনের অনুমতি পাইয়াও এই বাধা উপস্থিত হইল। সেই আলোছায়ার খেলা—যাহা আমার জীবনের আগাগোড়া সঙ্গী ! মনের জোরে খুব সাহসে ভর করিয়া, এই জ্বরের মধ্যেই আসন, নাড়ীশুদ্ধি ও প্রাণা- য়াম দ্বিগুণ মাত্রায় করিলাম, যদি জ্বরের আক্রমণটাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি। শঙ্কররাম আমার জন্য কিছু দুধ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, এবং তাঁহার কাছে কি একটা হাল্কা পথ্যের মত ছিল তাহা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া আমাকে খাইতে দিলেন। খাইয়া শুইয়া রহিলাম, রাত্রি- তিনটার সময় জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গেল। খুব ভোরে উঠিয়া মাথাটা

ও হাতমুখ ধুইয়া কাপড় বদলাইয়া একেবারে ছয়টার পূর্ব্বেই আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। শঙ্কররাম স্নান, প্রাতঃকৃত্য এবং কফি খাওয়া ইত্যাদি সমাপন করিয়া পরে আসিবেন।

আজ চারপাঁচদিন এখানে আসিয়াছি কিন্তু আশ্রমের বাহিরের ফটক পর্য্যন্তই আমি গিয়াছি, ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাই নাই। ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের দর্শন দিন। দর্শনার্থী অভ্যাগতের জন্য আজ অবারিত দ্বার। প্রাতে সাড়ে সাতটায় দর্শন আরম্ভ হইবে। এখনও প্রায় একঘন্টা বাকী। আশ্রমে উপস্থিত হইলে জনৈক ভদ্রলোক আমাকে আশ্রমের ভিতর ধ্যানমণ্ডপের দিকে লইয়া গেলেন এবং সেখানে একপাশে বসিতে বলিলেন। আশ্রমের ভিতরটি নানারকমের ফুলের ও পাতাবাহারের টবে সুসজ্জিত। এমন সুন্দর নিস্তব্ধ ও শান্ত মনে হইল, হিমালয়ের মধ্যে স্থানে স্থানে যেরূপ নিবিড়, জমাট নীরবতা দেখিয়াছি ঠিক যেন সেইরূপ। এই দিব্য আবহাওয়াতে খানিকক্ষণ বসিতেই আমার মন সহজেই ধ্যানস্থ হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ একভাবে বসিয়া রহিলাম। গতরাত্রির ভীষণ জ্বরের দরুণ শরীরে যে গ্লানি বোধ করিতেছিলাম, সব কোথায় চলিয়া গেল। যথাসময়েই দর্শন আরম্ভ হইল, ধীরে ধীরে শান্তভাবে এক একজন সাধক সিঁড়ি দিয়া উপরে যাইতেছেন ও দর্শন করিয়া সেইভাবেই নামিয়া আসিতেছেন। বেলা ৯টার পরে দর্শনার্থী-গণ কতকটা শ্রেণীবদ্ধভাবে হলের ভিতর দিয়া আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হাতে ফুলের মালা, তোড়া ইত্যাদি নানা অর্ঘ্য। কাহারও কাহারও হাতে খাম দেখিয়া আমি মনে করিলাম হয়ত কেউ কেউ চিঠি-পত্রও দেন—আমিও কেন শেষ একখানি চিঠি লিখিয়া নেই না? আর এখানে গত চারপাঁচদিন আশ্রম-দ্বারে যাতায়াত করিয়া শুনিতে পাইয়াছি সবাই কেবল মা মা করিতেছেন, যেন মা-ই সব। আমি তো শ্রীঅরবিন্দকে বিস্তারিত চিঠি লিখিয়াছি, এখন মাকে একখানি চিঠি

দুইচার কথায় লিখিয়া নিই। তাই আসন হইতে উঠিয়া কোন ভদ্রলোকের নিকট হইতে একটু কাগজ সংগ্রহ করিয়া Common-room-এ গিয়া বসিয়া একটি ছোট চিঠি লিখিলাম শ্রীমাকে লক্ষ্য করিয়া —যাহাতে তিনি আমাকে শিষ্য ও সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেন, বিফল-মনোরথ হইলে গুরুদেবের অভাবে আমার অধ্যাত্মজীবন নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ কয়েক ছত্র লিখিয়া চিঠিখানি হাতে করিয়া আমার আগের স্থানে আসিয়া বসিয়া রহিলাম এবং এই দিব্যদৃশ্য দিব্য আবহাওয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

শ্রীযুক্ত অনিলবরণের দর্শন সর্ব্বপ্রথম পাঁচ সাতজনের মধ্যেই হইয়া গিয়াছিল। তিনি দর্শন করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন যে আমার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই তিনি আসিবেন এবং আমাকে উপরে লইয়া যাইবেন। আমার নির্দ্দিষ্ট সময় সাড়ে দশটায় ছিল। তিনি যথাসময়ে আসিলেন এবং আমার হাতে ফুল ইত্যাদি কিছুই না দেখিতে পাইয়া কোথা হইতে সামান্য কিছু ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমার হাতে দিলেন এবং চিঠিখানি আমার হাতে দেখিয়া বলিলেন যে এখন চিঠি দিবার সময় নয়। চিঠিখানি তিনি লইলেন, বিকালে শ্রীমাকে পাঠাইয়া দিবেন বলিলেন। চারিদিক তখন এমন নিস্তব্ধ যে বেশী কথা বলা চলে না, চিঠিখানি শ্রীযুক্ত অনিলবরণের হাতে দিয়া তাঁহাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের সম্মুখে গিয়া কিভাবে কি করিব?" তিনি বলিলেন যে তাহা বলিয়া দেওয়া যায় না, সেখানে গিয়া যাহা ভিতর হইতে আসিবে তাহাই করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ আমাকে উপরে দর্শন মণ্ডপে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার সম্মুখে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন। মণ্ডপে প্রবেশ করিতেই দূর হইতে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমাকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহারাও আমাকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা সোফাতে উপবিষ্ট আছেন। এত

বড় বিরাট ও মহান সত্তার (সাক্ষাৎ শরীরধারী ভগবান) সাম ন কি ভাবে কি করিতে হয় কিছু জানি না ; আর সবই নীরব, পরিপূর্ণ নীরবতা, যেন আর কেহই সেখানে নাই। অনুভব করিলাম যে আমার শরীর প্রাণ ও মন এক অনির্ব্বচনীয় অনুভূতিতে ও পরমশ্রদ্ধায় অবনত হইল। আমার ঠিক আগে, নর্ম্মদাতীরবাসী একটি বৈষ্ণব সাধু, তাঁহার নাম বনমালী, তিনি দর্শন করিতে গেলেন ; চাহিয়া দেখিলাম তিনি কি ভাবে পূজার্চ্চনা করিতেছেন। তখন বেশ সময় পাওয়া যাইত। প্রত্যেকের দেড় মিনিট করিয়া সময় ছিল। নর্ম্মদার সাধুটি আগে শ্রীমাকে পূজার্চ্চনা করিলেন। তাঁহার অর্ঘ্য আগে শ্রীমার চরণ স্পর্শ করাইয়া একপাশে সরাইয়া রাখিলেন এবং চরণে প্রণাম করিলেন, শ্রীমা তাঁহাকে মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে শ্রীঅরবিন্দের দিকে ফিরিয়া শ্রীঅরবিন্দের চরণ স্পর্শ করিয়া অর্ঘ্য এক পাশে রাখিয়া দিয়া চরণে প্রণাম করিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সর্ব্বশেষে বাম হাতে শ্রীমার চরণ ও ডানহাতে শ্রীঅরবিন্দের চরণ ধরিয়া সোফার মাঝখানে মাথা ঠেকাইয়া উভয়কে প্রণাম করিলেন এবং শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ এক সঙ্গে তাঁহার মাথার উপর হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই দৃশ্যটি আমার বড়ই মধুর লাগিল। সাধুটি এইরূপে নিজেকে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেলে পর আমি শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের চরণতলে উপনীত হইলাম। চক্ষে চক্ষে মিলন হইল। সাধুটি ঠিক যাহা যেমনটি করিয়াছিলেন ঠিক সেই মতন করিলাম এবং আরও একটু বেশী করিলাম। পিছনের যাতায়াত ঘরটিতে আসিয়া শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের সম্মুখে আবার একটি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম—

দীর্ঘদণ্ডং নমস্কৃত্য নির্লজ্জো গুরুসন্নিধৌ।

(গুরুগীতা)

এবং মনে মনে তাঁহাদিগকে গুরুপদে বরণ করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ-ভাবে তাঁহাদের চরণে ছাড়িয়া দিলাম।

শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের ডানদিকে, উভয়ে একই সোফাতে বসিয়া দর্শন দিতেছেন ও আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। আমার কাছে মনে হইল শ্রীমা সাক্ষাৎ পার্ব্বতী উমা এবং শ্রীঅরবিন্দ সাক্ষাৎ শিব। হিমাদ্রির মত সমুচ্চ, সাগরের মত বিস্তৃত ও গভীর যে শ্রীঅরবিন্দ—তাঁহার মহিমা কি বুঝিব ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি। দেবতার দৃষ্টি কিন্তু করুণাপূর্ণ। শ্রীমার হাসি কি মর্ম্মস্পর্শী, কি অপরূপ, যেন অহেতুকী প্রেম ও ভালবাসা ঝরিয়া পড়িতেছে। রামেশ্বর হইতে পণ্ডিচেরীতে আসিয়াছিলাম, রামেশ্বরের হর-পার্ব্বতীর প্রভাব তখনও আমার উপর যথেষ্ট ছিল। আমি শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দকে তাই হরপার্ব্বতীই দেখিলাম ও অনুভব করিলাম। সেদিন আশ্রমে যে দিব্য শান্ত আবহাওয়া অনুভব করিয়াছিলাম তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। মনে প্রাণে একটি অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করিলাম।

দর্শন করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া সেই নীরব শান্ত দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। আমার কাছে সবই যেন এক নূতন চেতনা ও নূতন জীবনের সূচনা করিতেছে। যেন এক নূতন জগতের দ্বার উদঘাটিত হইল। কিন্তু এখনই তো সবই আমার শেষ হইয়া যাইবে, কেন না অনুমতি পাইয়াছি শুধু দর্শনের। শ্রীযুক্ত শঙ্কররাম আয়ারের দর্শন আমারও এক ঘন্টা পরে। তিনি যাত্রী-শ্রেণীতে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। আমি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি দর্শ-নান্তে নীচে নামিয়া আসিলেন। আমরা দুজনেই সম্পূর্ণ নূতন, এখানে বন্ধুহীন। তাই দুজনের দর্শন হইয়া গেলেই অম্নিবাসমে ফিরিয়া গেলাম। দর্শন শেষ হইতে আরও ঘন্টাখানেক লাগিবে। সে

বৎসর দর্শনার্থী ছিলেন প্রায় আড়াইশত, তন্মধ্যে আশ্রমবাসী কমবেশী একশত। ছত্রে যাইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অনিলবরণের সঙ্গে দেখা করিলাম, তিনি বলিলেন পরদিন সকালে দেখা করিতে পত্রোত্তরের জন্য।

অম্নিবাসম্ ছত্রে মধ্যাহ্নে আহার করিয়া বিশ্রাম করিলাম এবং বিকালে কলিকাতায় বন্ধুদিগকে চিঠি লিখিয়া দিলাম যে আমার দর্শন হইয়াছে, তবে এখানে যে থাকিয়া যাইতে পাইব তাহার সম্ভাবনা খুবই কম, আগামী কাল যে দিকে চোখ যায় চলিতে থাকিব। শঙ্কররামের সঙ্গে দর্শনের দিনটি খুব ভালভাবে কাটিল, তখন দর্শনের দিনই বিকালে চার কি পাঁচটার সময় শ্রীমা দর্শনার্থীদিগকে আশীর্ব্বাদী মালা দিতেন। তাহা শ্রীযুক্ত শঙ্কররাম আয়ার বা আমি কেহই জানিতাম না এবং বিকালে আশ্রমে যাই নাই। পরদিন ভোরে শঙ্কররাম আয়ারের নিকট বিদায় লইয়া, অম্নিবাসম ছত্র হইতে আসন উঠাইয়া রওনা হইলাম, আশ্রমে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া জানিব কিছু উত্তর আছে কি না। মনে মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে এবার পশ্চিম ভারতে নর্ম্মদা, দ্বারকা ইত্যাদি তীর্থস্থান দেখিব।

পরদিন ১৬ই আগষ্ট প্রাতে আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হইতেই দ্বাররক্ষক আমার হাতে দুইখানি চিঠি দিলেন এবং বলিলেন যে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ আমাকে খুঁজিতেছেন। সেই পরিচয়পত্র দুখানি আজ ১৬ই আগষ্ট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখন আর পরিচয়-পত্রের কি প্রয়োজন? যদি সময় মত আসিত তাহা হইলে হয়ত আশ্রমেই স্থান পাইতাম, কিন্তু সবই শ্রীমার ইচ্ছা। শ্রীযুক্ত অনিলবরণের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শুভসংবাদ, মা আপনাকে আশ্রমে থাকার জন্য অনুমতি দিয়াছেন, তবে আপনি সন্ন্যাসী মানুষ, সর্ত্ত আছে;

আসুন আপনাকে মার চিঠি বুঝাইয়া দেই।" আশ্রমে থাকার অনুমতি পাইয়াছি শুনিয়াই আমার মনটা আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল, সর্ত্ত সব মাথায় থাক: একটা সুযোগ যখন পাইয়াছি, তখন তাহা ছাড়া হইবে না, সর্ত্ত যাহাই হউক। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ এই চিঠিখানি পড়িয়া আমাকে শুনাইলেন এবং বাংলায় বুঝাইয়া দিলেন।

Anilbaran,

You can see Yogadananda and tell him that this is not an Asram like others—the members are not sannyasis and do not live like sannyasis; nor is the object the same; it is not *moksha* that is the aim of the Yoga here. What is being done here is preparation for a work—a work which will be founded on yogic consciousness and Yoga-Shakti and can only be begun when these are fully founded. Meanwhile every member here is therefore expected to do some work as a preparation, work often of the most ordinary and uninteresting kind and they do not spend their time in meditation and speaking about religion or spiritual things. The life here will therefore be quite the opposite of what he is accustomed to and may go very much against the grain. He should not ask to join in ignorance of these things or with the idea that he will be here to carry on more sufficiently his old life

and Yoga. If he is willing inspite of this to try under these very different conditions, then he can remain.

16-8-1932 Sri Aurobindo

বঙ্গানুবাদ

অনিলবরণ,

তুমি যোগদানন্দের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে বলিতে পার যে এই আশ্রম অন্যান্য আশ্রমের মত নহে। এখানকার আশ্রমবাসীরা সন্ন্যাসী নহেন, সন্ন্যাসীর মত থাকেনও না; তাঁহাদের লক্ষ্যও অন্য-প্রকার; এখানকার যোগের কাম্য মোক্ষ নহে। এস্থানে যাহা করা হইতেছে তাহা কর্ম্মবিশেষের জন্য প্রস্তুতি—এমন একপ্রকারের কর্ম্ম যাহার ভিত্তি হইবে যৌগিক চৈতন্য ও যোগশক্তি এবং যাহা আরম্ভ করা যাইতে পারে শুধু এই দুইটি বস্তু পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইলে। অতএব ইতিমধ্যে এখানকার প্রত্যেক সাধককে প্রস্তুতি হিসাবে কিছু না কিছু কার্য্য করিতে হয়, এই নিয়ম—এই কার্য্য অনেক সময়ে অতীব সাধারণ ও একঘেয়ে রকমের; এই সাধকমণ্ডলী ধ্যান ধারণা এবং ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে কথোপকথনেই কালক্ষেপ করেন না। সুতরাং এই আশ্রমের জীবনধারা তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত জীবনধারার একেবারে বিপরীত হইবে, হয়ত তাহার একেবারে বিসদৃশ লাগিবে। এ সমস্ত কথা না জানিয়া বুঝিয়া তাহার এই আশ্রমে যোগদান করা উচিত নহে, এরূপ ধারণা লইয়াও তাহার আসা উচিত নহে যে এখানে থাকিয়া সে তাহার পূর্ব্বতন জীবন ও যোগকে পূর্ণতরভাবে অনুসরণ করিবে। ইহা সত্ত্বেও যদি সে এই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের পরিবেশে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে এখানে থাকিতে পারে।

১৬-৮-১৯৩২ শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার দর্শন ও আশ্রমে যোগদান

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও তাহার মহান্ লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাকে অনেক কিছু বুঝাইয়া বলিলেন, কারণ আমাকে সন্ন্যাসী দেখিয়াই তাঁহারা মনে করিয়াছেন—আমি শঙ্করপন্থী মায়াবাদী। কিন্তু আমাদের গুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবা তো সে শ্রেণীর সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি ভগবদুপলব্ধিপ্রাপ্ত এবং ভগবতীশক্তির যথার্থ শরণাগত সন্তান ছিলেন; আমরা তাঁহারই শিষ্য। স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব আমাকে সন্ন্যাসে আকৃষ্ট করিয়াছিল। আজ ছয় সাত বৎসর গুরুদেব দেহরক্ষা করিয়াছেন, তদবধি কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় অকূল সাগরে ভাসিতেছি, লক্ষ্যভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্ট। গুরুর কৃপা ছাড়া অধ্যাত্মপথে চলা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আমার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী গুরু পাওয়াও অত্যন্ত কঠিন। গুরুদেব দেহরক্ষা করিলে পর যখন হইতে আবার গুরুর অভাব বোধ করিতেছি তখন হইতে একমাত্র শ্রীঅরবিন্দই আমার গুরুর অভাব পূরণ করিতে পারেন ভাবিতেছি। শ্রীগুরুদেব বিদ্যমান থাকিতেই তাঁহার মুখে শ্রীঅরবিন্দের গভীর আধ্যাত্মিকতা এবং বিরাট ও মহান্ ব্যক্তিত্বের কথা শুনিয়াছি এবং শৈশব হইতেই দেশনেতা হিসাবে তাঁহাকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করিয়াছি ও ভালবাসিয়াছি। তাই আমি এখানে তাঁহাদের চরণে ছুটিয়া আসিয়াছি কিন্তু এখানকার কঠিন নিয়মকানুন দেখিয়া ভাবি নাই আমি এখানে গৃহীত হইব, কিন্তু শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ যখন আমাকে অসীম কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন এবং থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন তখন সব সর্ত্ত মানিয়া লইলাম। প্রাণপণে চেষ্টা করিব এখানকার জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলাইয়া দিতে। অনিলবরণকে বলিলাম, "আপনি শ্রীমাকে জানাইয়া দেন—'I throw myself at their feet.' আমি নিজেকে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিতেছি।" শ্রীযুক্ত অনিলবরণ বলিলেন, "আচ্ছা, এখন যান, মাকে নিবেদন করি; পরে মা কি বলেন তাহা আপনাকে জানাইব।"

অন্নিবাসমে আবার ফিরিয়া গেলাম। শঙ্কররাম আয়ারকে শ্রীমার পত্রের কথা বলিলাম। তিনি খুবই আনন্দিত হইলেন শুনিয়া যে আমি আশ্রমে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছি। সেইদিনই বিকালে শ্রীমার উত্তর পাইয়া অনিলবরণবাবু আমাকে আশ্রমে চলিয়া আসিতে বলিবার জন্য ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বানার্জীকে পাঠাইলেন। আমি তখন ছাদে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম। ধ্যানের পর ছাদ হইতে নামিয়া আসিলে শঙ্কররাম আমাকে এই খবর দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া আমি আমার আসন কমণ্ডলু বহির্ব্বাস লইয়া তখনই আশ্রমে গেলাম এবং শ্রীযুক্ত অনিলবরণের সঙ্গে দেখা করিয়া জানিলাম যে শ্রীমা আমাকে আশ্রমে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। আজই আশ্রমে আসিবার জন্য ব্যবস্থাও হইয়াছিল কিন্তু যথাসময়ে আমি আসিতে পারি নাই। অনিলবরণ বলিলেন, "এখন অসময় হইয়া গিয়াছে, আজ গিয়া অন্নিবাসনেই থাকুন, কাল প্রাতঃকালে আসিবেন।" এইভাবে আমি ১৯৩২ সনে ১৭ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যোগদান করিলাম।

Anilbaran,

You will tell Yogadananda that he can remain and we will try whether he can settle down into the atmosphere and life of the Asram and way of this Yoga.

16-8-1932 Sri Aurobindo

বঙ্গানুবাদ

অনিলবরণ, তুমি যোগদানন্দকে বলিবে যে সে এখানে থাকিতে পারে, এবং আমরা চেষ্টা করিয়া দেখিব যে সে এই আবহাওয়াতে এই আশ্রমের জীবনে ও এই যোগের পন্থাতে স্থির হইয়া বসিতে পারে কি না।

১৬-৮-১৯৩২ শ্রীঅরবিন্দ

বোধিহাউস নামে তখন আশ্রমের একটি ভাড়া বাড়ী ছিল সমুদ্রতীরে পিয়ারের আরও দক্ষিণে Beach Road-এর উপরে। ইহারই উপর-তলায় একখানি ঘর আমার জন্য ও একখানি শঙ্কররামের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। খুবই আশ্চর্য্যভাবে যোগাযোগ, শ্রীযুক্ত শঙ্কররাম আয়ার যদিও ইতিপূর্ব্বে দুইএকবার শ্রীঅরবিন্দ দর্শনে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এবারই তিনি আশ্রমজীবন গ্রহণ করিবেন এই শুভসঙ্কল্প লইয়া আসিয়াছিলেন এবং শ্রীমাকে তাহা জানাইয়া অনুমতি প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন। তাহা তিনি পূর্ব্বে আমার কাছে বলেন নাই। কিন্তু বোধি হাউসে পরদিন আশ্চর্য্যভাবে আমাদের পুনর্ম্মিলন হইল। দুইজনেই একদিনে আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। বাড়ীখানির পূর্ব্বদিকে Beach Road তার পরই অপার সমুদ্র। বড়ই সুন্দর দৃশ্য। সমুদ্রতীরের রাস্তা ধরিয়া রোজ আশ্রমে যাতায়াত করিতাম। একদা দেখিয়াছি হিমা-লয়ের গভীর স্তব্ধতা ও আকাশচুম্বী তুষারাবৃত শৃঙ্গ, আর এখানে রোজ সকালে বিকালে দেখিতেছি অতলস্পর্শা মহাসমুদ্রের অনন্তবিস্তার—সমুদ্রতীরে সমগ্র ধরণীর রূপান্তর-সাধনায় ধ্যানসমাহিত মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ, প্রত্যেকেই যেন অনন্তের শাশ্বত মহিমার প্রমূর্ত্ত প্রকাশ! পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবা যে শ্রীশ্রীজগন্মাতার আদেশবাণী পাইয়াছিলেন—'সমুদ্রতীরে যাইয়া একজন বড়লোকের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে' এই বাণীর সার্থকতা এইখানে—সমুদ্রতীরে শ্রীঅরবিন্দের কাছে।

'সমুদ্রতীরে' শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে

মহাজ্ঞানী, মহাশক্তি, প্রেমময়ী, শান্তিময়ী শ্রীমা কে ?

আশ্রম প্রবেশের দুইদিন পরেই, আশ্রমের বি, এস (Building Service) বিভাগে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে তত্ত্বাবধানের কাজ পাইলাম। প্রাতঃকাল সাড়ে সাতটা হইতে মধ্যাহ্ন বারোটা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ণ দেড়টা হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত থাকিতাম। তখন প্রাতঃকালে সাতটার মধ্যেই শ্রীমা ধ্যান-মণ্ডপে আসিয়া বসিতেন এবং সামান্যক্ষণ ধ্যান করিতেন ও পরে প্রণাম গ্রহণ করিতেন। প্রত্যেকেই শ্রীমাকে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেন এবং শ্রীমা প্রত্যেকের মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন ও একটি ফুল দিতেন। শ্রীমায়ের এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণের পর প্রাতরাশ সারিয়া বি, এস-এর কাজে বাহির হইতাম। বি, এস-এর কাজ করিতে করিতে হারাধনদার সঙ্গে পরিচয় হইল। তিনিও বোধি হাউসে নীচের তলায় থাকিতেন এবং একই বিভাগে দুইজনে কাজ করিতাম। হারাধনদার সঙ্গে বেশ ভাব হইয়াছিল। বাড়ীতে তাঁহার একটা ছোট্ট বাগান ছিল, তাহাতে আমি ভোরে স্নানের আগে গাছে জল দিতাম। হারাধনদা প্রায় রোজই বাগান হইতে শ্রীমাকে কিছু ফুল, ফল, শাক, পাতা, তরকারী ইত্যাদি দিতেন। একটি পেঁপে গাছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পেঁপে হইত। মা পেঁপে খুব ভালবাসিতেন।

বারোটার ঘণ্টা বাজিলে কাজ বন্ধ হয়, ভোজন ও বিশ্রামের জন্য। তখন আমরা main building-এর মধ্যেই অবস্থিত খাওয়ার ঘরে

খাইতে যাইতাম, যেখানে এখন পৃথ্বীসিং বাবুর ঘর। আমার বাড়ী দূরে থাকায় মধ্যাহ্নে আহার করিয়া সমুদ্রতীরে ঘরে গিয়া বিশ্রাম করিয়া আসার সময় থাকিত না। আমি নূতন লোক—আশ্রমে কাহারও সঙ্গে তেমন জানা-শুনা বা আলাপ পরিচয় না থাকাতে কাহারও ঘরে যাইতাম না। বেল্‌কনির (balcony) নীচে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। দেড়টার ঘণ্টা বাজিলে আবার কাজে যোগদান করিতাম। প্রায় দুইমাস এইভাবে কাটিল। বড়ই কষ্ট হইত। কাজেও বিরক্তি লাগিত, তন্দ্রা আসিত। কাজ আর কিছুই নয়, শুধু বসিয়া দেখা ও লক্ষ্য রাখা—লোকেরা কাজ করিতেছে কি না। জীবনে নিজে কখন কোন বিশেষ কাজ শিখিবার বা করিবার সুযোগ পাই নাই। ছোটকাল হইতেই সাধু হইয়াছি। এইভাবে কাজ করাতে একেবারে অনভ্যস্ত। এখানকার আশ্রম, যোগ-সাধনা ও লক্ষ্য সবই নূতন; মুখ্য সাধনা কর্ম্মে। "Yoga in action is indispensible" আর আমার আশ্রমে যোগদানের সর্ত্তই রহিয়াছে যে আমাকে কিছু কাজ করিতে হইবে, এখানকার শিক্ষানুযায়ী সাধনা করিতে হইবে। শ্রীমার কৃপায় ও সাহায্যে বৎসর খানেকের মধ্যেই আমি এখানকার জীবন ও সাধনার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একীভূত হইতে সমর্থ হইয়াছিলাম—আগের সাধনাধারা হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইতে পারিয়াছিলাম। তাহার আরও একটি কারণ ছিল; আমি এমন কিছু পাইলাম যাহার কথা আমার শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবা আমাকে বহুপূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন; এ বিষয়ে আমি ক্রমশঃ লিখিতেছি।

মধ্যাহ্নে বিশ্রামের অভাবে আমার অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া হারাধনদা শ্রীমাকে জানাইতে বলিলেন। সেইদিনই মাকে লিখিয়া জানাইলাম। পরদিন মা ব্যবস্থা করিলেন। Furniture বিভাগের অমলকে (K. D. Sethna) জানাইলেন B. S. Office ঘরে আমার

জন্য একটি ইঞ্জিনিয়ার দিতে এবং B. S. Office-এর কর্তা ক্ষীরোদবাবুকে জানাইয়া দিলেন যে আমি মধ্যাহ্নে তথায় বিশ্রাম করিব। সুন্দর ব্যবস্থা হইয়া গেল, আর কোন অসুবিধাই রহিল না।

ইতিমধ্যে হারাধনদা আমাকে একদিন বলিলেন যে শ্রীমার "ধ্যান ও প্রার্থনা" Prières et Méditations de la Mère নামে একখানি খুব ভাল পুস্তক আছে ফরাসী ভাষায় লিখিত। ইহাতে শ্রীমার সাধনা-জীবনের গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসমূহ এবং ভগবদ্ আদেশ, প্রত্যাদেশ ইত্যাদি লিখিত আছে। তাহা হারাধনদা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে চান, আমি যদি লিখি, তিনি বলিয়া যাইবেন। হয় মধ্যাহ্নে বিশ্রামের সময় কিম্বা বাড়ীতে রাত্রিবেলা সময় করিয়া লইতে হইবে। হারাধনদা ফরাসী ভাষা বেশ ভালই জানিতেন, তাঁহার বাড়ী ছিল চন্দননগরে তাই বাল্যকালে স্কুলেই ফরাসী ভাষা শিখিয়াছিলেন। বাংলাভাষায় লিখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। হারাধনদার এই প্রস্তাব শ্রীমাকে জানাইলাম। মা বলিলেন যে হারাধন বঙ্গানুবাদ করিতে পারে এবং আমিও তা লিখিতে পারি তাতে তাঁহার কোনই আপত্তি নাই, তবে অনুবাদ মাকে না দেখাইয়া ছাপান হইবে না। হারাধনদা কেন যে অযাচিতভাবে আমাকে ধরিলেন তাঁহার অনুবাদ লিখিবার জন্য, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইহারই ভিতর দিয়া আমার পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবার দৃষ্ট শ্রীশ্রীজগন্মাতার সন্ধান পাই। কে জানে হয়ত হারাধনদার অনুবাদের প্রেরণার মধ্যে শ্রীমার এই ইচ্ছা ছিল!

'Prayers'-এর প্রথম হইতেই অনুবাদ সুরু হইল, হারাধনদা বলিতেন এবং আমি লিখিতাম। আমি সবে মাত্র আশ্রমে যোগদান করিয়াছি, এখনও তিনমাস হয় নাই। তখনও আমি ফরাসীভাষা শিক্ষা আরম্ভ করি নাই; কিন্তু আশ্রমে ফরাসীভাষা শিক্ষা বিষয়ে সাধক ও সাধিকাদের খুবই উৎসাহ আছে। প্রথম কারণ পণ্ডিচেরী



শ্রীমা

Photo: Henri Cartier Bresson

ফরাসী ভারতের প্রধান সহর ; ফরাসী কৃষ্টি ও ফরাসী সাহিত্য খুবই চিত্তাকর্ষক। দ্বিতীয় কারণ শ্রীমার সাধনা–জীবনের গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অনুভূতি সকল এবং শ্রীভগবানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, আদেশ, প্রত্যাদেশ ইত্যাদি সম্বন্ধে মূল পুস্তকটি ফরাসী ভাষায় লিখিত। তাই এই ভাষা শিক্ষায় সবারই খুব উৎসাহ।

শ্রীমার 'Prayers'-এর বঙ্গানুবাদ লিখিতে লিখিতে আমার পরিচয় হইল তাঁহার ভগবদুপলব্ধি, ভগবানের সঙ্গে বাক্যালাপ, আদেশ, প্রত্যাদেশ ইত্যাদির সহিত। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে এই বিশ্বাস হইতে লাগিল যে এই মা তো সাধারণ সাধিকা নন, ইনি কে ? দেখা যাইতেছে মা তো প্রথম হইতেই ভগবানকে পাইয়াছিলেন "I had definitively found Thee, that the Union was constant." অর্থাৎ "আমি তোমাকে নিঃসন্দেহে খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম, তোমার সাথে মিলন নিরবচ্ছিন্ন হইয়াছিল।"

November 19, 1912

I said yesterday to that Englishman who is seeking for Thee with so sincere a desire, that I had definitively found Thee, that the Union was constant. Such is indeed the state of which I am conscious. All my thoughts go towards Thee, all my acts are consecrated to Thee; Thy Presence is for me an absolute, immutable, invariable fact, and Thy Peace dwells constantly in my heart. Yet I know that this state of union is poor and precarious compared with

that which it will become possible for me to realise tomorrow, and I am as yet far, no doubt very far, from that identification in which I shall totally lose the notion of the "I", of that "I", which I still use in order to express myself, but which is each time a constraint, like a term unfit to express the thought that is seeking for expression. It seems to me indispensable for human communication, but all depends on what this "I" manifests; and how many times already, when I pronounce it, it is Thou who speakest in me, for I have lost the sense of separativity.*

বঙ্গানুবাদ

১৯শে নভেম্বর, ১৯১২।

সেই যে ইংরাজটি এমন ঐকান্তিক কামনা সহ তোমার সন্ধান করিতেছে, গতকাল তাহাকে আমি বলিয়াছি যে আমি নিঃসংশয় তোমাকে খুঁজিয়া পাইয়াছি এবং আমাদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই অবস্থা সম্বন্ধে সদা চেতন। আমার সকল চিন্তা তোমার পানে ধাবিত, সকল কর্ম্ম তোমার চরণে উৎসৃষ্ট : তোমার সান্নিধ্য আমার কাছে একটি ধ্রুব, অটল, অবিকারী সত্য ; এবং তোমার শান্তি আমার অন্তরে নিয়ত বাস করিতেছে। তথাপি আমি জানি যে আমাদের আজিকার এই মিলন নগণ্য ও অনিত্য ব্যাপার সেই

* **Prayers and Meditations of the Mother. Page 3.**

মিলনের তুলনায় যাহা কল্য আমার অধিগম্য হইবে ; আমি জানি যে এখনও আমি দূরে, হয়ত বহু দূরে রহিয়াছি সেই একাত্মজ্ঞান হইতে যেখানে 'আমি' 'আমার' অহং অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে খসিয়া পড়িবে ; এই অহংশব্দ যাহা দ্বারা এখনও আমি নিজেকে ব্যক্ত করি, কিন্তু যাহা আমাকে প্রতিবারেই পীড়া দেয়, মনে হয় যেন যে-ভাবনা ব্যক্ত হইতে চাহিতেছে এই শব্দ তাহার উপযোগী নয়। মানুষের কথোপকথনে ইহার প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু অহং বলিলে যাহা বুঝায় তাহার মধ্যে সবই রহিয়াছে ; ইতঃপূর্ব্বে কতবারই এরূপ ঘটিয়াছে যে যখনই এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছি তখনই বোধ হইয়াছে যেন তুমি আমার মধ্যে-কথা কহিতেছ কেননা তখন ভেদের অনুভূতি আমার চলিয়া গিয়াছে।

* * *

Dec. 13, 1913.
Peace, peace, peace on all earth.
শান্তি, শান্তি, শান্তি—সারা পৃথিবী জুড়িয়া শান্তি।

Feb. 8, 1913.
Let Thy peace reign upon earth.
সারা পৃথিবীতে তোমার শান্তি রাজত্ব করুক।

April 19, 1914.
May Thy peace reign over all.
সর্ব্ববস্তুতে তোমার শান্তি রাজত্ব করুক।

May 28, 1914.
Peace, peace on all things.
শান্তি, শান্তি, সর্ব্বভূতে তোমার শান্তি।

Sept. 1, 1914.
"Turn towards those who have need of Thy love."

"যাহারা তোমার প্রেমপ্রার্থী তাহাদের পানে ফিরিয়া চাও।'
For the Divine universal Mother has turned her look towards the earth and blessed her.
কেননা ভগবতী বিশ্বমাতা পৃথিবীর পানে চক্ষু ফিরাইয়াছেন এবং তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।
And as always Thou hast said to me, "Turn thy look towards the earth."
এবং যেমন তুমি আমাকে সর্ব্বদা বলিয়াছ "জগতের পানে তোমার দৃষ্টি ফিরাও।"

Dec. 5, 1916
"Turn towards the earth" "Everywhere and in all in whom Thou canst see the One, will be awakened the consciousness of this identity with the Divine. Look...."

"জগতের পানে ফিরিয়া চাও।" "সর্ব্বত্র এবং যাহাদের অন্তরে তুমি অদ্বিতীয় এককে দেখিতে পাইতেছ, তাহাদের সবার মধ্যে জাগ্রত হইবে ভগবানের সাথে এই অখণ্ড অভেদের চেতনা। চাহিয়া দেখ।"

May 12, 1914.

This morning passing by a rapid experience from depth to depth, I was able, once again,

as always, to identify my consciousness with Thine and to live no longer in aught but Thee; —indeed, it was Thou that was living, but immediately Thy will pulled my consciousness towards the exterior, towards the work to be done, and Thou saidst to me, "Be the instrument of which I have need."

বঙ্গানুবাদ :—আজ প্রাতঃকালে এক ত্বরিত অনুভূতির ফলে, গভীর হইতে গভীরে বিচরণ করিয়া, আমি নিত্যকার মত তোমার চেতনাতে আমার চেতনাকে মিলাইতে পারিয়াছিলাম এবং তোমারই মধ্যে বাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম ; অর্থাৎ তখন একমাত্র তুমিই বিদ্যমান ছিলে ; কিন্তু তোমার ইচ্ছা তখনই আমার চেতনাকে টানিয়া বাহিরে আনিল করণীয় কর্ম্মরাজির দিকে, এবং তুমি আমাকে বলিলে, "তুমি আমার আবশ্যকীয় যন্ত্র হও।"

May 16, 1914.

Now I clearly understand that union with Thee is not an end to be pursued, so far as this present individuality is concerned; it is a fact accomplished long since. And that is why Thou seemest to tell me always: "Do not revel in the ecstatic contemplation of this union, fulfil the mission I have confided to thee on the earth."

বঙ্গানুবাদ :—এখন আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে তোমার সাথে মিলন একটা অনুসরণীয় লক্ষ্য নয় এই বাস্তব ব্যক্তিগত সত্তার পক্ষে ;

তাহা বহুকাল পূর্ব্বেই সাধিত হইয়াছে। সেইজন্য আমার কেবলই মনে হয় যে তুমি অহরহ বলিতেছ: "এই মিলনের পরমানন্দময় ধ্যানে বিভোর হইয়া থাকিও না; পৃথিবীতে যে কার্য্যের ভার দিয়া তোমাকে পাঠাইয়াছি, তাহা সম্পন্ন কর।"

May 20, 1914.

From the height of that summit which is identification with Thy divine, infinite love, Thou hast turned my look towards this complicated body which has to serve Thee as an instrument. And Thou hast said to me: "It is myself; seest Thou not that my light shines in it?" And in fact I saw Thy divine Love, clad in intelligence, and then in force, constitute this body in its smallest cells and radiate in it to such a point that it became nothing else than a mass of millions of radiant sparks, which all made it manifest that they were Thou.

And now all darkness has disappeared, and Thou alone livest, in different worlds, under different forms, but with a life identical, immutable and eternal.

We must make this divine world of Thy immutable domain of pure love and indivisible oneness commune intimately with the divine

world of all the other domains, upto the most material where Thou art the centre and the very constitution of each atom. To establish a bond of perfect consciousness between all these successive divine worlds is the sole means to live in Thee constantly and invariably, accomplishing integrally the mission Thou hast confided to the whole being in all its states of consciousness and all its modes of activity.

* * *

বঙ্গানুবাদ :—তোমার দিব্য অনন্ত প্রেমের সাথে অভেদরূপী এই উচ্চ শিখর হইতে তুমি আমার দৃষ্টি ফিরাইয়াছ এই জটিল শরীরের পানে যাহা তোমার যন্ত্র হইয়া কাজ করিবে। আর তুমি আমাকে বলিয়াছ : "আমিই তোমার এই দেহ ; দেখিতে পাইতেছ না, ইহার মধ্যে আমার দীপ্তি জ্বল জ্বল করিতেছে।" এবং সত্যই আমি দেখিয়াছি যে তোমার দিব্য প্রেম, প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা ও পরে শক্তিদ্বারা আবৃত হইয়া এই শরীরকে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার ক্ষুদ্রতম দেহকোষ অবধি,—দেখিয়াছি যে এই দেহ সহস্র সহস্র ভাস্বর স্ফুলিঙ্গের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়, যে-স্ফুলিঙ্গরাজি প্রকট করিতেছে যে তাহারা তোমার সাথে অভিন্ন।

আর এখন সব অন্ধকার দূর হইয়াছে, একমাত্র তুমিই বিদ্যমান রহিয়াছ, নানা জগতে, নানা মূর্ত্তিতে, কিন্তু এক অখণ্ড অধিকারী অনন্ত জীবন-ধারাতে।

তোমার বিশুদ্ধ প্রেমের ও অবিভাজ্য ঐক্যের চিরন্তন আবাসে এই জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপন করিতে হইবে অপর সকল ক্ষেত্রস্থ দিব্য জগতের—একেবারে জড়তম ক্ষেত্র অবধি, যেখানে তুমি প্রতি

পরমাণুর তথা কেন্দ্রীয় সত্তা। পরে পরে এই সমস্ত দিব্য জগৎকে এক সর্ব্বোত্তম চেতনার বন্ধনে বাঁধা, এই একমাত্র উপায় তোমার মধ্যে অটল হইয়া অবিরাম বাস করিবার, এবং তুমি সমগ্র সত্তাকে তাহার চেতনার সর্ব্বাবস্থাতে, তাহার ক্রিয়ার সকল ধারাতে যে কর্ম্মের ভার দিয়াছ তাহা পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করিবার।

*   *   *

June 9, 1914.

O Lord I am before Thee as an offering ablaze with the burning fire of divine Union...

And that which is thus before Thee, is all the stones of this house and all that it contains, all those who cross its threshold and all these who see it, all those who are connected with it in one way or another, and by close degrees, the whole earth.

From this centre, this burning nucleus which is and will be more and more penetrated with Thy light and love, Thy forces will radiate over the whole earth, visibly and invisibly, in the hearts of men and in their thoughts.

Such is the certitude Thou givest me in reply to my aspiration for Thee.

An immense wave of love descends upon everything and penetrates all.

Peace, peace on all earth, victory, plenitude, marvel.

O beloved children, sorrowful and ignorant, and thou, O rebellious and violent Nature, open your hearts, tranquillise your force, it is the omnipotence of Love that is coming to you, it is the pure radiance of the light that is penetrating you. This human, this earthly hour is the most beautiful among all the hours. Let each, let all know it and enjoy the plenitude that is accorded.

O saddened hearts and anxious foreheads, foolish obscurity and ignorant ill-will, let your anguish be calmed and effaced.

This is the splendour of the new word that comes:

"*I am here*"

বঙ্গানুবাদ :—প্রভু আমি তোমার সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি দিব্য-মিলনের জ্বলন্ত বহ্নিতে প্রদীপ্ত আহুতির মত…

এবং এইরূপে তোমার সম্মুখে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এই গৃহের সমস্ত পাথর, যে-কেহ ইহা দেখিতেছে, যে-কেহ কোন না কোন প্রকারে ইহার সহিত সম্বন্ধ, ক্রমে ক্রমে সারা পৃথিবী।

এই কেন্দ্র, এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড যাহা তোমার দীপ্তিতে ও তোমার প্রেমে পূর্ণ, যাহা ক্রমশঃ আরও সম্যকভাবে পূর্ণ হইবে, ইহার মধ্য

হইতে তোমার শক্তিরাজি সারা পৃথিবীময় বিকীর্ণ হইবে, দৃশ্য ও অদৃশ্য-রূপে, মানুষের হৃদয়ে ও ভাবনাতে···

তোমার অভিমুখী আমার যে আস্পৃহা তাহার প্রত্যুত্তরে তুমি আমাকে এই ধ্রুব আশ্বাস দিতেছ। এক বিশাল প্রেমতরঙ্গ সব কিছুর উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং সব কিছুর ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে।

শান্তি, সারা জগতে শান্তি, বিজয়শ্রী, সমৃদ্ধি, বিস্ময়।

হে, তোমরা আমার প্রিয় সন্তানমণ্ডলী, দুঃখক্লিষ্ট ও জ্ঞানহীন, হে বিশ্বপ্রকৃতি, বিদ্রোহী ও বিক্ষুব্ধ, তোমাদের হৃদয় উন্মুক্ত কর, তেজ সংযত কর, এই দেখ প্রেমের সর্ব্বজয়ী শক্তি আসিয়াছে, আলোকের বিশুদ্ধ কিরণাবলী তোমাদের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। মানুষের এই মুহূর্ত্ত, পৃথিবীর এই মুহূর্ত্ত, সকল মুহূর্ত্তের মধ্যে সুন্দর, সবাই প্রত্যেকে তাহার সন্ধান করুক, তাহার প্রদত্ত প্রাচুর্য্য উপভোগ করুক।

হে ব্যথা পীড়িত হৃদয়, হে ভাবনাকুঞ্চিত ললাট, হে বুদ্ধিবিহীন তমিস্রা, হে জ্ঞানশূন্য বিদ্বেষ, তোমাদের যাতনা প্রশমিত হউক, বিদূরিত হউক।

ঐ শুন নবীন দিব্যবাণীর বিরাট আশ্বাস :

"এই দেখ আমি আসিয়াছি।"

Sept. 30, 1914.

Our Divine Mother is with us and has promised us identification with the supreme and total Consciousness, from the unfathomable depths to the most external world of sense. And in all these domains Agni assures us of the co-operation of his purifying flame, destroying

the obstacles, kindling the energies, stimulating the wi l, so that the realisation may be hastened. Indra is with us to perfect the illumination our knowledge, and the divine Soma has transformed us into his infinite, sovereign, marvellous love, that begets the supreme beatitudes.

বঙ্গানুবাদ :—আমাদের দিব্য জননী আমাদের সাথে সাথেই আছেন এবং আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন সর্ব্বব্যাপী পরম চৈতন্যের সহিত অখণ্ড অভেদের, অগাধ আন্তর গভীরতা হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্যতম জগৎ অবধি। আর এই সমস্ত ক্ষেত্রেই অগ্নি আমা-দিগকে তাঁহার পাবক শিখার সহায়তার ভরসা দিয়াছেন ; যাহাতে বাধাসমূহকে নাশ করিয়া, শক্তিচয়কে প্রজ্বলিত করিয়া, সংকল্প-রাজিকে উদ্দীপ্ত করিয়া ভাগবত সিদ্ধি ত্বরায় আসিতে পারে। ইন্দ্র আমাদের সাথে সাথে আছেন, আমাদের জ্ঞানের মধ্যে দীপ্তির পূর্ণতা আনিবার জন্য ; এবং দিব্য সোম আমাদিগকে তাঁহার পরমানন্দদায়ী, সর্ব্বজয়ী, অপূর্ব্ব প্রেমে রূপান্তরিত করিয়াছেন।

* * *

এইভাবে, সাধনার প্রথম হইতেই আমরা দেখিতে পাই মার ভগবদা-কাঙ্ক্ষায়, ধ্যানে, জ্ঞানে, প্রেমে, সমাধিতে মিলন, নিরবচ্ছিন্ন মিলন হইয়াছিল। তবুও মা যেন কি অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সাধনায় ছিলেন কি প্রকারে "dans les détails" in details of life অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে; প্রতিটি কর্ম্মে ও প্রতিটি মুহূর্ত্তে, পরিপূর্ণ শ্রীভগবানকে পরিপূর্ণভাবে মহাপ্রকাশ করিবার সাধনায়। মা যে সত্যদ্রষ্টা ও ভগবদুপলব্ধি সম্পন্ন খুব উচ্চশ্রেণীর সাধিকা, তাহার প্রমাণ Prayers and Meditations of the Mother পুস্তকের প্রথম

হইতেই প্রত্যেক পাতায় পাতায় রহিয়াছে এবং এই শ্রেণীর উপলব্ধি, বিভিন্ন জগতের চেতনার বিভিন্ন স্তরের পূর্ণাঙ্গ অনুভূতি, আধ্যাত্মিক জগতে, আধ্যাত্মিক অনুভূতি, উপলব্ধির ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু আমি শ্রীমাকে দেখিতেছি আমাদের পরমপূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব শ্রীমদ্ ভারত ব্রহ্মচারীবাবার দিব্যদৃষ্টি ও সত্যোপলব্ধি ও ও ভবিষ্যৎ বাণীদ্বারা। তিনি যে শ্রীশ্রীজগন্মাতার মহাবির্ভাব ও ও মহাপ্রকাশের কথা আমাদিগকে বার বার বলিয়াছেন, এমন কি পর্য্যটনে পাঠাইবার সময় আমাকে বলিয়াছিলেন, যে তত্ত্ব তিনি জানিয়াছেন অন্য কোন মহাপুরুষ তাহা অবগত আছেন কি না তাহা অনুসন্ধান করিতে। এই তত্ত্বটি ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার পত্রে (ব্রহ্মচারীবাবার জীবনী ও পত্রাবলী ৮১।৮২ পৃষ্ঠা) নিজেই লিখিয়াছেন। তত্ত্বটি মোটামুটি এই ব্রহ্মচারীবাবার সিদ্ধিলাভের পর তাঁহার অভীষ্টদেবী সিংহবাহিনী মা উমা তাঁহাকে জানাইয়া ছিলেন যে জগতের মহামঙ্গলোদ্দেশ্যে এবং পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত দেবদেবী সমভিব্যাহারে পৃথিবীতে আবির্ভুতা হইয়াছেন; এবং আরও জানাইয়াছেন যে ইউরোপের শক্তিহ্রাস করিবার জন্য মহাসমরের সংঘটন করিবেন; পরে ভারত স্বাধীন করিয়া পৃথিবীতে সত্যধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া ভারতে দেবতা-মানবে অপূর্ব্ব লীলা করিবেন। এই সমস্তই বাংলা ১৩১৬ সালের ইংরাজী ১৯১০ সনের পূর্ব্বে ব্রহ্মচারীবাবার সাধনাবস্থার ঘটনা। ব্রহ্মচারীবাবা আমাকে বলিয়াছেন (১৯২০-১৯২১) "মা ইউরোপের যুদ্ধ সমাধা করিয়া ভারতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। মা শরীর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন শরীর এবং কোথায় তাহা এখনও মা আমাকে বলিতেছেন না, তবে শীঘ্রই মার মহাপ্রকাশ হইবে, তখন আমি মাকে জানিতে পারিব এবং এবার অনেকেই মাকে জানিতে পারিবেন।" এইজন্যে তিনি বহুবৎসর

অপেক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু মার মহাপ্রকাশ না হইতেই এমন কি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার বহু পূর্ব্বেই তিনি নানাকারণে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীবাবা বলিতেন যে শরীর ছাড়িয়া দিলে—সূক্ষ্মশরীরে মার কাজ আরও বেশী করিতে পারিবেন। ব্রহ্মচারীবাবার দেহরক্ষার পর তাঁহার এই সমস্ত vision and voices-কে দুর্জ্ঞেয় mysticism বলিয়া বাদই দিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে শ্রীমার Prayers and Meditations-এর বঙ্গানুবাদ লিখিয়া সত্যদ্রষ্টা, প্রেমময় শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবা পরিদৃষ্ট শ্রীশ্রীজগন্মাতার মহাবির্ভাব শ্রীমা মীরার মধ্যে পরিষ্কার নির্দ্দেশ পাই না কি ?

ব্রহ্মচারীবাবার উপরোক্ত visions and voices এখানে শ্রীমার Prayers and Meditations-এর বাণীর সঙ্গে মিলিয়া যায় —ইহা শ্রীঅরবিন্দকে লিখিয়া জানাইলাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে এই শ্রীমা মীরার সঙ্গে ব্রহ্মচারীবাবার অভীষ্টদেবী শ্রীশ্রীজগন্মাতার কোন সম্বন্ধ আছে কি না ? এবং এই শ্রীমা মীরা কে ?

যদিও শ্রীঅরবিন্দ তখন আশ্রমবাসী সাধক ও সাধিকাগণের প্রায় শতাধিক পত্র রোজ রাত্রে পড়িতেন ও উত্তর দিতেন কিন্তু আমার এই পত্রখানির উত্তর পাইলাম না। আমি নূতন লোক, শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে উত্তর না পাইলেও তাহার জন্য পীড়াপীড়ি করিবার সাহস নাই। অর্দ্ধেকের উপর বঙ্গানুবাদ হইয়া গিয়াছে, অনুবাদ লিখিয়াই যাইতেছি এবং শেষের দিকে আসিয়াছি।

December 8, 1916

Such was our conversation this morning, O Lord:

Thou hast made the vital being awake with the magic wand of Thy impulsion and Thou saidst to it: "Awake, bend the bow of thy will, for the hour of action will soon come." Suddenly awakened, the vital being rose, stretched itself and shook off the dust of its long torpor; it perceived from the elasticity of its members that it was still vigorous and fit to act. And it was with an ardent faith that it replied to the sovereign call: "Here am I, what demandest Thou of me, O Lord?" But before another word could be uttered, the mind intervened in its turn, and after bowing down before the Master in token of obedience, thus spoke to him: "Thou knowest, O Lord, that I am surrendered to Thee, and that I try my best to be a faithful and pure intermediary of Thy supreme Will. But when I turn my look towards the earth, I see that man's field of action, however large it may be, is always terribly restricted. A man, who, in his mind and even in his vital being, is vast like the universe, or at least like the earth, as soon as he begins to act, is shut up within the narrow limits of a material action, very bounded in its field and results. Whether he is the founder of a religion or the

author of a political transformation, the man of action becomes a petty, little stone in a general edifice, a grain of sand in the immense dune of human activities. I cannot see any realisable action which is of so great a worth that the whole being should concentrate upon it and make of it its reason of existence. The vital being delights in the adventure: but must it be allowed to throw itself into some lamentable adventure, unworthy of an instrument conscious of Thy Presence? "Fear nothing," was the reply. "The vital being will not be allowed to set itself in motion, thou will not be asked to bring in all the effort of thy organising faculties except when the proposed action will be vast and complex enough for all the qualities of the being to be fully and usefully employed. What this action will be exactly, thou wilt know when it will come to thee. But I warn thee from now, so that thou mayst prepare thyself not to reject it. I warn thee also, as well as the vital being, that the time of a small tranquil, uniform and peaceful life will be over. There will be effort, danger, the unforeseen, insecurity, but also intensity. Thou wert made for this rôle. After having agreed for long years to forget it

completely, because the time had not come and also because thou wert not ready, *awake now to the consciousness that it is very truly thy rôle and that it was for this that thou wert created.*"

The vital being, first, awoke to the consciousness and with the enthusiasm which is natural to it exclaimed, "I am ready, O Lord, Thou canst count upon me." The mind, more feeble and timid, although as docile, added, "What Thou willest I too will. Thou knowest well, O Lord, that I belong entirely to Thee. But shall I be able to be at the height of the task, shall I have the power to organise what the vital being has the capacity to realise?" "It is to prepare thee for it that I am working at this moment; it is for this that thou art undergoing a discipline of plasticity and enrichment. Do not worry about anything: power comes with the need. It is not because, at the same time as the vital being, thou hast confined thyself to very small activities when it was useful that it should be so, in order that the things which had to be prepared might have the time to prepare themselves,—it is not that, I say, that can make thee incapable of living outside this smallness in a field of action

in keeping with thy true stature. *I have chosen thee from all eternity to be my exceptional representative upon the earth, not in an invisible and hidden way, but in a way apparent to the eyes of all men. And what thou wert created to be, thou shalt be.*"

As always, O Lord, when the voice of the depths was silent, the sublime and all-powerful benediction enveloped me fully.

And for a moment, the Master and the instrument were but one: the One without a second, the Eternal, the Infinite.[1]

বঙ্গানুবাদ :

৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৬

হে প্রভু, আজ সকাল বেলায় আমাদের এই রকম কথাবার্ত্তা হয়েছিল :—

তুমি তোমার প্রেরণারূপ যাদুর কাঠি ছুঁইয়ে আমার প্রাণসত্তাকে জাগিয়ে তুলে তাকে বলেছিলে, "জেগে ওঠ, তোমার সঙ্কল্পের ধনুকে টান দাও, কর্ম্মের মুহূর্ত্ত এল বলে।" অকস্মাৎ জাগ্রত হয়ে প্রাণসত্তা উঠে দাঁড়াল, হাত-পা ছড়িয়ে, ঝেড়ে ফেলে দিলে তার বহু-কালের আলস্যের ধুলো ; সে তখন বুঝতে পারলে যে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট হয় নেই, এখনও কার্য্যক্ষম ও শক্তিমান রয়েছে। সে জ্বলন্ত নিষ্ঠাসহ উর্দ্ধের আহ্বানে এই বলে সাড়া দিলে, "এই যে আমি—আমার কাছ থেকে কি চাও প্রভু ?" প্রাণ আর একটি শব্দ বলতে না বলতে

[1] Prayers and Meditations of the Mother, P. 252

মন এসে মাঝখানে দাঁড়াল, প্রভুর সম্মুখে ভক্তিভরে প্রণত হয়ে বললে, "তুমি ত জান, নাথ, যে আমি তোমার চরণে সমর্পিত, এবং আমি যথা-সাধ্য চেষ্টা করি তোমার পরম সঙ্কল্পের নির্ম্মল একনিষ্ঠ করণ হতে। কিন্তু যখন আমি পৃথিবীর পানে দৃষ্টি ফেরাই, তখন দেখি যে মানুষের কার্য্যক্ষেত্র যত বড়ই হোক না কেন, তা সর্ব্বদা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। যে-মানুষ তার মনে, এমন কি প্রাণ সত্তাতেও, বিশ্বের মত অন্ততঃ পৃথিবীর মত বিশাল, সে কাজ করতে আরম্ভ করলেই জড়ক্রিয়ার সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আটক পড়ে—ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও ক্রিয়ার ফলে দুইয়েতেই সঙ্কীর্ণ সীমা। ধর্ম্মস্থাপয়িতাই হোক বা রাষ্ট্রীয় সংঘটনকর্ত্তাই হোক, সে কর্ম্মী হয়ে দাঁড়ায় একটা সমগ্র ইমারতের অন্তর্গত একটি ছোট পাথরের টুকরো বা বালির পাহাড়ের মধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র বালুকা কণা। আমি এমন কোন করণীয় কাজ দেখি না যা এতটা মূল্যবান যে মানুষ তারই উপর অভিনিবিষ্ট হয়ে তাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে নেবে। প্রাণ অসম সাহসিক কাজে রত হয়ে আনন্দ পায় বটে, কিন্তু তাকে কি এমন যা-তা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেওয়া উচিত, যা তোমার দিব্য সান্নিধ্য সম্বন্ধে সজাগ মানুষের অযোগ্য?" প্রশ্নের এই জবাব এল, "প্রাণসত্তা কাজে প্রবৃত্ত হতে পাবে না, তুমিও সাধারণতঃ তোমার সংঘটনীশক্তি প্রয়োগ করতে পাবে না, পাবে শুধু যখন কল্পিত কাজ এত বিশাল ও জটিল যে সত্তার গুণাবলীর একত্র পূর্ণ সমাবেশ আবশ্যক। ঐ কাজ ঠিক কি রকম হবে, সে কথা তুমি বুঝবে যখন তা তোমার সামনে আসবে। আমি তোমাকে এখন থেকে সাবধান করে দিচ্ছি যাতে তুমি প্রস্তুত থাকতে পার তাকে প্রত্যাখ্যান না করবার জন্য। আর আমি তোমাকে ও প্রাণ সত্তাকে, দুজনকেই সতর্ক করে দিচ্ছি যে ক্ষুদ্র, একঘেয়ে, নিরাপদ, শান্ত কর্ম্মরাজির অবসান হবে। কঠিন প্রয়াস, বিপদ-আপদ, অজানা বাধা-অন্তরায়, এসব আসবে, কিন্তু

এর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে একটা তীব্র উৎসাহ। এই ভূমিকা নেবার জন্যই তোমার সৃষ্টি। সময় আসে নেই, তুমিও প্রস্তুত হও নেই, তাই দীর্ঘকাল একেবারে ভুলে থাকবার পরে এখন তোমাকে জাগ্রত হতে হবে এই চেতনাতে ; এই হল তোমার যথার্থ করণীয়, এরই জন্য তুমি সৃষ্ট হয়েছিলে।"

ঐ চেতনাতে প্রাণ জাগল প্রথমে, আর তার স্বাভাবিক উৎসাহ-সহ চেঁচিয়ে উঠল, "প্রভু, আমি তৈরী আছি, তুমি আমার উপর নির্ভর করতে পার।" মন প্রাণেরই মত আজ্ঞানুবর্ত্তী হলেও স্বভাবতঃ ভীরু ও দুর্ব্বল ; সে বললে, "তুমি যা ইচ্ছা কর, আমিও তাই ইচ্ছা করি। তুমি ভাল করেই জান, নাথ, আমি সর্ব্বদা তোমারই। কিন্তু আমি কি কার্য্যক্ষমতার উচ্চতম শিখরে উঠতে পারব, প্রাণ যা উপলব্ধি করতে পারবে আমি কি তা সংঘটিত করতে পারব ?" "তোমাকে তার জন্য তৈরী করে নেবার হেতুতেই আমি এই মুহূর্ত্তে কাজ করছি ; সেই নিমিত্তই তুমি একটা নমনীয়তা ও সমৃদ্ধিলাভের কড়া শিক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছ। তোমার কোন বিষয়ে উদ্বেগের কারণ নেই, দরকারের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি আসে। সেটা এজন্য নয় যে তুমি প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অতিক্ষুদ্র ক্রিয়াবলীতে আটকে রেখেছিলে ; সেটার তখন আবশ্যক ছিল—যেসব জিনিসকে প্রস্তুত করে নিতে হবে, তাদিকে প্রস্তুতির সময় দেবার জন্য ; আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে সেকারণে তুমি তোমার যথার্থ মহত্ত্বের যোগ্য কার্য্যক্ষেত্রে, এখনকার ক্ষুদ্রতার গণ্ডীর বাইরে, বাস করবার ক্ষমতা হারাও নেই। আমি তোমাকে অনন্তকালের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছি পৃথিবীতে আমার বিশিষ্ট প্রতিনিধি হবার জন্য, অদৃশ্য প্রচ্ছন্নভাবে নয়, সমগ্র মানবের দৃষ্টির সমক্ষে। আর তোমাকে যা হবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা তুমি হবে।"

হে নাথ, চিরদিনের ধারা অনুযায়ী যখন গভীরের স্বর নীরব হয়ে গেল, তখন একটা মহান সর্ব্বশক্তিমান আশীষ আমাকে সর্ব্বথা আচ্ছন্ন করল।

মুহূর্ত্তের জন্য কর্ত্তা ও করণ এক হয়ে গেল, অদ্বিতীয় এক, অসীম অনন্ত।

Dec. 20, 1916.
(Communication received at 5-30 in the evening after meditation.)

"As you are contemplating me, I shall speak to you this evening. I see in your heart a diamond surrounded with a golden light. It is at once pure and warm, so that it can manifest impersonal love; but why do you let this treasure lie enclosed in this sombre casket lined with an intense purple? The outermost envelope is of a deep blue which is not luminous, a veritable mantle of darkness. One would say that you were afraid of showing your splendour. Learn to radiate and do not fear the storm: the wind carries us far away from the shore but shows us the world. Is it that you would husband your tenderness? But the source of love is infinite. Are you afraid of being misunderstood? But where have you seen man able to understand

the Divine? And if the eternal truth finds in you a means to manifest, what can the rest matter to you? You are like a pilgrim coming out of a sanctuary; standing on the threshold in front of the crowd, he hesitates before revealing his precious secret, the secret of his supreme discovery. Listen, I too hesitated for days, for I could foresee both my preaching and what would be its result: the imperfection of expression and the still greater imperfection of understanding. And yet I turned towards the earth and men, and I brought to them my message. "Turn towards the earth and men", is this not the command you always hear in your heart—in your heart, for it is that which carries a blessed message for those who are athirst for compassion? Henceforth nothing can attack the diamond. It is unassailable in its perfect constitution, and the soft radiance which shoots from it can change many things in the hearts of men. You doubt your power and are afraid of your ignorance? It is precisely this that covers your power with this dark mantle of starless night. You hesitate and tremble as if on the threshold of a mystery, for, now the mystery of the manifestation appears to you as

more terrible and more unfathomable than that of the Eternal Cause. But you must take courage and obey the injunction from the depths. It is I who say it to you, for I know and love you as you knew and loved me before. I have appeared clearly before your eyes, so that you may not doubt my words in the least. And also to your eyes I have shown your heart, so that you may thus see what the supreme Truth has willed and discover in it the law of your being. The thing still appears to you very difficult; a day will come when you will wonder how the truth could seem to you other than what it is."—Shakyamuni

বঙ্গানুবাদ :

(সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময়ে ধ্যানের পরে প্রাপ্ত আদেশ)

"তুমি আমাকে যখন ধ্যান করিতেছ তখন আজ সন্ধ্যায় আমি তোমার সহিত কথা কহিব। আমি তোমার হৃদয়মধ্যে দেখিতে পাইতেছি এক খণ্ড হীরক, তাহার চারিদিকে হিরণ্ময় জ্যোতি। ইহা যেমন নির্ম্মল তেমনই উষ্ণ, অপৌরুষেয় প্রেমের অভিব্যক্তি; কিন্তু এমন রত্নকে তুমি ঘোর বেগুনী রঙ্গের আস্তরণযুক্ত আঁধার কৌটার মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছ কেন? কৌটার বাহ্যতম আচ্ছাদন নিষ্প্রভ ঘোর নীলবর্ণের যথার্থ অন্ধকারময় গাত্রাবরণ। লোকে বলিবে যে তুমি তোমার ঐশ্বর্য্য মানুষকে দেখাইতে ভয় পাইতেছ। আলোক বিকিরণ করিতে শেখ, ঝড়-তুফানকে ভয় পাইও না; বাতাস আমাদিগকে কিনারা হইতে দূরে টানিয়া লইয়া যায় বটে, কিন্তু সেই আমাদিগকে জগৎ দেখায়। প্রেমের সম্বন্ধে

কৃপণ হইবে? কিন্তু প্রেমের উৎস অসীম। তোমাকে মানুষে বুঝিবে না, এই ভয় কর? কিন্তু কবে তুমি দেখিলে যে মানুষ ভগবানকে বুঝিতে পারিয়াছে? আর যদি শাশ্বত সত্য তোমার ভিতরে আত্মপ্রকাশের উপায় পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আর কিছুতে তোমার কি আসে যায়? তুমি সেই যাত্রীর মত যে মন্দির হইতে বাহিরে আসিতে আসিতে দ্বারদেশে জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার অমূল্য গূঢ় রহস্য তাহার সর্ব্বোত্তম আবিষ্কারের তত্ত্ব জনসমক্ষে প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করে। শুন আমিও বহুদিন ধরিয়া ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম, কেননা আমি দেখিতে পাইতেছিলাম আমার উপদেশ-বচন তথা তাহার ভাবী পরিণাম; অভিব্যক্তির অপূর্ণতা, এবং ততোধিক অপূর্ণতা বোধশক্তির। তথাপি আমি পৃথিবীর পানে তথা মানবের পানে মুখ ফিরাইয়া আমার বাণী শুনাইয়াছি। "জগতের পানে মানুষের পানে ফিরিয়া চাও," এই আদেশ কি তুমি সর্ব্বদা তোমার অন্তরে শুনিতেছ না; তোমার হৃদয়ের মধ্যে, কেননা হৃদয়ই পুণ্যবাণী বহন করে তাহাদের জন্য যাহারা অনুকম্পার পিয়াসী। এখন হইতে আর কেহ হীরকের উপর হানা দিতে পারিবে না। তাহার নিখুঁত গঠনের কারণে তাহার উপর আক্রমণ সম্ভবপর নয়, তাহার অঙ্গ হইতে যে স্নিগ্ধ জ্যোতি বাহির হইতেছে তাহা মানুষের হৃদয় মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে। তুমি তোমার শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান, তোমার অজ্ঞানের জন্য তুমি ভীত? এই বস্তুই তোমার শক্তিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে তারকাবিহীন রাত্রির অন্ধকার আচ্ছাদনে। একটা রহস্যের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইয়া তুমি ইতস্ততঃ করিতেছ এবং কাঁপিতেছ, কেননা এখন এই সৃষ্টির রহস্য তোমার কাছে বেশী ভয়াবহ ও বেশী গভীর মনে হইতেছে শাশ্বত কারণের রহস্য অপেক্ষা। কিন্তু তোমাকে সাহসে ভর করিয়া গভীরের নির্দ্দেশ পালন করিতেই হইবে। একথা আমি তোমাকে বলিতেছি, কারণ আমি তোমাকে

চিনি ও ভালবাসি, যেমন তুমিও আমাকে চিনিতে ও ভালবাসিতে সেকালে। আমি তোমার দৃষ্টিতে সুস্পষ্টভাবে আবির্ভূত হইয়াছি এইজন্য যে তুমি তাহা হইলে আমার বাক্য সম্বন্ধে কোন রকমে সন্দিহান হইবে না। আর তোমার আপন হৃদয়কে ও তোমার চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি-গোচর করিয়াছি এইজন্য যে তুমি দেখিতে পাও পরম সত্যের কি অভিপ্রায়, তুমি তোমার হৃদয়ের মধ্যেই আবিষ্কার কর তোমার আপন জীবন-বিধান। ব্যাপারটি এখনও তোমার খুব কঠিন বোধ হইতেছে; কিন্তু একদিন আসিবে যখন তুমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করিবে যে এতদিন অন্যথা ঘটিতেছিল কিরূপে।" শাক্যমুনি

November 24, 1931.

O My Lord, my sweet Master, for the accomplishment of Thy work I have sunk down into the unfathomable depths of Matter, I have touched with my finger the horror of the falsehood and the inconscience, I have reached the seat of oblivion and a supreme obscurity! But in my heart was the Remembrance, from my heart there leaped the call which could arrive to Thee: "Lord, Lord, everywhere Thy enemies are triumphant; falsehood is the monarch of the world; life without Thee is death, a perpetual hell; doubt has usurped the place of Hope and revolt has pushed out submission; Faith is spent, Gratitude is not born; blind passions and

murderous instincts and a guilty weakness have covered and stifled Thy sweet law of love. Lord, wilt Thou permit Thy enemies to prevail, falsehood and ugliness and suffering to triumph? Lord, give the command to conquer and victory will be there. I know we are unworthy, I know the world is not yet ready. But I cry to Thee with an absolute faith in Thy Grace and I know that Thy Grace will save us."

Thus, my prayer rushed up towards Thee; and, from the depths of the abyss, I beheld Thee in Thy radiant splendour; Thou didst appear and Thou saidst to me: "Lose not courage, be firm, be confident,—I COME."*

বঙ্গানুবাদ :

হে নাথ, হে আমার দয়াল প্রভু, তোমার কর্ম্ম সাধিত করিব বলিয়া আমি জড় প্রকৃতির অতল গভীরে নিমগ্ন হইয়াছি। আমি অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়াছি নিশ্চেতনা ও অনৃতের বিভীষিকা—ঘোরতর বিভ্রম ও অন্ধকারের আবাস। কিন্তু আমার অন্তরে নিহিত ছিল যে পরম স্মৃতি, তাহার মধ্য হইতে এই প্রার্থনা উত্থিত হইয়া তোমার চরণে গিয়া পৌঁছিল: "প্রভু, প্রভু, মনে হইতেছে যেন তোমার শত্রুবৃন্দ সর্ব্বত্র বিজয়ী হইতেছে; অসত্য হইয়াছে জগতের অধীশ্বর; তোমাকে ছাড়িয়া যে জীবন তাহা মরণ তুল্য, নিরন্তর নরকে বাস: আজ সংশয় অধিকার করিয়াছে আশার স্থান, বিদ্রোহ দখল করিয়াছে

* Prayers and Meditations of the Mother.

সমর্পণের আসন; জীবনে নিষ্ঠা শুকাইয়া গিয়াছে, কৃতজ্ঞতার জন্ম হয় নাই; অন্ধ রিপুগণের তাড়না, নরহত্যার প্রেরণা, দোষাবহ দুর্ব্বলতা, তোমার মধুর প্রেমের বিধানকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, তাহার শ্বাসরোধ করিতেছে। প্রভু, তুমি কি তোমার অরাতিচয়কে—অসত্য, কদর্য্যতা ও দুঃখভোগকে—জয়শ্রীমণ্ডিত হইতে দিবে? হে নাথ, তুমি একবার বিজয়ের আদেশ দিলেই বিজয় আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমি জানি যে আমরা অযোগ্য। আমি জানি যে জগৎ এখনও প্রস্তুত নয়। কিন্তু আমি তোমার কৃপাতে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া তোমাকে সকাতরে ডাকিতেছি, আমি জানি যে তোমার অনুকম্পা আমাদিগকে বাঁচাইবে।"

এইভাবে আমার প্রার্থনা ব্যাকুল হইয়া তোমার পানে ছুটিল এবং গহ্বরের গভীরে আমি দেখিতে পাইলাম তোমাকে তোমার ভাস্বর মহিমাতে; তুমি আবির্ভূত হইলে এবং বলিলে, "সাহস হারাইবে না, ভরসা ছাড়িবে না, অটল রহিবে— আমি আসিতেছি।"

শ্রীমার একটি চিঠি

When and how did I become conscious of a mission which I was to fulfil on earth and how I met A.G.? (Aurobindo Ghose)

These are questions you asked me and I promised a short reply.

For the knowledge of the mission it is difficult to say when it came to me. It was as though I was born with it and, following the growth of the mind and brain, the precision and completeness of this consciousness grew also.

Between 11 and 13 a series of psychic and spiritual experiences revealed to me not only the existence of God, but man's possibility of uniting with Him, of revealing Him integrally in consciousness and action, of manifesting Him upon earth in a life Divine. This, along with a practical discipline for its fulfilment, was given to me, during my body's sleep, by several teachers, some of whom I met afterwards on the physical plane. Later on, as the interior and exterior development proceeded, the spiritual and psychic relation with one of these Beings became more and more clear and pregnant; and although I knew little of the Indian philosophies and religions at that time, I was led to call him Krishna, and henceforth I was aware that it was with him (whom I knew I should meet on earth one day) that the Divine work has to be done.

In the year 1910 my husband came alone to Pondicherry, where under very interesting and peculiar circumstances, he made acquaintance with A.G. . . . . Since then we both strongly wished to return to India—the country which I always cherished as my true mother-country—and in 1914 this joy was granted to me.

As soon as I saw A.G., I recognised in him the well-known being whom I used to call Krishna....and this is enough to explain why I am fully convinced that my place and work are near him in India.

July—1920. Mira Richard

বঙ্গানুবাদ :

আমি কখন, কিরূপে, প্রথম বুঝিতে পারি যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য আমি জগতে প্রেরিত হইয়াছি? কিরূপে অরবিন্দ ঘোষের (A. G.) সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে?

তুমি আমাকে এই দুইটি প্রশ্ন করিয়াছিলে, এবং আমি সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিব বলিয়াছিলাম।

আমি আমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রথম কখন্ জানিতে পারি তাহা বলা কঠিন। এই জ্ঞান যেন আমার জন্মাবধিই ছিল, মন ও মস্তিষ্কের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার চেতনা সুষ্ঠুতর পূর্ণতর হইতেছিল।

আমার একাদশ হইতে ত্রয়োদশ বৎসর বয়সের মধ্যে একটার পর একটা বহু চৈত্য ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি আমার কাছে শুধু যে ভগবানের অস্তিত্ব প্রকট করিয়াছিল তাহা নহে, উপরন্তু আমি উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে ভগবানের সাথে মানুষের মিলন, চেতনাতে ও কর্ম্মে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি, এই পৃথিবীতে দিব্য জীবনে তাঁহার প্রকাশ, এ সকলই সম্ভবপর। এই সব সম্ভাবনা এবং ইহাদের উপলব্ধির জন্য কার্য্যতঃ যে তপশ্চর্য্যার প্রয়োজন তাহার শিক্ষা আমি আমার শারীর সুষুপ্তির সময়ে নানা শিক্ষকের নিকট পাইয়াছিলাম, যাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সাথে পরবর্ত্তী কালে এই জড়ভূমিতেই আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল। পরে আন্তর ও বাহ্য পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ একটি

সত্তার সহিত আমার চৈত্য ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্পষ্টতর ও অধিক ফলপ্রদ হইতে লাগিল ; এবং যদিচ তৎকালে আমি ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের বিষয়ে খুব কমই জানিতাম তথাপি এই সত্তাকে আমি কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে শিখিলাম, এবং তখন হইতে জানিলাম যে ইঁহারই সঙ্গে আমাকে দিব্য কর্ম্ম করিতে হইবে, এবং ইঁহার সহিত এই পৃথিবীতেই আমার সাক্ষাৎকার ঘটিবে।

১৯১০ সালে আমার স্বামী একা পণ্ডিচেরীতে আসিলেন এবং অতীব অসাধারণ ও অপূর্ব্ব পরিস্থিতিতে A. G.-র সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিল .... তখন হইতে আমরা দুইজনেই ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে একান্ত উৎসুক হইলাম—যে ভারতকে আমি আমার যথার্থ মাতৃভূমি বলিয়া সর্ব্বদা ভালবাসিতাম ; ১৯১৪ সালে আমার এই আনন্দলাভের সৌভাগ্য ঘটিল।

A. G.কে দেখিবামাত্র আমি চিনিতে পারিলাম সেই সুপরিচিত ব্যক্তি বলিয়া যাঁহাকে আমি কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতাম ; কেন আমার মনে একটুও সন্দেহ নাই যে ভারতবর্ষে তাঁহারই পাশে আমার বাসস্থান ও কর্ম্মভূমি, একথা বোঝা সহজ।*

জুলাই, ১৯২০ মীরা রিশার

The Mother not only governs all from above but she descends into this lesser triple universe. Impersonally, all things here, even the movements of the Ignorance, are herself in veiled power and her creations in diminished substance, her Nature-body and Nature-force, and they exist because, moved by the mysterious fiat of

* প্রবর্ত্তক হইতে উদ্ধৃত

the Supreme to work out something that was there in the possibilities of the Infinite, she has consented to the great sacrifice and has put on like a mask the soul and forms of the Ignorance. But personally too she has stooped to descend here into the Darkness that she may lead it to the Light, into the Falsehood and Error that she may convert it to the Truth, into this Death that she may turn it to godlike Life, into this World-pain and its obstinate sorrow and suffering that she may end it in the transforming ecstasy of her sublime Ananda. In her deep and great love for her children she has consented to put on herself the cloak of this obscurity, condescended to bear the attacks and torturing influences of the powers of the Darkness and the Falsehood, borne to pass through the portals of the birth that is a death, taken upon herself the pangs and sorrows and sufferings of the creation, since it seemed that thus alone could it be lifted to the Light and Joy and Truth and eternal Life. This is the great sacrifice called sometimes the sacrifice of the Purusha, but much more deeply the holocaust of Prakriti, the sacrifice of the Divine Mother.

বঙ্গানুবাদ :

মা কেবল উপর হতেই বিশ্বের শাসন করেন না, আবার তিনি এই ত্রিধাভিন্ন নিম্নতর জগতেরও মধ্যে নেমে আসেন। তাঁর নির্ব্বিশেষ সত্তার দিক দিয়ে, এখানকার যাবতীয় জিনিস, অজ্ঞানের সব বৃত্তি পর্য্যন্ত, তিনিই—তিনি, তবে তাঁর শক্তি অবগুণ্ঠিত ; সকলে তাঁরই সৃষ্টি—তবে, সে-সৃষ্টি লঘুতর পদার্থ নিয়ে ; সকলে মিলে তাঁর প্রকৃতি-দেহ ও প্রকৃতি-শক্তি। তারা সব রয়েছে,—কারণ পরমেশ্বরের এক দুর্জ্ঞেয় অনুজ্ঞা তাঁকে প্রচলিত করেছে অন্তরেরই মধ্যে নিহিত যত সম্ভাবনা তাদের একটি ধারা কর্ম্মায়িত করে তোলবার জন্য, এবং সেই উদ্দেশ্যে এই মহাযজ্ঞে তিনি আত্মবলি দিতে সম্মত হয়েছেন, অজ্ঞানের রূপ ও স্বরূপ অবধি নিজের উপর আরোপ ক'রে নিয়েছেন। তাছাড়া, যেদিকে তাঁর ব্যক্তিগত বিশেষ-সত্তা সেদিক দিয়েও, তিনি করুণা-প্রণোদিত হয়ে নেমে এসেছেন এখানে এই অজ্ঞানের মধ্যে, যাতে অজ্ঞানকে জ্যোতির দিকে নিয়ে যেতে পারেন ; এসেছেন এই মিথ্যা ও প্রমাদের মধ্যে যাতে মিথ্যা ও প্রমাদকে সত্যে পরিণত করতে পারেন ; এসেছেন এই মৃত্যুর মধ্যে যাতে মৃত্যুকে রূপান্তরিত করতে পারেন দেবোচিত জীবনে ; এসেছেন এই বিশ্ববেদনার আর তার দুরপনেয় দুঃখের ও যন্ত্রণার মধ্যে যাতে তাঁর পরম আনন্দের রূপান্তরকারী আবেগে সে বেদনা যন্ত্রণার অবসান করতে পারেন। সন্তানের উপর গভীর বিপুল স্নেহবশতই এই তমসার আবরণ-খানি নিজের উপর টেনে দিতে সম্মত হয়েছেন। অজ্ঞানের অনৃতের শক্তিরাজির আক্রমণ, তাদের প্রভাবের উৎপীড়ন সব কৃপা ক'রে সহ্য করতে স্বীকৃত হয়েছেন, মৃত্যুরই অন্যরূপ যে জন্ম সেই তোরণটি পার হয়ে চ'লে এসেছেন, সৃষ্টির যত দুঃখ-বেদনা যন্ত্রণা নিজের উপরে গ্রহণ করেছেন—কারণ, তিনি হয়ত দেখেছিলেন একমাত্র এই পন্থায় সে সৃষ্টিকে জ্যোতির আনন্দের সত্যের অনন্ত জীবনের মধ্যে উন্নীত করা

যেতে পারে। এই যে বিপুল আত্মবলি, এরই সময়ে সময়ে নাম দেওয়া হয় পুরুষযজ্ঞ—কিন্তু গভীরতর অর্থে একে বলা যায় প্রকৃতির যজ্ঞ, ভাগবতী মায়ের নিঃশেষ আত্মবলি! *

শ্রীমার Prayers and Meditations এর বঙ্গানুবাদ লিখা শেষ হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি Prayers-এর ইংরাজী অনুবাদসহ বঙ্গানুবাদ উপরে দিয়াছি। তাহাতে আমার আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না যে এই সমুদ্রতীরে, পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের প্রেমময়ী শান্তিময়ী শ্রীমা মীরাই আমাদের প্রেমময় শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবা-কথিত শ্রীশ্রীজগন্মাতা, যাঁহার মহাবির্ভাব হইয়াছে জগতের মহামঙ্গলোদ্দেশ্যে ভারতকে স্বাধীন করিয়া পৃথিবীতে সত্যধর্ম্ম ও শান্তি স্থাপন করিয়া ভারতে দেব-মানবের অপূর্ব্ব লীলা প্রকাশের জন্য।

এইসব উল্লেখ করিয়া, আবার শ্রীঅরবিন্দকে একখানি বিস্তৃত চিঠি লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আমার শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবা-কথিত শ্রীশ্রীজগন্মাতা এবং আমাদের শ্রীমা মীরা, একই ভাগবত সত্তা কি না? ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি ব্রহ্মচারীবাবা আমাদিগকে ভারতের তীর্থ-পর্য্যটনে পাঠাইবার সময় বিশেষভাবে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে তত্ত্ব অবগত আছেন, তাহা অন্য কোন মহাপুরুষও অবগত আছেন কিনা, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে। আমি প্রায় সারা ভারতবর্ষ এবং প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এ-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এমন কোন মহাপুরুষ পাই নাই। আজ আমি আমার পূজ্যপাদ প্রেমময় শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবার নামে, আপনাকে সম্পূর্ণ ভক্তি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের এই শ্রীমা মীরা কে? আপনার পূর্ণযোগে

* মা—শ্রীঅরবিন্দ, ৪৪-৪৭ পৃষ্ঠা। অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

ও দিব্যরূপান্তরের সাধনায় এমনকি আশ্রমের সর্ব্ববিষয়ে, সকল কার্য্যে ভগবতী শ্রীমা মীরাই সর্ব্বপ্রধান ও মূলকেন্দ্র দেখিতেছি।

ব্রহ্মচারীবাবা আমাকে বলিয়াছেন, "মা ইউরোপের যুদ্ধ সমাধা করিয়া ভারতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। মা শরীর গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কোন্ শরীর এবং কোথায় আছেন তাহা মা আমাকে এখনও বলিতেছেন না, তবে শীঘ্রই মার মহাপ্রকাশ হইবে, তখন আমি মাকে জানিতে পারিব, এবং এবার অনেকেই মাকে জানিতে পারিবেন।" অতএব ব্রহ্মচারীবাবার সত্যদৃষ্টি এবং অধুনা শ্রীমার নিজেরই বাণী ও প্রার্থনাদি হইতে এবং আপনার The Mother হইতে পরিষ্কার সন্ধান পাইতেছি, তাহাতে এই প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্য আমার মন প্রাণ একান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন এই মহাপ্রেমময়ী, মহাশান্তিময়ী শ্রীমা মীরা কে ? তাহা হইলে ধন্য ও কৃতকৃত্য হইব। আপনাকে ও শ্রীমাকে দেখিয়া, মানবজাতি ও মানব সমাজের জন্য আপনাদের সুদীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধনা—অতিমানস মহাশক্তির মহাপ্রকাশে মানবজাতির দিব্য-চেতনা ও দিব্যজীবনে রূপান্তরে পৃথিবীতে অতিমানব জাতির প্রতিষ্ঠা—এই সুমহান্ লক্ষ্য ও দিব্য আশার বাণী শুনিয়া এখন আমার করুণাময় শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবার দিব্যদৃষ্টির কথাই মনে হইতেছে। ব্রহ্মচারীবাবা বলিতেন, "শরীর ছাড়িয়া দিলে আমি মার কাজ আরও বেশী করিতে পারিব।" সূক্ষ্মদেহে ব্রহ্মচারীবাবা মার কাছে আছেন কি ? এই তত্ত্বের যথার্থ উত্তর না পাইলে হয়ত আমার এখানে থাকাই হইবে না।

এবার মহাশান্ত ও করুণাময় শ্রীঅরবিন্দ উত্তর দিলেন :

Yogananda,

Have you a photograph of your former

Guru? If there is one, the Mother would like to see it.

May 1933 Sri Aurobindo

বঙ্গানুবাদ :

যোগানন্দ, তোমার কাছে কি তোমার পূর্ব্বতন গুরুদেবের আলোক-চিত্র আছে? যদি থাকে ত মা তাহা দেখিতে চান।

মে, ১৯৩৩ শ্রীঅরবিন্দ

এবার দক্ষিণ ভারত পর্য্যটনে আসিবার সময় আমার সঙ্গে গুরুদেবের কোন ফটো ছিল না, তাই শ্রীমাকে ফটো তখনই দেখাইতে পারিলাম না। বাংলাতে আমার গুরুভাইগণের নিকট অনেকের কাছে লিখিলাম গুরুদেবের একখানি ফটো ডাকে পাঠাইতে, খরচের জন্য ডাক-টিকিটও পাঠাইয়াছিলাম—কিন্তু সাম্প্রদায়িক কুসংস্কারের জন্য কেহ পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দিলেন না। আমি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে থাকি বলিয়া আমাকে হয়ত গুরুত্যাগী মনে করিয়া আমার সহিত সংস্রব রাখিতে চাহেন না। প্রায় এক বৎসর পরে শ্রীঅরবিন্দকে আবার লিখিলাম যে গুরুদেবের ফটো আমি কিছুতেই পাইতেছি না।

শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন :

Yogananda,

What you wanted to know was about your Guru being here or not or being one of those in contact with the Mother? For that the photo was necessary as it is by the appearance not the name that the Mother identifies those who

came here to her—as she did from the photo of his Guru (Lokanath Brahmachari).

Sri Aurobindo

বঙ্গানুবাদ :

যোগানন্দ, তুমি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলে তাহা এই যে, তোমার গুরুদেব এখানে ছিলেন কি না এবং মায়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন কি না ? সেইজন্য ফটোর প্রয়োজন ছিল ; কেন না যাঁহারা এখানে মায়ের কাছে আসেন, মা তাঁহাদিগকে পরে চিনিতে পারেন চেহারা দেখিয়া, নাম শুনিয়া নয়—যেমন তিনি চিনিয়াছিলেন তাঁহার পরমগুরু লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে ফটো হইতে।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবার ফটো পাওয়ার যখন কোন আশাই রহিল না—গুরুভাইগণ কোন উত্তর পর্য্যন্ত দেন না তখন শ্রীমাকেই জোর করিয়া লিখিলাম, "মা, তুমি ইচ্ছা করিলে কি আর ফটো আসে না ! আমার গুরুভাইগণ আমাকে গুরুত্যাগী বলিয়া ভুল করিয়া আমার কোন পত্রের উত্তর দেন না।" মাকে এইরূপ লিখার কিছুদিন পরই একদিন স্বপ্নে দেখিলাম যে পোষ্ট অফিস হইতে আমি ফটো পাইয়াছি। খুবই আশ্চর্য্য এই যে স্বপ্ন দেখিবার পরদিনই ডাকে ফটো পাইলাম। আমার গুরুভাই ইন্দুভূষণ ফটো পাঠাইয়াছেন। পরে যখন তিনি এখানে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে আমার লেখা চিঠি আশ্রমে কেহ খোলেনেই নাই—গুরুত্যাগীর চিঠি পড়াও পাপ। তিনিও তখন ইহা খুলিয়া পড়েন নাই, তাঁহার ঝোলায় কয়েকমাস পড়িয়াছিল। এখানে যখন আমি মাকে খুব জোর করিয়া ধরিয়াছিলাম, "মা, তুমি ইচ্ছা করিলে

কি ফটো আসে না ?'' ইন্দুভূষণ তখন সিলেটে ছিলেন। কেন যেন তাহার মনে হইল, ''চিঠি খুলিয়া পড়ি।'' শ্রীমা ও শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাহার ইচ্ছা হইল আমাকে ফটো পাঠাইতে, তজ্জন্য নানাস্থানে খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে ব্রহ্মচারীবাবার এক পরমভক্তের বাড়ীতে তাঁহার আসনে একখানি অতিরিক্ত ফটো ছিল সেইটি লইয়া আমাকে পাঠাইলেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়, তখন আমার মনে হইল যে, বহুদিন পূর্ব্বে আমিই উক্ত ভক্ত স্বর্গীয় উপেন্দ্র ঠাকুরদার আসনে শ্রীগুরুদেবের এই ফটোখানি রাখিয়াছিলাম পরে লইব বলিয়া, আর লওয়া হয় নাই। তারপর কথাটা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এইরূপে অভাবনীয়রূপে শ্রীগুরুদেবের ফটো পাইয়া শ্রীমাকে তাহা দিলাম। এজন্য আমি ইন্দুভূষণের নিকট চিরঋণী থাকিব। গুরুদেবের ফটো দেখিয়া শ্রীমা যাহা বলিলেন, তাহা শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখিয়া জানাইলেন—

Yogananda,

The Mother saw with interest the photograph of your Gurudev, she had seen Lokanath Brahmachari very often, but your Gurudev has always been near her for many years, long before you came, probably before his death even. When she saw the photograph a wonderful light appeared through it. And through his face is expressed a remarkable soul of aspiration, vision, faith and bhakti.

June 2, 1934. Sri Aurobindo

The Mother saw with interest the photograph of your Gurudev. She had seen Lokenath Brahmachari very often, but your Gurudev has always been near her for many years, long before you came, probably before his death even. When she saw this photograph a wonderful light appeared and the light which shone through his face is an expression of a remarkable soul of aspiration, wisdom, faith and bhakti.

Sri Aurobindo

'সমুদ্রতীরে' শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে শ্রীমা কে ?

বঙ্গানুবাদ :

যোগানন্দ, মা তোমার গুরুদেবের চিত্র আগ্রহের সহিত দেখিলেন, লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে তিনি অনেকবার দেখিয়াছিলেন ; কিন্তু তোমার গুরুদেব বহুবৎসর ধরিয়া মায়ের নিকটেই আছেন, তুমি এখানে আসিবার অনেকদিন আগে, হয়ত তাঁহার মৃত্যুর অনেক পূর্ব্বেই। মা যখন ঐ ছবি দেখিলেন তখন তাঁহার মধ্যে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখা দিল এবং চিত্রিত মুখমণ্ডলের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইল এক আশ্চর্য্য অভীপ্সা, দৃষ্টি, নিষ্ঠা ও ভক্তিতে পূর্ণ আত্মা।

জুন ২, ১৯৩৪ — শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার উপরোক্ত কৃপাবাণীতে আমি অতীব বিস্মিত হইলাম। আমার মৃতপ্রায় প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। মন শান্ত হইল। ব্রহ্মচারীবাবার বিশেষ কৃপা ও আশীর্ব্বাদেই তাঁহার সত্যদৃষ্ট "মা বাবার" আজ সন্ধান পাইলাম। তিনি বলিতেন যে শ্রীভগবানের নরলীলা-তেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ। ভারত স্বাধীন হইবে, পৃথিবীতে সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে ও শান্তি স্থাপিত হইবে, শ্রীমার মহাপ্রকাশ হইবে ইত্যাদি বাণী বহুপূর্ব্বে পাইয়াছিলেন। মার মহাপ্রকাশ হইলে পর তিনি মাকে জানিতে পারিবেন, এই অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু সেই মহাপ্রকাশের পূর্ব্বেই তিনি দেহরক্ষা করিলেন। তাই মনে হয়, দেহরক্ষার অনেক পূর্ব্বেই তাঁহার এই সত্যদৃষ্টির নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, "তেমন মহাপুরুষ দেখিতে পাইলে জিজ্ঞাসা করিবে।" আমার পরম সৌভাগ্য যে অজ্ঞাতসারে আমি এখানেই আসিলাম এবং তাঁহাদেরই শরণ লইলাম। এখন হইতে আমি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার চরণে সমর্পণ করিলাম। তাঁহাদের কৃপা ও শক্তিতে দিব্যচেতনা পাইয়া ও দিব্যজীবনে রূপান্তরিত হইয়া যেন তাঁহাদের

দিব্যকার্য্যের, নির্ব্যক্তিক প্রেম ও ভালবাসার অধিকারী ও আধারযন্ত্র হইতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হইবে।

ইহার পর আমি শ্রীঅরবিন্দকে লিখিয়াছিলাম যে তবে কি আমাদের গুরুদেবের সাধনা ও কর্ম্ম (Mission) ব্যর্থ হইল? বাহিরের দৃষ্টিতে তো তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমগুলির অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়! আমরা যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের চরণে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহারা তো একরকম ছত্রভঙ্গ হইয়াছেন, কেহ কেহ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পথত্যাগ করিয়াছেন। গৃহস্থ শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সাধনাকে ধরিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রের (সম্প্রদায়) আর প্রচার নাই। সবই যেন লুপ্ত ও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ উত্তর দিয়াছিলেন :

Yogananda,

Nothing true in a mission can fail—either it persists or takes another form.

*　　　*　　　*

Your Guru's teaching and that of this Yoga are essentially the same; what he called *chittasuddhi* is what we mean by the psychic change. The teaching here is more developed because it includes the Supramental means of creating a divine life. Also the getting of the truth is different, since here it is put in such a way as to initiate men of all castes, races, creeds and cultures without distinction to share in the

Truth and the Divine Life. But it is no use trying to draw those who received the earlier teaching, for their sight is still circumscribed by past forms and feelings and cannot extend itself beyond them. It is good that you have freed yourself from the desire to do so and taken an impersonal position—if any have to come they will come. *Our concentration must be on all preparing themselves so that what was foreseen by your Guru may be fulfilled this time and here.*

19-6-1935 Sri Aurobindo

বঙ্গানুবাদ :

যোগানন্দ, প্রত্যাদিষ্ট কর্ম্মের মধ্যে সত্য যাহা থাকে তাহা কখনও বৃথা যাইতে পারে না—হয় তাহা কার্য্য করিয়াই চলে, নয়ত রূপান্তর গ্রহণ করে।

* * *

তোমার গুরুদেবের শিক্ষা এবং আমাদের এই যোগের শিক্ষা মূলতঃ এক ; তিনি যাহাকে চিত্তশুদ্ধি বলিয়াছিলেন আমরা চৈত্যরূপান্তর বলিলে তাহাকেই বুঝি। এখানকার শিক্ষা আরও পরিণত, কেন না দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠার যে অতিমানস পন্থা তাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত। তেমনই সত্যোপলব্ধির প্রণালীও এখানে অন্যরূপ, কারণ তাহা এমন ভাবে রচিত হইয়াছে যে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-সংস্কৃতি নির্ব্বিশেষে সকলেই দিব্যসত্য ও দিব্য জীবনরূপ সমৃদ্ধির ভোগে প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে। কিন্তু যাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা নিষ্ফল, কেন না তাহাদের দৃষ্টি এখনও অতীত রূপরাজি

ও অনুভূতিচয়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ, সে-গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তুমি সে-মনোভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াছ এবং একটা নৈর্ব্ব্যক্তিক ভাব আনিতে পারিয়াছ, ভালই হইয়াছে—কাহারও যদি আসিতে হয় তো আসিবে। আমাদের একাগ্র চেষ্টা হইবে সবাইকে প্রস্তুত হইতে, এইজন্য যে তোমার গুরু যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা যেন এবার এখানে সিদ্ধ হইতে পারে।

১৯-৬-১৯৩৫ শ্রীঅরবিন্দ

আমি পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যোগদান করিলে প্রায় তিন বৎসর পর আমার গুরুভাই শ্রীযুক্ত শৈলজাকান্ত মজুমদার—যশোদল এবং শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কর—সিংরৈল, এখানকার আশ্রম ও সাধনা সম্বন্ধে খুব আগ্রহান্বিত হইয়া আমাকে পত্রাদি লিখিতে থাকেন। যামিনীদা একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া আমার কাছে সেই স্বপ্ন বৃত্তান্তটি পাঠাইয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দকে দেখাইয়া তাহার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত। স্বপ্নকাহিনী তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

"১৯৩৫ সনের এপ্রিল মাসে কিশোরগঞ্জ ষ্টেশনে গাড়ীতে যশোদলের শ্রীযুক্ত শৈলজাকান্ত মজুমদারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি আমার সতীর্থ ও গুরুভ্রাতা। তাঁহার নিকট পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীমার ফটো দেখিতে পাই এবং মহাযোগেশ্বর শ্রীঅরবিন্দের সন্ধান পাই। তৎপর আমি আমার গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ যোগানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে চিঠি লিখি। যেদিন যোগানন্দের পত্রোত্তর পাই তার পূর্ব্বদিবস রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করি।"

স্বপ্ন :—"দেখিলাম আমি চিত্রধাম আশ্রমে গিয়াছি। এই চিত্রধাম আশ্রমেই আমাদের শ্রীগুরুদেব দেহরক্ষা করেন এবং তাঁহার শরীর

সমাধিস্থ করা হয়। বিষাদের করালছায়ায় আশ্রমের দশদিক সমাচ্ছন্ন। আশ্রমের ভক্তগণ চক্রান্ত করিয়া শ্রীমদ্ গুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবাকে জীবিতাবস্থায় বলপূর্ব্বক সমাধিস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন; আমি এই সংবাদ জানিতে পারিয়া মর্ম্মাহত হই এবং তাঁহাকে সমাধি হইতে তুলিয়া ফেলিবার জন্য কোদাল ও খুন্তি নিয়া সমাধিস্থলে গর্ত্ত করিতে আরম্ভ করি, মাটি খুঁড়িয়া দেখি শ্রীগুরুদেবের চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতেছে, বহুকষ্টে তিনি সমাধিতে অবস্থান করিতেছেন। সমাধি হইতে উত্তোলন করিয়া, তাঁহাকে কাঁধে বহন করিয়া আমার বাড়ীতে নিয়া আসি এবং আমাদের গৃহঘরের তক্তপোষের উপর বিছানায় শোয়াইয়া দেই। তখন দেখি তাঁহার বক্ষস্থলের অংশটুকু মাটির নীচে থাকিতে থাকিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম, এবং একজন ডাক্তার ডাকিবার জন্য আমি আমাদের গ্রামে দত্তবাড়ীতে যাই। সেখানে দত্তপরিবারের বিগ্রহপূজক শ্রীযুক্ত বিপ্রচরণ তলাপাত্র মহাশয়ের নিকট ইহা বলায় তিনি বলিলেন যে আমার নিকট ঔষধ আছে, চলুন যাই। তাঁহাকে নিয়া বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখি শ্রীগুরুদেব বিনা ঔষধেই সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। তখন তিনি কাষ্ঠপাদুকা পরিয়া তাড়াতাড়ি পাড়ায় শরৎদাদাদের বাড়ীতে গিয়া প্রাঙ্গণে একটি ধুনির নিকট বসিলেন এবং আমাকে কাগজ কলম লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। তারপর তিনি শ্রীঅরবিন্দের Riddle of the World বইয়ের ইংরেজীর মত ইংরেজী বলিতে লাগিলেন, আমি লিখিয়া যাইতে লাগিলাম। তৎপর তিনি বলিলেন মা যে শুভদিনের কথা বলিতেন, সেই শুভদিন আসিয়াছে, তোমরা আনন্দ কর, আনন্দ কর। আজ হইতে জগতের সকলেই এক, কোন জাতিভেদ নাই। সত্যযুগ আসিয়াছে। তখন সেইখানে শ্রীগুরুদেবের এক মুসলমান ভক্ত মকিম সর্দ্দার উপস্থিত ছিলেন। আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম তবে কি মকিম সর্দ্দারকেও ঘরে নিতে হইবে ?

তিনি উত্তর করিলেন, বোকা, তাকে ঘরে না লইলে এক হইবে কি করিয়া। আমি ঘরে লইতে স্বীকার করিলাম। তখন গাছে গাছে ঝিঁঝিঁ পোকা শব্দ করিতে লাগিল, এই শব্দ লক্ষ্য করিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন —ঝিঁঝিঁ পোকা কি বলে জানিস? আমি এক মুখে সত্যযুগ আগমনের কথা কত বলিব। এই পোকাগুলিও বলিতেছে সেই শুভদিন, সত্যযুগ আসিয়াছে, সকলেই আনন্দ কর, আনন্দ কর।"

যামিনীদার উপরোক্ত স্বপ্ন-বর্ণিত চিঠিখানি তাহার আকাঙক্ষা মত শ্রীঅরবিন্দকে পাঠাইয়া জানিতে চাহিলাম ইহার গূঢ়ার্থ কি? শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন :—

Yogananda,

Jamini's dream is very interesting, but his interpretation about the "Riddle of the World" is not likely to be correct—for I had begun to write in 1914 and from that time was continuously doing so and there is nothing new or of a new inspiration in this book that was not there before. *The dream would rather indicate a resurrection of the Guru and his work through Jamini's consciousness of his connection with the Mother and myself and of the identity of his work with the work here.* The wasted condition of the body would signify the fading away of his work by his disappearance from the body and the inability of his disciples to carry it on; but it is now res-

tored and revived in a new form indicated by the use of the English language and the call of all castes and religions to become one. It is not an inspiration of the books by him *that is indicated, but an identity or continuation of the Power that was working there, the Power that was working here and of the work itself.* This continuity on the inward plane was already there in Pondicherry —(it may be that the dates you speak of had some connection with this fact)—but it was established on the outward plane over there in Bengal by Jamini's recognition; this is indicated by his bringing the body out of the tomb and the subsequent restored contact with other disciples. The point is rather subtle and I do not know whether I have made it clear. It seems to me an interpretation more consonant with the facts and with the significant details of the dream than the other.

16-9-1935 Sri Aurobindo

বঙ্গানুবাদ :

যোগানন্দ, যামিনীর স্বপ্ন খুব কুতূহলোদ্দীপক বটে কিন্তু "বিশ্বসমস্যা" (Riddle of the World) পুস্তক সম্বন্ধে তাহার টিকা নির্ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই—কেন না আমি ১৯১৪ সালে উহা লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই সময় হইতে সমানে লিখিয়া চলি ; ঐ পুস্তকের মধ্যে

নূতন কিছু বা কোন নূতন প্রেরণা নাই যাহা পূর্ব্বে ছিল না। যামিনীর স্বপ্ন বরং সূচনা করিতেছে তোমার গুরুর পুনরুজ্জীবন এবং যামিনীর চেতনার মধ্য দিয়া তাঁহার নবীন কর্ম্মধারা। মা ও আমার সাথে যামিনীর যে সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে এবং সে এখানের কর্ম্মধারার সহিত তাঁহার কার্য্যাবলীর যে একত্ব দেখিয়াছে যামিনীর চেতনা তাহারই অনুভূতি। শরীরের শীর্ণ অবস্থা হইতে বুঝিতে হইবে তাঁহার দেহাধার হইতে তিরোধানের ফলে এবং শিষ্যবর্গের কার্য্যতৎপরতার অভাববশতঃ ধীরে ধীরে তাঁহার কর্ম্মের ক্ষয়, কিন্তু এখন সেই কর্ম্মস্রোত পুনঃ-প্রবাহিত নবমূর্ত্তিতে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে, ইংরেজী ভাষার ব্যবহার এবং সর্ব্বজাতি সর্ব্বধর্ম্মকে এক হইবার জন্য ডাক, এই দুই ব্যাপারে কর্ম্মের নূতন মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। এখানে তাঁহার পুস্তকাবলীর প্রেরণা সূচিত হইতেছে না, সূচিত হইতেছে যে একই দিব্যশক্তি সেখানে ও এখানে কাজ করিতেছিল এবং সেই ক্রিয়াস্রোত ছিল অখণ্ড ও ধারাবাহিক। আন্তর ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিক ভাবটি পণ্ডিচেরীতে আগেই ছিল (তুমি যে তারিখের কথা বলিয়াছ তাহার সহিত ইহার হয়ত কোন যোগ আছে) কিন্তু ওখানে বঙ্গদেশে উহা প্রতিষ্ঠা পাইল যামিনীর উপলব্ধি দ্বারা ; সমাধি হইতে দেহ বাহিরে উত্তোলন এবং পরে অপর শিষ্যমণ্ডলীর সহিত পুনরায় সংস্পর্শ স্থাপন, ইহারই নির্দ্দেশ করিতেছে। বিষয়টি অপেক্ষাকৃত জটিল জানি না তোমাকে ঠিক বুঝাইতে পারিলাম কি না। আমার মনে হয় যে, আমি যে অর্থ করিলাম তাহাতে মোট ঘটনারাজির সহিত এবং স্বপ্নটির ইঙ্গিতপূর্ণ কথাগুলির সহিত অধিকতর সামঞ্জস্য আছে।

শ্রীঅরবিন্দ

১৬-৯-১৯৩৫

বাংলাদেশে, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে এই সময়ে অনেক মহাপুরুষ

ও খুব উচচশ্রেণীর সাধক সাধিকার আবির্ভাব হয়, এবং অনেক আশ্র-মাদিরও প্রতিষ্ঠা হয়। পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ জনশ্রুতি উঠিল যে ভগবান ঐ অঞ্চলে অবতাররূপে আসিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ঢাকা—বারদীর শিবতুল্য মহাযোগী প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীশ্রীমৎ লোকনাথ ব্রহ্মচারীবাবা এবং ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমের পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের আধ্যাত্মিক প্রভাব পূর্ব্ববঙ্গে খুব বিদ্যমান ছিল। ইদানীং সিলচরের অরুণাচল আশ্রমের ঠাকুর দয়ানন্দ, ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধু, পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রমের অনুকুল ঠাকুর, ত্রিপুরা—সরাইল কালীগচ্ছের জনৈক মহাপুরুষ, শিবসাগর—কোকিলামুখ আশ্রমের স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী এবং ময়মনসিংহ নেত্রকোনা চিত্রধাম আশ্রমের শ্রীশ্রীমদ ভারত ব্রহ্মচারীবাবা প্রভৃতি প্রত্যেক মহাপুরুষের শিষ্যগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গুরুদেবকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। এ-সম্বন্ধে ঠাকুর দয়ানন্দের এবং প্রভু জগ-দ্বন্ধুর ভক্তগণই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্য সম্প্রদায়ের কথা যাহাই হউক, আমাদের ক্ষেত্রের ব্রহ্মচারীবাবার শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীগুরুদেবই অবতার ইহা অনেকের বিশ্বাস এবং ভিতরে ভিতরে তাহা প্রচারও করিয়া থাকেন। এ-বিষয়ে কথা উঠিলে ব্রহ্মচারীবাবা প্রায় চুপ করিয়া থাকিতেন। "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্" অবতার কি আর নিজের কথা নিজে বলেন? এইভাবে আমাদের ক্ষেত্রেও শ্রীগুরুদেবই অবতার এই কথার খুবই প্রচার হয়। কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবা স্বয়ং আপনাকে অবতার বলিয়াছেন এরূপ আমি কখনও শুনি নাই। তিনি বলিতেন "আমি তোমাদের নিকট মায়ের প্রেরিত"—এই কথাই লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন। একদিন ব্রহ্মচারীবাবার সামনেই তাঁহার অবতারত্ব লইয়া গুরুভাইগণের মধ্যে ভীষণ তর্ক হয়। উপস্থিত প্রবীণ ও বিশেষ ভক্তগণের অনেকেরই আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস—পূর্ব্ববঙ্গে আমাদের

শ্রীগুরুদেবই অবতার, একমাত্র আমিই ছিলাম বিরুদ্ধমতাবলম্বী। আমার অল্প বয়স এবং আমি তখন একা। আমার মতাবলম্বী এখানে কেহই ছিলেন না। ব্রহ্মচারীবাবা এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। আমি তাঁহাকে বলিলাম "বাবা, আমি কিন্তু আপনাকে অবতার বলি না—আমি আপনাকে আর্য্য ঋষিতুল্য দেখি। আমার চক্ষে অবতার হইবেন তিনিই, যিনি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়া দিতে পারিবেন।" ব্রহ্মচারীবাবা আমার কথা শুনিয়া শুধু হাসিলেন, কিছুই বলিলেন না। ব্রহ্মচারীবাবার সম্মুখে বসিয়া স্পর্দ্ধার সহিত এই কথা বলিলাম এবং তিনি মাত্র হাসিয়া নীরব রহিলেন দেখিয়া আমাদের মধ্যে আর কেহ বড় একটা শ্রীগুরুদেবের অবতারত্ব লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করেন নাই।

এমন যুগ হয়ত আসিতে পারে, একই সময়ে, গুরু অথাৎ দীক্ষাগুরু অর্থাৎ আধ্যাত্মিক চেতনা ও আধ্যাত্মিক জীবনলাভের মুখ্য সহায়ক এবং দেহধারী ভগবান একই ব্যক্তি—এই দুই তত্ত্বের সীমারেখা কোথায়? পূর্ব্ববঙ্গে অবতার আসিয়াছেন এই জনশ্রুতি মধ্যে কতটুকু সত্য আছে? পণ্ডিচেরী আশ্রমে আসিয়া অনেকদিন উপরোক্ত গুরুদেব—দীক্ষাগুরু ও অবতার এবং ব্রহ্মচারীবাবার আরও দুএকটি visions and voices শ্রীঅরবিন্দের নিকট লিখিয়া সন্দেহ নিরসন করিয়াছি এবং আরও কয়েকটি বিষয়ের সময় হইলে জানিতে পারিব আশ্বাস পাইয়াছি। শ্রীঅরবিন্দের উত্তর :—

Yogananda,

The time has not come to say anything about these questions—it can only be after a time.

If your Guru declared himself to be one sent

by the Mother but not the Avatar, it is a mistake to go against what he said by declaring him an Avatar. As to the details he gave from time to time, in all these prophecies of what is to come the main fact can be accepted but this or that detail may point to something that is trying to be but may take place with a slightly different turn to what the mind expected. *The descending Power chooses its own place, body, time for the manifestation;* something of that is foreseen by those who have vision but not the whole.

You need not however disturb the convictions of other disciples of your Guru. Let them follow their own road towards the Light.

17-9-1934 Sri Aurobindo

বঙ্গানুবাদ :

যোগানন্দ, এ-সমস্ত বিষয়ে কিছু বলিবার সময় এখনও আসে নাই—আরও কিছুকাল কাটিয়া গেলে তাহা হইতে পারিবে।

তোমার গুরুদেব স্বয়ং যদি আপনাকে মায়ের প্রেরিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকেন, যদি নিজেকে অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার আপন কথার বিরুদ্ধে যাইয়া তাঁহাকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করা ভুল হইবে। তিনি সময়ে সময়ে যে-সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারের উল্লেখ করিতেন, ভবিষ্যতের কথা যাহা বলিতেন, সে-সম্বন্ধে এই বলা যায় যে তাঁহার মুখ্য বাণীটি গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার খুচরা উক্তিগুলি হয়ত নির্দ্দেশ করে শুধু এমন একটা কিছু যাহা ঘটিতে চাহি-

তেছে বটে কিন্তু যখন ঘটিবে তাহা মানস-প্রত্যাশিত ধারাতে নয়, একটু ভিন্ন প্রকারে। অবতীর্য্যমানশক্তি নিজেকে প্রকট করিবার দেশ, কাল ও আধার নিজেই নির্ব্বাচিত করেন; যাঁহার সূক্ষ্মদর্শন শক্তি আছে তিনি তার কিছুটা আগে দেখিতে পান, সবটা নয়।

সে যাহা হউক, তুমি তোমার গুরুদেবের অপরাপর শিষ্যগণের বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ করিতে যাইও না। তাহারা আপন আপন পথ ধরিয়া আলোকের দিকে অগ্রসর হউক।

শ্রীঅরবিন্দ

১৭-৯-১৯৩৪

অবতার সম্বন্ধে আর একটি পত্র :—

Yogananda,

About the question of the Avatar, I do not think it is useful to press in the matter. It has become very much the tendency, especially in Bengal, to regard the Guru as the Avatar. To every disciple the Guru is the Divine, but in a special sense—for the Guru is supposed to live in the divine consciousness, to have attained union and when he gives to the disciple, it is the Divine that gives and what he gives is the consciousness of the Divine who is within the Guru. But that and Avatarhood are two different things. It is mostly in East Bengal recently that those have come who were acclaimed as Avatars; those who came had each of them

the idea of a work to be done for the world and the sense of a Divine Power working through them, which shows that there was a pressure for manifestation there and something came in each case, for something of the Divine Power always comes when it is called, but it does not look as if there was anywhere the complete descent. It is this that may have created the idea that the Avatar was born there. It has always been said of the Advent that is to come now that there would be many in whom it would seem that it had come, *but the real Avatar would work behind a veil until the destined hour came.*

I do not gather from what is quoted as said by your Guru that he claimed to be the Avatar. It seems to me that he claimed to be a Power preparing the way for the work of the Divine Mother and even to indicate that all that he meant would be manifested not only by his own followers but by other groups (সম্প্রদায়), consisting evidently of those who had not had him for Guru but had some other Head and Teacher. This is also confirmed by the saying that some other one than his disciples might be the means of his প্রকাশ—that is to say, would

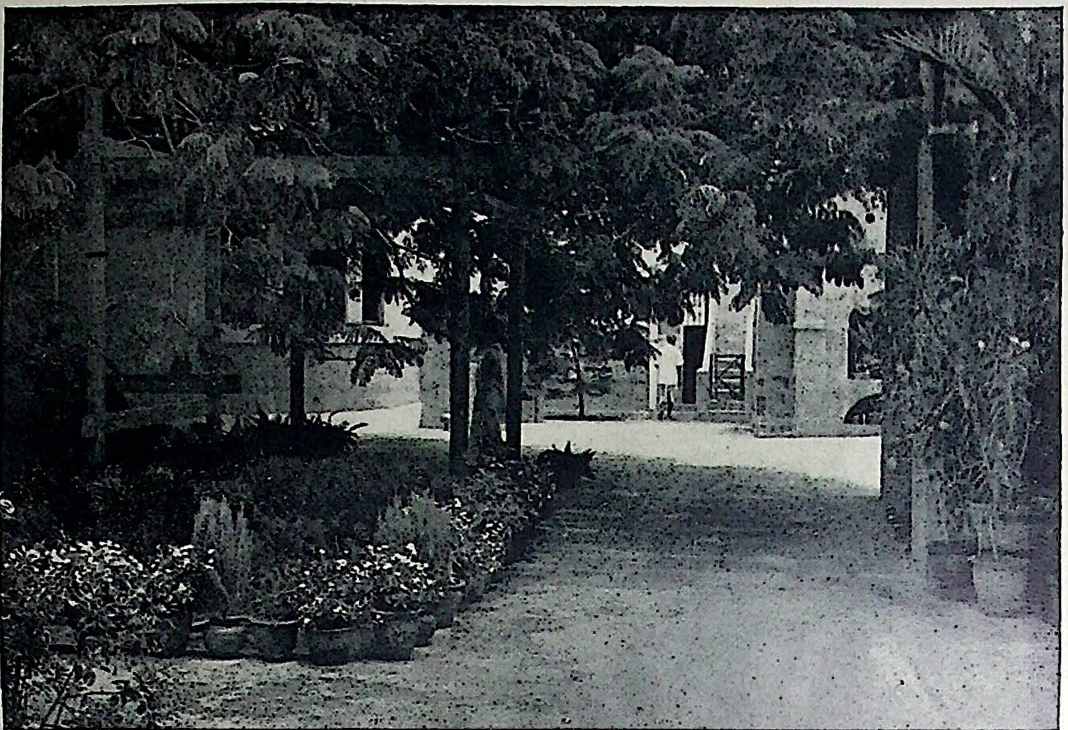
be the means of carrying on his work and aiding the manifestation of the Mother. If this meant proclaiming him as the Avatar, I do not see how it can agree with the other saying that after his leaving of the body the Avatar would come to the Asram he had created.

I do not quite know what is meant by *ayoni sambhava* (অযোনিসম্ভবা). An incarnation is always through a human mother, though there have been one or two cases in which a virgin birth has been proclaimed (Christ, Buddha). The only other meaning—unless we suppose an unprecedented miracle—might be a descent such as sometimes happen, the Godhead manifesting in somebody who at birth was a Vibhuti, not at once the full incarnation. But in the absence of a clear statement from your Guru himself, these are only speculations.

25-8-1935 Sri Aurobindo

বঙ্গানুবাদ :—

যোগানন্দ, আমার মনে হয় না যে অবতার তত্ত্ব সম্বন্ধে আর জোর করিয়া কিছু বলাতে কোন ফল হইবে। আজকাল লোকের একটা ঝোক হইয়াছে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, গুরুকে অবতার বলিয়া লওয়া। প্রত্যেক শিষ্যের কাছে গুরু ভগবান বটেন, কিন্তু তাহা এক বিশিষ্ট অর্থে —কেন না ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে গুরু সদা বসতি করেন ভাগবত



শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
(ভিতর-প্রাঙ্গণ)

চৈতন্যে, তিনি চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইয়াছেন, এবং যখন তিনি শিষ্যকে কিছু দেন তখন বুঝিতে হইবে যে ভগবান তাহা দিতেছেন, গুরু যাহা দেন তাহা তাঁহার অন্তরস্থ ভাগবত চৈতন্য। অবতার তত্ত্ব ও এই প্রতীতি বিভিন্ন বস্তু। সম্প্রতি, প্রধানতঃ পূর্ব্ববঙ্গে, ইহা ঘটিয়াছে যে আবির্ভূত কোন কোন মহাপুরুষ অবতার বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন; এই পুরুষগণের প্রত্যেকেরই ধারণা ছিল যে জগতের জন্য তাঁহাকে একটা বিশিষ্ট কর্ম্ম করিতে হইবে এবং তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে দিব্যশক্তি তাঁহার মধ্যে ক্রিয়মাণ; ইহা হইতে বোঝা যায় ঐখানে একটা অভিব্যক্তির তাগিদ আসিয়াছিল এবং ঐ আধারের মধ্যে কিছু না কিছু নামিয়াছিল, কারণ ডাক দিলে ভাগবত শক্তির কিছুটা সর্ব্বদাই আসে, কিন্তু এরূপ বোধ হয় না যেন কোথাও সম্পূর্ণ অবতরণ ঘটিয়াছে। হয়ত এই কারণেই লোকের মনে এই বিশ্বাস জাগিত যে ঐস্থানে অবতার জন্ম লইয়াছেন। **আসন্ন দিব্য আগমন সম্বন্ধে সর্ব্বদা বলা হয় যে এমন বোধ হইবে যেন অনেকের মধ্যে এই আগমন ঘটিয়াছে কিন্তু যথার্থ অবতার আবরণের পশ্চাতে থাকিয়া কাজ করিবেন যতক্ষণ না বিধিনির্দ্দিষ্ট শুভমুহূর্ত্ত আগত হয়।**

যাহা তোমার গুরুদেবের আপন বাণী বলিয়া উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা হইতে আমার এরূপ মনে হয় না যে তিনি স্বয়ং অবতারত্বের দাবী করিয়াছেন। তাঁহার দাবী বরং এই যে তিনি একটি বিশিষ্ট শক্তি যাহা ভাগবতী জননীর কাজের জন্য পথ পরিষ্কার করিতেছে; মনে হয় যে তিনি এমন নির্দ্দেশ করিতে চাহিয়াছিলেন যে তাঁহার দৃষ্ট সত্য জগতে অভিব্যক্ত হইবে শুধু তাঁহার অনুবর্ত্তীগণের দ্বারা নয়, পরন্তু অন্য সম্প্রদায়ের অন্তর্গত লোকের দ্বারাও, যাহারা তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করে নাই, তাহাদের অপর নায়ক ও উপদেষ্টা ছিল। আমাদের মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাইতেছে এই বাণীতে যে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর বাহিরে

কেহ হয়ত তাঁহার কার্য্য চালাইয়া যাইবে এবং জগজ্জননীর প্রকাশের সহায়তা করিবে। ইহার অর্থ যদি হয় তাঁহার অবতারত্বের ঘোষণা, তাহা হইলে আমি বুঝি না যে ইহার সহিত সামঞ্জস্য কোথায়—অপর বাণীটির যেখানে বলা হইয়াছে যে তাঁহার দেহরক্ষার পরে তাঁহার স্থাপিত আশ্রমে অবতার আবির্ভূত হইবেন।

অযোনিসম্ভবা কথাটির অর্থ আমি ঠিক বুঝিতেছি না। অবতার ত সর্ব্বদাই জগতে আবির্ভূত হন মানবী জননীর মধ্য দিয়া, যদিচ ইঁহাদের দুই এক জন (বুদ্ধ ও খৃষ্ট) অনৌরস জাত বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। ইহার অপর একটি অর্থ হইতে পারে—যদি আমরা একটা অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক ঘটনার কল্পনা না করি—কেবল এইরূপ এক অবতরণ (যাহা কখন কখন ঘটিয়া থাকে) যেখানে বিভূতিরূপে সম্ভূত ব্যক্তির মধ্যে পরে ভগবান আপনাকে প্রকট করিলেন। কিন্তু তোমার গুরুদেবের স্পষ্ট উক্তি যখন নাই তখন এসব জল্পনা মাত্র।

২৫-৮-১৯৩৫ শ্রীঅরবিন্দ

Yogananda

Jamini's dream is very interesting but Sitts' interpretation about the "Riddle of the World" is not likely to be correct — for I had begun to write in 1914 and from that time was continuously doing so and there is nothing new or of a new inspiration in this book that was not there before. The dream would rather indicate a resurrection of the Guru and his work through Jamini's consciousness of his connection with the Mother and myself and the identity of his work with the work here. The wasted condition of the body would signify the fading away of his work by the disappearance from the body and the inability of his disciples to carry it on, but it is now restored and revived in a new form indicated by the use of the English language and the call [illegible] of all

cults and religions to become one. It is not an inspiration of the books by him that is indicated, but an identity or continuation of the Power that was working there ~~but~~ the Power that was working here and of the cycle itself. This continuity was already there in the inner plane, ~~but~~ particularly in (it may be that the dates you speak of had some connection with this fact) — but it was established on the outward plane over there in Bengal by Jamini's recognition of [illegible]; this is indicated by his bringing the body out of the Samadhi tomb and the subsequent restored contact with other disciples. The point is rather subtle and I do not know whether I have made it clear. It seems to me an interpretation more consonant with the facts and with the significant details of the dream than the other.

Sri Aurobindo



শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
(শ্রীঅরবিন্দের বাসগৃহ)

ব্রহ্মচারীবাবার সাধকগোষ্ঠী বা উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা

১৩৩১ সনে, চিত্রধাম আশ্রমে শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মীকৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার পরই, ব্রহ্মচারীবাবা আপন গৃহস্থ শিষ্যগণের মধ্যে কয়েকটি পরিবার—যাহারা তাঁহার সাধনা ও আদর্শ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা আগে হইতে তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়াছেন, অন্যত্র তাহাদের জায়গা নাই, তাহাদের জন্য, একটি বিস্তৃত স্থানে বসবাসের এবং কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যাদি দ্বারা অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাপূর্ব্বক একটি সাধকগোষ্ঠী ও আদর্শ সমাজগঠন করিবার জন্য একটি উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। একটি সাধকগোষ্ঠী এবং আদর্শ সমাজ স্থাপনের এই প্রেরণা এত তীব্র ছিল যে তিনি বলিয়াছিলেন যদি কয়েকটি পরিবারকে এই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত ভাঙ্গিতে হয় তবে মার কার্য্য সাধনের জন্য তাহাই করিব। এই উদ্দেশ্যে তিনি গোবিন্দদা ও উপেন্দ্র ঠাকুরদা প্রভৃতিকে লইয়া সর্ব্ব প্রথম খালিয়াজুরী অঞ্চলে কয়েকটি বিস্তৃত অনাবাদী ভূমি দেখিয়াছিলেন কিন্তু উহা নিম্নভূমি এবং বসবাসের অনুপযোগী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় ছাড়িয়া দেন। পরে ময়মনসিংহ জিলার উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে এবং সিলেটের সুনামগঞ্জ উপরিভাগে যেসকল অনাবাদী ভূমি পতিত আছে, হেমদা ও উপেন্দ্র ঠাকুরদাকে তাহা দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। তথায় প্রচুর ভূমিখণ্ড পাওয়া গেলেও যাতায়াতের কোন সুবন্দোবস্ত নাই এবং মনুষ্য সমাজের বাসোপযোগী করিয়া তুলিতে এক শতাব্দী লাগিবে এই জন্য ঐ অঞ্চলও মনোনীত হইল না। অবশেষে ঢাকা—কাউরাইদের অন্তর্গত কিছু টিলাভূমি পছন্দ

হইল বটে কিন্তু সেখানে ধানের জমি বেশী ছিল না বলিয়া তাহা লওয়া হইল না। এইভাবে ১৩৩৩ সনে তিনি অকালে দেহরক্ষা করিলেন। তাঁহার সাধকগোষ্ঠী ও আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইল না।

কালক্রমে, ১৯৩২ সনে আমি পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগদান করিবার পরে, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা এই পৃথিবীতে ভাগবত জীবন ও ভাগবত চেতনার প্রতিষ্ঠাকল্পে যে দিব্যকর্ম্ম ও দেবসঙ্ঘ সংগঠন করিতেছেন এবং তাঁহাদের এই ভাগবত কার্য্য সাধনের জন্য কয়েকটি সাধক তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমাকে অর্পণ করিয়া তাঁহাদের সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়াই আশ্রয় নিয়াছেন—ইহাই ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার দৃষ্ট প্রতিষ্ঠানই সমুদ্রতীরে রূপলাভ করিতেছে। সেইজন্যই মনে হয় ব্রহ্মচারীবাবার প্রতি শ্রীশ্রীজগন্মাতার আদেশ ছিল "সমুদ্রতীরে যাইয়া একজন বড় লোকের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে।" এই ভগবৎ নির্দ্দেশ ও বাণীর মর্ম্ম এখন সুস্পষ্ট।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি ওঁ

শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলা পুস্তক

শ্রীঅরবিন্দের পত্র ('শ্রীঅরবিন্দের পত্র' ও 'পণ্ডিচেরীর পত্র' একত্রে) ১৲
গীতার ভূমিকা (১ম সং) ... ... ২৲
ধর্ম্ম ও জাতীয়তা (৪র্থ সং) ১৸৹
জগন্নাথের রথ (৩য় সং) ... ... ১৲
পত্রাবলী (আর্ট পেপারে মুদ্রিত ৬ খানি হস্তলিখিত চিঠির প্রতিলিপি সহ) ১৷৹

শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ

শ্রীমৎ অনির্বাণ

দিব্য-জীবন ১ম খণ্ড (The Life Divine Vol. I) ৮৲
ঐ ২য় খণ্ড (The Life Divine Vol II) ১৪৲

নলিনীকান্ত গুপ্ত

যোগসাধনার ভিত্তি (Bases of Yoga) ৩য় সং ১৸৹
মা (The Mother) ৩য় সং ১৲

নলিনীকান্ত গুপ্ত ও মোহিনীমোহন দত্ত

যোগের পথে আলো (Lights on Yoga) ২য় সং ১৸৹

অনিলবরণ রায়

উত্তরপাড়া অভিভাষণ (Uttarpara Speech) ।৹
যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য (The Yoga & Its Objects) ৸৹

প্রাপ্তিস্থান :

SRI AUROBINDO ASHRAM
(Book Sales Department)
PONDICHERRY SOUTH INDIA

শ্রীমায়ের লিখিত পুস্তকের অনুবাদ

চারুচন্দ্র দত্ত

সর্ব্বোত্তম আবিষ্কার (The Supreme Discovery) ।৵০

চারুচন্দ্র দত্ত ও নলিনীকান্ত গুপ্ত

মায়ের আলাপ (Words of the Mother-এর "Conversations" অংশের অনুবাদ) ২॥০

নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত :

দেবজন্ম (নূতন সংস্করণ) ... ... ২॥০

হরিদাস চৌধুরী প্রণীত :

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা (পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ) ২৸০

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম (বুক সেল্‌স ডিপার্টমেণ্ট)

শ্রীঅনিলবরণ রায় প্রণীত পুস্তক

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা—বিশুদ্ধ মূল শ্লোক, অন্বয় মুখে অনুবাদ এবং সরল ভাষায় প্রতি শ্লোকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য সম্বলিত। এক খণ্ডেই সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ... ... ৩॥০

যোগে দীক্ষা (যোগ সম্বন্ধীয় শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী) ১৲

পুরুষোত্তম শ্রীঅরবিন্দ ... ১।০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বিরাট সংস্করণ) ...

(শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে সম্পাদিত)। ইতিমধ্যে ১২ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ড ... ১।০

"আমরা বর্ত্তমান যুগের গীতার এই শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা পাঠ করিতে সকলকে অনুরোধ করি।"

—**শিক্ষা ও সাহিত্য**

প্রাপ্তিস্থান :

গীতা-প্রচার কার্য্যালয়

১০৮।১১, মনোহরপুকুর রোড, কালিঘাট, কলিকাতা—২৬